বঙ্কিমচন্দ্রের

কমলাকান্তের দপ্তর

(বিস্তৃত ভূমিকা ও টীকা সম্বলিত)

অধ্যাপক শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগ্‌চী

সম্পাদিত

তৃতীয় সংস্করণ

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ

পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক

১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা—১২

১৯৬২

সূচীপত্র

ভূমিকা

কমলাকান্তের দপ্তরের প্রবন্ধগুলি ১৮৭৩ সাল হইতে ১৮৭৫ সালের মধ্যে রচিত। কমলাকান্তের জবানবন্দী ১৮৮২ সালে প্রকাশিত হয়; কমলাকান্তের পত্র নামে কয়েকটি প্রবন্ধ ১৮৮৫ সালে কমলাকান্তের দপ্তরের দ্বিতীয় সংস্করণের সহিত যুক্ত হয়।

১৮৭৩ সালের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকখানি বড় উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর, বিষবৃক্ষ প্রভৃতি তাঁহার প্রথম যুগের রচনা। প্রমথনাথ বিশী মনে করেন বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী ক্লান্ত হইয়া বিরাম চাহিতেছিল—তারপর বঙ্গদর্শন পত্রিকার সম্পাদনার ভার লইয়া মাসে মাসে পাঠকগণকে কিছু কিছু নূতন লেখা সরবরাহ করিবার দায়িত্বও পালন করিতে হইয়াছিল। সুতরাং হাস্যে-কৌতুকে, ব্যঙ্গে-বিদ্রূপে মিশাইয়া সেই লেখাগুলি দ্বারা তিনি বঙ্গদর্শনের পাঠকগণের মনোরঞ্জন করিতে চাহিয়াছিলেন। কথাগুলির মধ্যে আংশিক সত্য নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু আরও কয়েকটি কথা না বলিলে দপ্তর-রচনার রহস্যের মূলে উপনীত হওয়া যায় না।

কমলাকান্তের দপ্তর আত্মনিষ্ঠ শিল্পকলা

উপন্যাস বস্তুনিষ্ঠ রচনা—উপন্যাসে যাহা বর্ণনা করা হয় তাহা লেখকের নিজের কথা নয়—উপন্যাসের মধ্যে যে জীবনের রূপ চিত্রিত হইতেছে সেই জীবনকে ফুটাইয়া তোলাই তাঁহার কাজ। উপন্যাসের মধ্যে যে একটি কাহিনীগত প্রবাহ আছে—সেই প্রবাহকে রক্ষা করার দিকেই লেখকের দৃষ্টি থাকে। ঔপন্যাসিক নিজে থাকেন অনেকটা নিরপেক্ষ ও অনাসক্ত—শুধু দর্শকের মত তিনি দেখিয়া যান ও বর্ণনা করিয়া যান। মাঝে মাঝে অবশ্য বাহিরের বিষয় বর্ণনা করিতে করিতে দুই একটি মন্তব্য করিলেন বা বিশেষ কোন চরিত্রের উপর তাঁহার প্রীতি বা পক্ষপাত দেখা দিল—ঘটনা ও চরিত্রের বিশ্লেষণ করিতে গিয়া দুই একটি আত্মগত উক্তিও যে লেখক করেন না তাহা নয়, কিন্তু উপন্যাসের মধ্যে লেখক নিজের অন্তরের ভাব-ভাবনাকে বিস্তৃতভাবে রূপায়িত করিতে পারেন না—বস্তুনিষ্ঠ শিল্পের ধর্মরক্ষা করিতে গিয়াই তাঁহাকে আত্মহৃদয়ের উচ্ছ্বাস সংযত করিতে হয়।

উপন্যাসের মধ্যে ঘটনা-প্রবাহের ফাঁকে ফাঁকে বঙ্কিমচন্দ্র নিজের কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং অনেক সময়ই কাহিনীর গতিকে থামাইয়া দিয়া ব্যক্তিগত মন্তব্যের সুযোগ করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে উক্তিগুলি সংক্ষিপ্ত—একটি বিশেষ ভাবকে সামান্য একটু প্রকাশিত করিয়াই তাহা শেষ হইয়া গিয়াছে। লেখকের মনোগত অভিপ্রায়ের খানিকটা বুঝা যায় এবং খানিকটা অনুমান করিয়া লইতে পারা যায়। লেখকের ব্যক্তিসত্তা পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইবার সুযোগ উপন্যাসে পাওয়া যায় না।

কিন্তু কমলাকান্তের দপ্তর উপন্যাস নয়, কাহিনীর ক্ষীণসূত্র আবিষ্কার করা গেলেও ইহাকে গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি কথাসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। কমলাকান্ত নিষ্কর্মা আফিমখোর ব্রাহ্মণ, নসীবাবু তাহাকে আফিম যোগান—প্রসন্ন গোয়ালিনীর গরুর দুধ এই আফিমখোর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের না হইলে চলে না—এই ভাবে একটি কাহিনীর সূত্র রচনাগুলির মধ্যে থাকিলেও কমলাকান্তের দপ্তর গল্প-সমষ্টি নয়। প্রথম দেখিয়া মনে হইবে এগুলি কতকগুলি প্রবন্ধ—লেখকের মননশীলতার পরিচয় ইহাদের মধ্যে আছে। মননশীলতার পরিচয় এইগুলির মধ্যে প্রচুর আছে বটে, কিন্তু এইগুলিকে সোজাসুজি প্রবন্ধ বা নিবন্ধ শ্রেণীরও অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। বস্তুপ্রধান বা 'বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধের যে ধর্ম তাহা এইগুলির মধ্যে নাই। 'বড় বাজার'-এ আমাদের পরিচিত বাজার কৈ? 'পতঙ্গ'-এ প্রাণিতত্ত্ব-বিষয়ক গবেষণা কৈ? দপ্তরগুলির মধ্যে যাহা বক্তব্য তাহা প্রগাঢ় চিন্তাসাপেক্ষ এবং দূরদৃষ্টিসঞ্জাত দার্শনিক তত্ত্ব, কিন্তু তাহা আমাদের নিকট অতিরিক্ত প্রাপ্তি—দপ্তরগুলির মধ্যে কমলাকান্তরূপী বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়াবেগই স্পন্দিত হইতেছে।

মনে হয়, ইংরেজ লেখক ডি. কুইন্‌সির The Confessions of an Opium-eater বইখানি কমলাকান্তের দপ্তর-রচনার একটা বড় অনুপ্রেরণা। বঙ্কিমচন্দ্রের মত দেশপ্রেমিক, মনীষী ও শিল্পী নিজের কথা, আত্মগত হৃদয়ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য ভিতরে ভিতরে অধীর হইয়া উঠিতেছিলেন—উপন্যাসের মধ্যে বিবৃতি, বর্ণনা ও বিশ্লেষণের ফাঁকে ফাঁকে যে দুই চারিটি মন্তব্য করিবার তিনি সুযোগ পাইতেছিলেন তাহাতে তাঁহার তৃপ্তি হইতেছিল না। সব কথা বলিতেও পারিতেছিলেন না। এখানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে নিজের কথা বলিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্ত না সাজিয়া গম্ভীর বা লঘুভাবে প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করিলেই তো পারিতেন। এই জিজ্ঞাসার উত্তর শ্রদ্ধেয় কবিশেখর চমৎকারভাবে দিয়াছেন।

"যে সকল ভাবচিন্তাগুলিকে যুক্তিমূলক পারম্পর্যে প্রতিষ্ঠিত করা যায়—সেগুলি লইয়া হয় প্রবন্ধ। বঙ্কিম সেই শ্রেণীর ভাবচিন্তাগুলি লইয়া বহু প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। যেগুলি যুক্তির বল্‌গা মানে না, অনেকটা রুচি-প্রকৃতির উপর নির্ভর করে—অকস্মাৎ যে সকল ভাবোচ্ছ্বাস মনে উদিত হইয়া স্মৃতি রাখিয়া বিলীয়মান হয়—যে অনুভূতি faith বা intution হইতে প্রাপ্ত—সে সমস্ত লইয়া প্রবন্ধও চলে না। সেগুলির জন্য পৃথক একটা রচনাভঙ্গীর যে প্রয়োজন বঙ্কিম তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সেজন্য তিনি কমলাকান্ত সাজিয়া দপ্তর লিখিয়াছেন।

ন্যাকামি, কপটতা, অসংযত আতিশয্য ও মূঢ়তায় ভরা মানব জগতের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান লইয়া বঙ্কিম প্রবন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন যুক্তির চেয়ে ব্যঙ্গের ধার বেশী। এই ব্যঙ্গ বর্ষণের জন্য তাঁহাকে তদুপযোগী ভঙ্গীর অনুসরণ করিতে হইয়াছে। কমলাকান্তের দপ্তরের প্রধান উপজীব্য এই ব্যঙ্গবাণ। অবশ্য সেই সঙ্গে কবি বঙ্কিমের হৃদয়োচ্ছ্বাসেরও বাহন হইয়াছে এ দপ্তর।

কমলাকান্ত সাজিবার প্রয়োজন ছিল আরো অন্য কারণে। বঙ্কিম যে সমাজ-সংসারের কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন তাহার মধ্যেই যে ব্যক্তি জীবনযাত্রা নির্বাহ করে সে তাহারই অঙ্গীভূত। সেই সমাজ-সংসারের সুখদুঃখ ধারণা সংস্কারের দ্বারা তাহার চিত্ত অতিরঞ্জিত। তাহার দ্বারা এইরূপ সমালোচনা স্বাভাবিক নয়। সে অধিকারীও নয়। সেই অধিকার অধিগত করিবার জন্য তিনি নিজেকে তাহার বাহিরে দাঁড় করাইয়াছেন একজন নিরপেক্ষ অনাসক্ত দ্রষ্টার রূপে। নিজের সংস্কারমুক্ত মানসিক অবস্থাকে অহিফেনের আমেজ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। বঙ্কিম এই pose লইতে গিয়া কমলাকান্ত-চরিত্রটিকে একটি অপূর্বসৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছেন। এরূপ চরিত্র তাঁহার কোন উপন্যাসে স্থান পায় নাই।

শরৎচন্দ্র নিজের জীবনের অনেকাংশ লইয়া শ্রীকান্ত-চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন—শ্রীকান্ত নিজের জীবনকে কেন্দ্র করিয়া হ্রস্ব পরিধির ভুবনকে যেরূপে দেখিয়াছেন বিশেষ কোন মন্তব্য না করিয়া সেইরূপেই চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমও নিজের চরিত্রের, অভিজ্ঞতার ও অনুভূতির বহু অংশ গ্রহণ করিয়া কমলাকান্ত-চরিত্রটির সৃষ্টি করিয়াছেন। তফাৎ এই—শ্রীকান্ত প্রধানতঃ কবি আর কমলাকান্ত প্রধানতঃ সমালোচক।"

কমলাকান্ত নেশাখোর ও পাগল। আফিমের মাত্রা একটু বেশী চড়াইলে সহসা তাহার দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া যায় এবং সাধারণ লোক সাদা চোখে যাহা দেখিতে পায় না তাহা কমলাকান্তের চোখে ধরা পড়ে। আর পাগল হওয়ার আর একটা সুবিধা আছে। পাগলের চিন্তা অসংলগ্ন—একটার সহিত আর একটার যোগ নাই—এক কথা বলিতে বলিতে অবলীলাক্রমে সে অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। নেশাখোর ও পাগলের কথা বলার কোন দায়িত্ব নাই। তাহার কথায় কেহ রাগ করে না, কেহ অপমান বোধ করে না—বাক্যবাণ মর্ম্ম বিদ্ধ করিলেও আঘাতের স্থানটিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে মুখে হাসি আনিবার চেষ্টা করে। কিন্তু কমলাকান্তের কথা লোকে শুনে কেন? না শুনিয়াও উপায় নাই। মাঝে মাঝে কথাগুলি বাহির হইতে প্রলাপ বলিয়া বোধ হইলেও মন্তব্যগুলি এমন যুক্তিনিষ্ঠ-অকৃত্রিম ও হৃদয়াবেগের স্পর্শে কথাগুলি এমন মর্ম্মস্পর্শী যে, লোকে শুনিতে বাধ্য হয়। মাঝে মাঝে কমলাকান্তের উক্তিতে এমন একটা উচ্চ শ্রেণীর কবিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে যে, কমলাকান্তের কথা না শুনিয়া উপায় নাই। বুদ্ধিমান ও হৃদয়বান পাঠক তাহা শুনে এবং উপভোগ করে।

কমলাকান্তের রচনার শ্রেণীভেদ

'একটি গীত', 'আমার দুর্গোৎসব', 'একা' প্রভৃতি নিবন্ধ হৃদয়োচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে কবিত্ব-গুণ-সম্পন্ন। 'বিড়াল' যুক্তিমূলক রচনার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ ও হিউমার প্রায় সমস্ত রচনার মধ্যেই আছে। তবে কবিত্ব যেখানে সমধিক ফুটিয়াছে সেখানে স্বাভাবিকভাবেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ভাব অপেক্ষাকৃত অল্প। বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্ব বিষয়বস্তুর অনুরূপ রচনাশৈলী তিনি গঠন করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ আরম্ভ হইবার পূর্বেই তখনকার অপরিণত গদ্যভঙ্গীর মধ্যে তিনি গীতিকাব্যের ঝঙ্কার ও কোমলতার প্রবাহ বহাইয়াছেন। যাহা সম্পূর্ণ কাব্যের জিনিস, যে হৃদয়াবেগ, যে ক্ষোভ একমাত্র ছন্দেই প্রকাশিত হইতে পারে তাহাকে তিনি আটপৌরে গদ্যভাষার মধ্যে সার্থকভাবেই রূপায়িত করিয়াছেন। আবেগাত্মক, অসাধারণ কবিত্ব-গুণ-সম্পন্ন একটি রচনাংশ উদ্ধৃত করা হইল। ইহা দেখিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন কী অসাধারণ ক্ষমতাবলে বঙ্কিমচন্দ্র 'যে পুষ্পক রথ স্বভাবতঃ বিমানচারী তাহাকে মাটির পথে হাঁকাইয়াছেন।'

"চাহিবার এক শ্মশান-ভূমি আছে,—নবদ্বীপ। সেইখানে সপ্তদশ যবনে বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল। বঙ্গমাতাকে মনে পড়িলে, আমি সেই শ্মশান-ভূমি প্রতি চাই।

যখন দেখি, সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম বেড়িয়া অদ্যাপি সেই কলধৌতবাহিনী গঙ্গা তর তর রব করিতেছে, তখন গঙ্গাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি—তুমি আছ, সে রাজলক্ষ্মী কোথায়? তুমি যাঁহার পা ধুয়াইতে, সেই মাতা কোথায়? তুমি যাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে সেই আনন্দরূপিণী কোথায়? তুমি যাঁহার জন্য সিংহল, বালী, আরব, সুমাত্রা হইতে বুকে করিয়া ধন বহন করিয়া আনিতে, সে ধনেশ্বরী কোথায়? তুমি যাঁহার রূপের ছায়া ধরিয়া রূপসী সাজিতে, সে অনন্তসৌন্দর্যশালিনী কোথায়? তুমি যাঁহার প্রসাদি ফুল লইয়া ঐ স্বচ্ছ হৃদয়ে মালা পরিতে, সে পুষ্পাভরণা কোথায়? সে রূপ সে ঐশ্বর্য কোথায় ধুইয়া লইয়া গিয়াছ? বিশ্বাসঘাতিনি, তুমি কেন আবার শ্রবণমধুর কল কল তর তর রবে মন ভুলাইতেছ? বুঝি তোমারই অতল গর্ভমধ্যে, যবনভয়ে ভীতা সেই লক্ষ্মী ডুবিয়াছেন, বুঝি কুপুত্রগণের আর মুখ দেখিবেন না বলিয়া ডুবিয়া আছেন। মনে মনে আমি সেই দিন কল্পনা করিয়া কাঁদি। মনে মনে দেখিতে পাই, মার্জ্জিত বর্শাফলক উন্নত করিয়া, অশ্বপদশব্দমাত্রে নৈশ নীরবতা বিঘ্নিত করিয়া, যবনসেনা নবদ্বীপে আসিতেছে। কাল পূর্ণ দেখিযা নবদ্বীপ হইতে বাঙ্গালার লক্ষ্মী অন্তর্হিত হইতেছেন। সহসা আকাশ অন্ধকারে ব্যাপিল; রাজপ্রাসাদের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। পথিক ভীত হইয়া পথ ছাড়িল; নগরীর অলঙ্কার খসিযা পড়িল; কুঞ্জবনে পক্ষিগণ নীরব হইল, গৃহময়ূরকণ্ঠে অর্দ্ধব্যক্ত কেকার অপরার্দ্ধ আর ফুটিল না। দিবসে নিশীথ উপস্থিত হইল, পণ্যবীথিকার দীপমালা নিবিয়া গেল, পূজাগৃহে বাজাইবার সময়ে শঙ্খ বাজিল না; পণ্ডিতে অশুদ্ধ মন্ত্র পড়িল; সিংহাসন হইতে শালগ্রামশিলা গড়াইয়া পড়িল। যুবার সহসা বলক্ষয় হইল, যুবতী সহসা বৈধব্য আশঙ্কা করিযা কাঁদিল; শিশু বিনারোগে মাতার ক্রোড়ে শুইয়া মরিল। গাঢ়তর, গাঢ়তর, গাঢ়তর অন্ধকারে দিক্ ব্যাপিল; আকাশ, অট্টালিকা, রাজধানী, রাজবর্ত্ম, দেবমন্দির, পণ্যবীথিকা, সেই অন্ধকারে ঢাকিল—কুঞ্জতীরভূমি, নদীসৈকত, নদীতরঙ্গ সেই অন্ধকারে—আঁধার, আঁধার, আঁধার হইয়া লুকাইল। আমি চক্ষে সব দেখিতেছি—আকাশ মেঘে ঢাকিতেছে—ঐ সোপানাবলী অবতরণ করিয়া রাজলক্ষ্মী জলে নামিতেছেন। অন্ধকারে নির্ব্বাণোন্মুখ আলোকবিন্দুর, জলে ক্রমে ক্রমে সেই তেজোরাশি বিলীন হইতেছে। যদি গঙ্গার অতল-জলে না ডুবিলেন, তবে আমার সেই দেশলক্ষ্মী কোথায় গেলেন?"

যুক্তিনিষ্ঠ অথচ তীব্র শ্লেষপূর্ণ সরস রচনার নিদর্শন দেওয়া হইতেছে। পাঠক লক্ষ্য করিতে পারিবেন বিষয়ভেদে স্টাইল বা রচনাশৈলী কতখানি বিভিন্ন।

"মারপিট কেন। স্থির হইয়া, হুঁকা হাতে করিয়া একটু বিচার করিয়া, দেখ

দেখি। এ সংসারের ক্ষীর, সর, দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, মাংস, সকলই তোমরা খাইবে, আমরা কিছু পাইব না কেন? তোমরা মনুষ্য, আমরা বিড়াল, প্রভেদ কি? তোমাদের ক্ষুৎপিপাসা আছে—আমাদের কি নাই? তোমরা খাও, আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু আমরা খাইলেই তোমরা কোন্ শাস্ত্রানুসারে ঠেঙ্গা লাঠি লইয়া মারিতে আইস, তাহা আমি বহু অনুসন্ধানে পাইলাম না।

* * * *

"দেখ, আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি? খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখ, যাঁহারা বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা অনেকে চোর অপেক্ষাও অধার্ম্মিক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি যে মুখ তুলিয়া চাহেন না, ইহাতেই চোরে চুরি করে। অধর্ম্ম চোরের নহে—চোরে যে চুরি করে, সে অধর্ম্ম কৃপণ ধনীর। চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শতগুণে দোষী। চোরের দণ্ড হয়; চুরির মূল যে কৃপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন?"

কমলাকান্তের দপ্তরের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ

একা—হঠাৎ একটি পথিকের সঙ্গীত কমলাকান্তকে মুগ্ধ করিল। সঙ্গীতটি এমন সুন্দর নয়, গায়কও তেমনি সুকণ্ঠ নয়, কিন্তু জ্যোৎস্নাপুলকিত রাত্রিতে কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়া আপন মনের মাধুর্য বিকীর্ণ করিতে করিতে পথিক যে গান গাহিল তাহা কমলাকান্তের হৃদয় আলোড়িত করিল। চারিদিকের আনন্দের মধ্যে কমলাকান্ত একা। রাজপথে জনস্রোত চলিয়াছে, কিন্তু কমলাকান্ত নিঃসঙ্গ। আনন্দের এই উচ্ছ্বসিত ধারার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কমলাকান্ত সকলের সহিত আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন না কেন? পারেন না কেবল তিনি নিঃসঙ্গ বলিয়া।

কিন্তু কমলাকান্ত চিরকালই এইরূপ ছিলেন না। তিনিও একদিন আনন্দ অনুভব করিতেন, সংসারের সব কিছুই সুন্দর দেখিতেন, গান শুনিয়া আনন্দ পাইতেন। বন্ধু-মণ্ডলীর মধ্যে মিশিয়া অকারণে কত হাসি হাসিতেন। এই গান শুনিয়াই মুহূর্তের জন্য বিগত যৌবনের সুখের দিনগুলির কথা মনে পড়িল। হারানো দিনগুলির সুখস্মৃতি মনে পড়ায় তাঁহার মনে আনন্দের সঞ্চার হইল।

কিন্তু এখন জীবনে সে সুখ, সে আনন্দ নাই কেন? সুখের সামগ্রী ত কমে নাই। দীর্ঘজীবনে সঞ্চয় অনেক বাড়িয়া গিয়াছে, তবে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ কমিল

কেন? পৃথিবী আর তেমন ভাল লাগে না। প্রকৃতির রূপরাশিও যেন অনেকটা ম্লান হইয়া গিয়াছে। যাহা এক সময়ে সরস ও মধুর বলিয়া বোধ হইত তাহা এমন শুষ্ক ও অসুন্দর বলিয়া মনে হয় কেন? কোন্ জিনিসের অভাব ঘটিল? অভাব ঘটিয়াছে আশার। যে আশা নয়ন-মন মুগ্ধ করিয়া কল্পনায় কত সুন্দর ছবি দেখাইত সেই আশা আর নাই। সংসারের তিক্ত অভিজ্ঞতায় কমলাকান্ত অনেক জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। জীবনের সায়াহ্নে উপনীত হইয়া তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছেন সংসার একটি পথচিহ্নহীন গভীর অরণ্য। ইহা হইতে নির্গত হইবার কোন উপায় নাই। যাহাকে কেবল সৌন্দর্য-মাধুর্যের আকর বলিয়া মনে হইযাছিল তাহার বীভৎস রূপ নিরীক্ষণ করিয়া এখন তিনি শিহরিযা উঠিয়াছেন। মিথ্যা মায়া মানুষকে কতখানি ভ্রান্ত করে তাহা তিনি এখন অনুভব করিয়াছেন। যে গান শুনিয়া তিনি এইমাত্র আনন্দ অনুভব করিযাছিলেন সেই গানও তিনি আর শুনিতে চান না। সংসারের রস তাঁহার ফুরাইয়া গিয়াছে। সুতরাং সংসার-সঙ্গীত আর তাঁহাকে আনন্দ দিতে পারে না। তাহার পরিবর্তে তিনি আর একটি সঙ্গীত শুনিতে চাহেন। প্রীতি ও প্রেমের সঙ্গীত শুনিবার জন্য এখন তিনি উৎসুক। মনুষ্য জাতির উপর—সকল জীবের উপর—সর্বভূতে যদি তাঁহার প্রীতি থাকে তবে তিনি আর কিছু কামনা করেন না।

প্রথম প্রবন্ধটিতে কমলাকান্ত পরিপূর্ণ নিরাশাবাদী নহেন, আবার সম্পূর্ণ আশা-বাদীও নহেন। জীবনের স্তরগুলি একটি একটি করিয়া অতিক্রম করিয়া শেষ স্তরটিতে উপনীত হইয়া তিনি অনুভব করিয়াছেন তিনি ঠকিয়াছেন। সংসার তাঁহাকে প্রতারিত করিয়াছে। মিথ্যা আশা তাঁহাকে অলীক স্বপ্ন দেখাইয়াছে। কমলাকান্ত সাবধান করিয়া দিতেছেন, তাঁহার যে ভুল হইয়াছে অপরে যেন সেই ভুল না করে। সর্বভূতে অন্তরের প্রীতি বিকশিত করিয়া তুলিতে পারিলে জীবনের চরম সার্থকতা লাভ হয়। ইহার চেয়ে বড় সম্পদ আর কিছুই নাই।

মনুষ্যফল—আফিঙের মাত্রা একটু বেশী চড়াইলেই কমলাকান্তের মনে হয় যে, মানুষগুলি যেন সব ফল। তাহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি এবং প্রয়োজনীয়তা যেন ফলের মতই। কমলাকান্তের প্রথমেই মনে হইল ধনী ব্যক্তিমাত্রেই যেন কাঁঠাল। আঠা, ভুতুড়ি প্রভৃতি অসার পদার্থ প্রচুর থাকিলেও কয়েকটি কোয়া যাহা আছে তাহার লোভে দেওয়ান, গোমস্তা, মোসাহেবের বেশধারী শৃগালের দল সতৃষ্ণনয়নে তাকাইয়া থাকে। এই শৃগালের আক্রমণ হইতে হয়ত বা কাঁঠালটিকে বাঁচান যায়, কিন্তু প্রসাদলোভাতুর ব্যক্তিগণের উৎপাত হইতে বাঁচানই শক্ত। কাঁঠাল ত

আর চিরকাল গাছে রাখিয়া দেওয়া যায় না। তাহাতে কাঁঠাল পচিয়া গলিয়া খসিয়া পড়ে।

সিভিল সার্ভিসের সাহেবগণ আমের তুল্য। অনেকগুলি টক, কিন্তু কিছু কিছু মিষ্টি আমও আছে। অনেকগুলির স্বাদ ভাল নয়, কিন্তু বাহিরে এমন রঙের চটক আছে যে, সেগুলি বেশীদরে বিকায়। এই আমগুলি খাইবার একটি বিশেষ পদ্ধতি কমলাকান্ত আবিষ্কার করিয়াছেন। সেলামের জলে আমগুলিকে ভিজাইয়া খোসা-মোদরূপ বরফ লাগাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া এগুলিকে খাওয়া যায়। তখন এগুলি ভালই লাগে।

অনেকে স্ত্রীজাতিকে কলাগাছের সহিত তুলনা করিয়াছেন। কেহ কেহ স্ত্রীলোককে মাকাল ফলের সহিত তুলনা করিয়াছেন, কিন্তু কমলাকান্তের এ সব তুলনা ভাল লাগে না। তাঁহার মতে সংসার-বৃক্ষে স্ত্রীজাতি হইল নারিকেল। নারিকেল কাঁদি কাঁদি ফলে। নারিকেল ব্যবসাদার কাঁদি কাঁদি কেনে। বিবাহ-ব্যবসায়ী কুলীন ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কেহ কাঁদি কাঁদি পাড়ে না। অল্প বয়সের যুবতীগণ মনে হয় যেন কচি ডাব। উভয়ই স্নিগ্ধ এবং সুন্দর। বিষয়বুদ্ধির শাঁস যতক্ষণ না জন্মে ততক্ষণ ইহাদের গুণের তুলনা নাই। বেশী বয়সের স্ত্রীলোকের বুদ্ধি ঝুনো নারিকেলের কঠিন শাঁসের মত। সহসা তাহাতে দাঁত বসাইতে পারা যায় না। ইহার নামই গৃহিণীপনা। স্ত্রীজাতির বিদ্যা যেন নারিকেলের মালা। চিরদিন ইহাদের অর্দ্ধেকটাই দেখা যায়। স্ত্রীলোকের রূপকে নারিকেলের ছোবড়ার সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে।

গাছে নারিকেলের ছড়াছড়ি। কিন্তু কমলাকান্তের দুর্ভাগ্য যে, তাহার ভাগ্যে নারিকেল জুটিল না। যাহাদিগকে আমরা দেশহিতৈষী বলিয়া মনে করি কমলাকান্তের কাছে তাহারা শিমুল ফুল। বাইরে রঙের চটক আছে, কিন্তু গন্ধ-বঞ্চিত শিমুলে যখন ফল হয় তখন ফল ফাটিয়া তুলা বাহির হইয়া চারিদিক ছড়াইয়া পড়ে। দেশহিতৈষিগণও কেবল বাক্যের তুবড়ী ফুটাইয়া যান, আসল কাজ কিছুই হয় না। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে কমলাকান্ত ধুতুরা বলিয়া মনে করেন। সংস্কৃত বচনের উদ্ধৃতি রচনার মধ্যে একটা নেশা জমাইয়া দেয়। বাঙলার লেখকগণ তেঁতুল। দেশী হাকিমগণ যেন কুমড়া। তাঁহাদের নিজেদের কোন গৌরব নাই। কেহ যদি উপরে তুলিয়া দেন তবে উপরেই থাকিয়া যায়। আবার কেহ কেহ মাটিতে গড়াগড়ি দিতেও অভ্যস্ত।

এই তুলনাগুলির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের নিরঙ্কুশ কল্পনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

বিশেষ বিশেষ ফলের সহিত মানব-সমাজের বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর তুলনা তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয়। প্রত্যেকটি তুলনা যথাযথ ও সার্থক। তুলনাগুলির মধ্যে ব্যঙ্গরস প্রচুর আছে। সে কথা বাদ দিলেও তুলনাগুলির মধ্য দিয়া যে পরিপূর্ণ সঙ্গতি প্রকাশ পাইয়াছে তাহা সত্যই প্রশংসার যোগ্য।

নারিকেলের সহিত স্ত্রীজাতির তুলনা অতিশয় শোভন হইয়াছে। কচি ডাবের সহিত অল্পবয়স্কা যুবতীর রূপের তুলনা বঙ্কিমচন্দ্রের সৌন্দর্যানুভূতির পরিচয় দেয়। নারিকেলের জলের সহিত নারীজাতির স্নেহের তুলনা, প্রেমপ্রীতির মর্যাদাকে আমাদের নিকট সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। নারিকেলের শাঁসের সহিত নারীর বুদ্ধির তুলনা অনুপম। বিশেষ করিয়া ঝুনা নারিকেলের কঠিন শাঁসের সহিত প্রবীণার গৃহিণীপনার তুলনা অত্যন্ত উপভোগ্য হইয়াছে। নারিকেলের মালার সহিত স্ত্রী-জাতির বুদ্ধির তুলনা গৌরবজনক হয় নাই। নারীর রূপের সহিত নারিকেলের ছোবড়ার তুলনা প্রথমটা আমাদের চমকাইয়া দেয়, কিন্তু ইহার গূঢ়ার্থ বিচার করিয়া আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের গূঢ়দৃষ্টির প্রশংসা করিতে বাধ্য হই।

Utility বা উদরদর্শন—এই অদ্ভুত মৌলিক প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা-শক্তি সূক্ষ্ম ও দূরপ্রসারী হইয়া শ্লেষ ও ব্যঙ্গে অপূর্ব হইয়া উঠিয়াছে। হিতবাদের এই অভিনব ব্যাখ্যা উদরদর্শন নামটিতেই পরিস্ফুট। হিন্দু দার্শনিকগণের রীতি অনুসারে কমলাকান্ত এই মৌলিক উদরদর্শনের সূত্র রচনা করিয়াছেন এবং নিজস্ব ভাষ্য রচনার দ্বারা সূত্রগুলির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উদরদর্শনের ছয়টি সূত্র।

(১) জীবশরীরস্থ বিশাল গহ্বরবিশিষ্ট স্থানকে উদর বলে। কমলাকান্ত এই সূত্রের ভাষ্যে প্রত্যেকটি শব্দের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জীবশরীরস্থ বলিবার তাৎপর্য এই যে, পর্বতগুহা প্রভৃতিকে উদর বলা হয় না। আবার নাক, কান প্রভৃতি ক্ষুদ্র গহ্বরগুলিকে যাহাতে কেহ উদর মনে না করে সেইজন্য সূত্রে 'বৃহৎ' কথাটি যোগ করিয়াছেন।

(২) উদরের ত্রিবিধ পূর্তিই পরম পুরুষার্থ। ত্রিবিধ বলিতে কমলাকান্ত আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক এই তিন প্রকারের কথা বলিয়াছেন। অন্নব্যঞ্জন প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী দ্বারা যে উদর-পূরণ তাহা আধিভৌতিক। বড়লোকের বাক্যে প্রলুব্ধ হইয়া আশায় আশায় যে কালক্ষেপণ তাহা আধ্যাত্মিক আর দৈবকৃপায় প্লীহাযকৃৎ পীড়ায় যে উদর-পূরণ তাহা আধিদৈবিক।

(৩) এতৎ মধ্যে আধিভৌতিক পূর্তিই বিধেয়। আধিভৌতিক পূর্তি অর্থাৎ লুচি, সন্দেশ প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থের দ্বারা উদর পূরণই পুরুষার্থ। সুতরাং

উদরের মধ্যে কোন্ কোন্ উপায়ে লুচি, সন্দেশ প্রভৃতি প্রেরণ করা যায় তাহা অতঃপর বিবৃত হইতেছে।

(৪) বিদ্যা, বুদ্ধি, পরিশ্রম, উপাসনা, বল ও প্রতারণা পুরুষার্থ-সাধনের এই ছয়টি উপায়। বিদ্যা বাংলাদেশের স্বতঃসিদ্ধ। ইহার জন্য কোন বাঙালীর পরিশ্রম করিতে হয় না। বুদ্ধি সকলেরই আছে। কেহ কখনও বলে না যে, তাহার বুদ্ধি নাই। সময়মত অন্নব্যঞ্জন ভোজন, নিদ্রান্তে পরিভ্রমণ, ধূমপান, গৃহিণীর সহিত বাক্যালাপ এইসব গুরুতর কার্যসম্পাদনের নাম পরিশ্রম। ক্ষমতাশালী ব্যক্তির গুণকীর্তনের নাম উপাসনা। ক্রুদ্ধ হইয়া হাঁকডাক, মুখে অনর্গল বকা, দূর হইতে কিল-চড় ইত্যাদি প্রদর্শন এইগুলির নাম বল এবং দোকানদার, চিকিৎসক ও ধর্মোপদেষ্টার যে বৃত্তি তাহারই নাম প্রতারণা।

চার নম্বর সূত্রে পুরুষার্থ-সাধনের যে পথগুলির নাম দেওয়া হইয়াছে পঞ্চম সূত্রে কমলাকান্ত পূর্বপণ্ডিতের মতটি খণ্ডন করিতেছেন।

(৫) এই ষড়বিধ উপায়ের দ্বারা উদরপূর্তি বা পুরুষার্থ অসাধ্য। ইহার ভাষ্যে কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়া কমলাকান্ত বলিতেছেন বিদ্যায় যদি উদরপূরণ হইত তবে বাঙলা সংবাদপত্রের অন্নাভাব কেন? বুদ্ধিতে যদি উদরপূর্তি হইত তবে গর্দভ মোট বহিবে কেন? পরিশ্রমে যদি উদরপূর্তি হইত তবে বাঙালী বাবুরা কেরানি কেন? উপাসনায় যদি উদরপূর্তি হইত তবে কমলাকান্ত সায়ংকালীন আফিম পায় না কেন? বলে যদি উদরপূর্তি হইত তবে আমরা পড়িয়া পড়িয়া মার খাই কেন? প্রতারণায় যদি উদরপূর্তি হইত তবে মদের দোকান ফেল পড়ে কেন?

(৬) উদরপূর্তি বা পুরুষার্থ কেবল হিতসাধনের দ্বারা সাধিত হয়। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ লোকের কানে মন্ত্র দিয়া হিতসাধন করেন। ইউরোপীয় জাতিগণ বন্য-জাতির হিতসাধন করিতেছেন, রুশ মধ্য-এশিয়ার হিতসাধনে নিযুক্ত। কেহ পুস্তক লিখিয়া ও সংবাদপত্র ছাপাইয়া দেশের হিতসাধন করিতেছেন। সকলেই হিতসাধনে ব্যস্ত এবং সকলেরই প্রচুর পরিমাণে উদরপূর্তি হইতেছে।

কমলাকান্ত আশা করেন যে, তাঁহার এই উদরপূর্তি দর্শনের সহিত হিতবাদ দর্শনের প্রচুর মিল আছে। সাংখ্য, বেদান্ত, ন্যায়, মীমাংসা, পাতঞ্জল, বৈশেষিক ভারতের এই ষড়দর্শনের সঙ্গে কমলাকান্তের এই দর্শনটি সপ্তম দর্শন বলিয়া পরিগণিত হইল।

পতঙ্গ—নসীরামবাবুর বৈঠকখানায় সেজ জ্বলিতেছে। চারিদিকে নানাপ্রকার গল্প চলিতেছে। কমলাকান্ত একটু বেশী মাত্রায় আফিম সেবন করিয়া ফেলিয়াছেন। দলাদলিতে চটা উপলক্ষ্যমাত্র, অনাদিকালের নিয়মবশতঃই যে কমলাকান্ত আফিমের

মাত্রা চড়াইয়া ফেলিয়াছেন সেবিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। আফিমের নেশায় ঝিমাইতে ঝিমাইতে কমলাকান্ত দেখিলেন যে, একটি পতঙ্গ সেই সেজটির চারিদিকে বোঁ-ও-ও বোঁ-ও-ও শব্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কমলাকান্ত বহু চেষ্টা করিয়াও পতঙ্গের ভাষার তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া পতঙ্গের নিকট আপনার অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন। তখন আফিমের প্রভাবে তাঁহার দিব্যকর্ণ লাভ ঘটিল। তিনি শুনিতে পাইলেন যে, পতঙ্গ তাঁহাকে চপ করিতে বলিতেছে, কারণ সে আলোর সহিত কথা কহিতেছে।

কমলাকান্ত শুনিলেন যে, পতঙ্গ বলিতেছে—আলো, তুমি যখন নিরাবরণ প্রদীপ-মাত্র ছিলে, তখন তোমাতে ছুটিয়া মরিতে পারিতাম। কিন্তু এখন সেজের মধ্যে প্রবেশ করায় আর পুড়িয়া মরিতে পারি না।

অগ্নিশিখায় পুড়িয়া মরা আমাদের চিরকালীন অধিকার। তবে কেন তুমি কাচের আবরণে আপনাকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া আমাদের পুড়িয়া মরার পথ বন্ধ করিলে? আমরা ত হিন্দুর মেয়ে নই। আমরা সাধ আশা থাকিতেও পুড়িয়া মরিতে প্রস্তুত। আমাদের সহিত স্ত্রীজাতির একটিমাত্র সাদৃশ্য এই যে, তাহারাও আমাদের মতই জলন্ত রূপশিখায় আত্মবিসর্জন করে। অবশ্য তাহারা সেই দাহে সুখলাভ করে। কিন্তু আমরা কেবল পুড়িয়া মরিবার জন্যই পুড়িয়া মরি। আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। রূপবহ্নিতে আত্মসমর্পণ না করিলে এ দেহের প্রয়োজন কোথায়? বিশ্বের অপর কোন বস্তুতে এত বৈচিত্র্য নাই। তাহা পুরাতন হইয়া যায়। সুতরাং হে আলো, তোমার কাচের আবরণ দূর কর, আমি পুড়িয়া মরিতে পারি।

আমার এ আকাঙ্ক্ষা একান্ত ক্ষুদ্র। তুমি শিখা, তুমি পোড়াইবে না কেন? আমি পতঙ্গ, আমি পুড়িব না কেন? তোমাকে ঢাকিয়া রাখে এমন বস্তু পৃথিবীতে নাই। তবে কেন কাচের এই তুচ্ছ আবরণ? এই আবরণ ভেদ করিয়া আত্ম-প্রকাশ কর।

তোমার স্বরূপ কি আমার জানা নাই। কিন্তু অহরহ তোমার কথাই ধ্যান করিতেছি। আমার জীবনের অস্তিত্ব তোমার মধ্যে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য উন্মুখ। তুমি কাচের ভিতর রহিয়াছ। কিন্তু তোমাকে আমি একদিন পাইবই। এখন যাইতেছি, কিন্তু আবার আসিতেছি।

পতঙ্গ উড়িয়া গেল। কমলাকান্ত শুনিলেন যে, নসীরামবাবু তাঁহাকে

ডাকিতেছেন। নেশার ঘোরে তিনি তাঁহাকে যেন চিনিতে পারিলেন না—যেন মনে হইল তাঁহার সহিত পতঙ্গের সাদৃশ্য রহিয়াছে।—কমলাকান্তের বোধ হইতে লাগিল যে, মনুষ্যমাত্রেই পতঙ্গ এবং তাহারা বিশেষ বিশেষ বহ্নির অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। জ্ঞান, ধন, মান, রূপ, ধর্ম, ইন্দ্রিয়—সারাবিশ্বে নানা বহ্নি বর্তমান। কেহ তাহার মধ্যে ছুটিয়া গিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। আবার কেহ বা কাচের মতো নানা বাহ্য আবরণে প্রতিহত হওয়ায় রক্ষা পাইতেছে।

বহ্নির দাহ চৈতন্যদেব, গ্যালিলিও, সক্রেতিস প্রমুখ মহামানবকে পুড়াইয়া মারিয়াছে। মহাভারতে দুর্যোধন মান-বহ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছে; প্যারাডাইস লষ্ট জ্ঞান-বহ্নির দাহ। সেণ্টপল, আণ্টনি, ক্লিওপেট্রা, রোমিও ও জুলিয়েট, ওথেলো ও গীতগোবিন্দ, বিদ্যাসুন্দর যথাক্রমে ধর্ম, ভোগ, রূপ, ঈর্ষা ও ইন্দ্রিয়ের বহ্নিতে জ্বলিতেছে,—আমাদের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বারবার প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে। তবুও আমরা অনির্বচনীয় ঈশ্বরের স্বরূপ-আবিষ্কারের ব্যর্থ প্রচেষ্টা করিয়া থাকি। আমরা পতঙ্গ ছাড়া আর কি?

ব্যর্থ ভ্রমণের কোন সার্থকতা নাই। বহ্নিতে পুড়িয়া মরাই জীবনের কৃতার্থতা। অতএব এস, সেই পুড়িয়া মরিবার সাধনা করি—না পারিলে, দূরে চলিয়া গিয়া নূতন করিয়া শক্তি সংগ্রহ করিব।

আমার মন—কমলাকান্তের মন চুরি গিয়াছে। কোথায় গেল মন? রন্ধনশালায় কি? ইলিশ মাছের লোভে, সন্তর্পিত ছাগমাংসের সুরভিত ব্যঞ্জন, লুচি ও সন্দেশের লোভে মন মাঝে মাঝে পাকশালায় যায় বটে, কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল এবার মন সেখানে যায় নাই। তবে কি প্রসন্ন গোয়ালিনী মন চুরি করিয়াছে? কিন্তু কমলাকান্তের তাহার সহিত সম্বন্ধ যে রসের—একথা সকলেই বলাবলি করে। কমলাকান্তও স্বীকার করিতেছেন যে, প্রসন্নর সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা মূলতঃ গব্য রসের। প্রসন্ন ও তাহার দুগ্ধবতী গাভী উভয়েই তুল্যভাবে কমলাকান্তের প্রিয়পাত্রী। মনের সন্ধানে কমলাকান্ত পথে বাহির হইলেন। কোন যুবতীও তাঁহার মন আহরণ করে নাই। ইহা কি কাহারও চুরি করিবার জিনিস?

এ সংসারে কোন কিছুতে আর কমলাকান্তের মন নাই। শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে তাঁহার মন নাই, রহস্যালাপে মন নাই, অধ্যয়নে মন নাই। অর্থসংগ্রহে কখনই মন ছিল না, এখনও নাই। কিছুতেই যখন মন ছিল না, তখন মন কোথায় গেল?

আসল কথা মনের বন্ধন চাই, নহিলে মন উড়িয়া যায়। কোন কিছুতেই যখন মন বাঁধা পড়ে নাই সে মনের খোঁজ পাইবে কি করিয়া? যে চিরকাল আপনার রহিল কখনও পরের হইল না তাহার পৃথিবীতে সুখ কোথায়? আত্মপ্রিয় হইয়া কেবল আত্মাদর করিয়া কেহ কখনও সুখী হইতে পারে না। এখন কমলাকান্ত বুঝিতেছেন পরের জন্য আত্মবিসর্জন না করিতে পারিলে পৃথিবীতে স্থায়ী সুখ পাওয়া যায় না। অর্থ, মান প্রভৃতিতে সুখ আছে বটে, কিন্তু তাহা অস্থায়ী। পৃথিবীতে যেগুলিকে আমরা কাম্যবস্তু বলিয়া মনে করি তাহা তৃপ্তি দিতে পারে না বরং দুঃখ দেয়। যশ চাহিলেই নিন্দা আসিবে, ইন্দ্রিয় সুখ চাহিলেই রোগ আসিবে। ধনের আকাঙ্ক্ষা ক্ষতি ও মনস্তাপ আনিবে। সুনাম চাহিলে কলঙ্ক সহ্য করিতে হইবে। একথা কি আজ পর্যন্ত কেহ বলিতে পারিয়াছে যে, ধনোপার্জন করিয়া কেহ সুখী হইয়াছে। অথচ শৈশব হইতেই মাতৃস্তন্যদুগ্ধের সঙ্গে সঙ্গে ধনমানের আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে প্রবেশ করে। শিশু দেখে তাহার পিতামাতা, ভাই, ভগিনী, গুরু, শিষ্য, শত্রু, মিত্র রাত্রিদিন সকলেই হা অর্থ, হা মান করিয়া প্রাণপাত করিতেছে। কিন্তু চিন্তা করিলে একথা সকলেই বুঝিবে, পরসুখবর্ধন ভিন্ন মানুষের স্থায়ী সুখ নাই। কমলাকান্ত দৃঢ়কণ্ঠে বলিতেছেন, মানুষ একদিন বুঝিবে পরের সুখ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টাতেই মানুষের যথার্থ স্থায়ী সুখ। তাঁহার আশা একদিন ফলিবে, কিন্তু সে কোন্ সুদূর ভবিষ্যতে তাহা জানা নাই।

আড়াই হাজার বৎসর আগে শাক্যসিংহ এই কথা বলিয়াছিলেন। তারপর শতসহস্র শিক্ষক বারবার এই কথা প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু লোকে একথা কিছুতেই বুঝে না। আত্মাদরের মায়া কাটাইয়া উঠিতে পারে না। তারপর ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজী সভ্যতার ফলে বাহ্য সম্পদের উপর আসক্তি এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, দেশ যে উৎসন্নে যাইতেছে তাহা কেহ লক্ষ্য করিতেছে না। সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত কেবল বাহ্য সম্পদের পূজা। বাণিজ্য বৃদ্ধি কর, হিন্দুস্থানের উপর দিয়া রেল লাইনের জাল পাতিয়া দাও, টেলিগ্রামের তারে দেশ ছাইয়া ফেল। কিন্তু এই বাণিজ্য, রেল ও টেলিগ্রাম মানুষের মনের সুখ কতখানি বাড়াইতে পারিবে? ধনতৃষ্ণার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা কি ইহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিবে, ক্ষুণ্ণ ও অপমানিতকে কি শান্তি ও সান্ত্বনা দিতে পারিবে? যে রূপোন্মাদ তাহার অভীষ্ট কি ইহাতে পূর্ণ হইতে পারিবে? অথচ টাকা টাকা করিয়া সমস্ত দেশ পাগল। টাকা উপার্জন কর, টাকার রাশির উপর টাকা ঢাল, যে পথে টাকা বাড়ে সেই পথে যাও, শূন্য হইতে টাকার বৃষ্টি হউক। টাকার ঝনঝনিতে ভারতবর্ষ পূর্ণ হউক।

মন—মন আবার কি? টাকা ছাড়া আমাদের মন নাই। টাকশালেই আমাদের মন ভাঙে গড়ে। সমস্ত দেশ টাকার পূজাতেই মত্ত। এ পূজার পুরোহিত ইংরেজ। ইহার পুরাণ ও তন্ত্র এডাম্ স্মিথ ও মিল। দেশী বিদেশী খবরের কাগজ এ পূজার ঢাক ঢোল কাঁসি। শিক্ষা ও উৎসাহ ইহার নৈবেদ্য এবং হৃদয় ইহার বলি। এই পূজার ফল ইহলোকে ও পরলোকে অনন্ত নরক।

প্রতিপক্ষ এই কথা বলিবেন যে, উদর নামক যে বৃহৎ গহ্বর আছে, ইহাকে ত প্রত্যহ ভর্তি করিতে হইবে। এই গর্ত যাহাতে ভালভাবে বুজে তাহার জন্য চেষ্টা করায় দোষ কি? কিন্তু কমলাকান্ত বলিতে চান যে, আর সকল কথা ভুলিয়া গিয়া কেবল গর্ত বুজাইবার চেষ্টায় সকলে পাগল হইয়া উঠিলে চলিবে কেন? গর্তের এক কোণ যদি খালি থাকে সেও ভাল, অন্যদিকে একটু মন দেওয়া প্রয়োজন। কমলাকান্ত চিরকাল গর্ত বুজাইবার চেষ্টাই করিয়াছে, পরের জন্য ভাবে নাই। সেইজন্য সংসারে আজ তাহার সুখ নাই, পৃথিবীতে থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই। পরের বোঝা ঘাড়ে করিতে হইবে বলিয়া কমলাকান্ত সংসার করেন নাই। তাহার ফল হইয়াছে এই যে, সংসারে তাহার মন নাই, পৃথিবীতে তাহার সুখ নাই। পরের বোঝা যার ঘাড়ে নাই, সুখে তাহার অধিকার নাই।

যাহারা বিবাহ করিয়াছে তাহারা যেন মনে না করে যে, বিবাহ করিয়াছে বলিয়াই তাহারা সুখী। পারিবারিক স্নেহ যদি মানব মনের আস্বাদর নষ্ট করিতে না পারে, আত্মপরিবারকে ভালবাসিতে ভালবাসিতে যদি সমস্ত মনুষ্যজাতিকে ভাল না বাসিতে পারা যায়, বিবাহ যদি মনুষ্যচরিত্রের উৎকর্ষসাধন না করিতে পারে তবে সংসারী হইয়াও যথার্থ সুখী হওয়া যায় না।

চন্দ্রালোকেঃ এই প্রবন্ধটি কমলাকান্তের দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত হইলেও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা নয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার চারিদিকে যে একটি লেখকগোষ্ঠী সৃষ্টি করিয়াছিলেন, অক্ষয়কুমার সরকার তাঁহাদের অন্যতম। এই প্রবন্ধটি অক্ষয়কুমারের লেখা। কমলাকান্তের রচনাভঙ্গী অক্ষয়কুমার যে সার্থকভাবে অনুকরণ করিতে পারিয়াছিলেন এই প্রবন্ধটি তাহার নিদর্শন। অবশ্য মাঝে মাঝে এই প্রবন্ধটি বিচিত্র তথ্যের প্রাচুর্যে ভারাক্রান্ত হইয়াছে, কিন্তু মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝলকের মত বঙ্কিমের নিজস্ব বাগ্‌ভঙ্গীটির নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হয় বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত করিবার সময় বঙ্কিমচন্দ্র অক্ষয়কুমারের লেখাটি মাঝে মাঝে মেরামত করিয়া লইয়াছেন। চন্দ্রালোকিত একটি রাত্রিতে কমলাকান্ত প্রাচীনকাব্যের নায়ক-নায়িকার কথা ভাবিতেছিলেন। কমলাকান্তের জন্য কেহ ত অভিসারে বাহির হইল না। চন্দ্রের

সাতাশটি পত্নী কিন্তু কমলাকান্তের একটিও নাই। অশ্লেষা ও মঘা এই দুইটি কমলাকান্তের হইলে চলিত। এখন দেশে প্রাচীন কৌলিন্য প্রথা লোপ পাইয়াছে। তৎপরিবর্তে ভাল পাশ-করা বরই পরম কুলীন। এই প্রকার বর প্রচুর দানসামগ্রীর সহিত একটি নির্বোধ নববধূ লাভ করিয়া থাকেন। কমলাকান্ত এইরূপ বিবাহে রাজী নন। সন্তানলাভের জন্য বিবাহ করিতে হইলে মৎস্য বিবাহ করাই ভাল। টাকার জন্য টাকশালের অধ্যক্ষকে বিবাহ করিলেই হয়। আর সৌন্দর্যের জন্য বিবাহ করিতে হইলে চাঁদ ছাড়া আর কেহ কমলাকান্তের চোখে পড়ে না। চাঁদই সমস্ত আকাশের শোভা। কমলাকান্ত চাঁদকেই বিবাহ করিতে চায়। কিন্তু চাঁদ যে পুরুষ! হঠাৎ কমলাকান্তের মনে পড়িল বিলাতি মতে চাঁদ স্ত্রী। কে যে পুরুষ আর কে যে স্ত্রী ইহা নির্ণয় করা বড় শক্ত কথা। যে নবাব রাজ্য ও স্বাধীনতা হারাইয়া মাসোহারা পাইয়াও বিলাসে মজিয়া আছেন তিনি পুরুষ, আর যে মহিষী নিজের দেশের প্রতি অনুরাগের বশবর্তী হইয়া আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া অপরিচিত স্থানে বাস করেন তিনি নারী। *দেশের জন্য প্রাণ দিল আর দেশের প্রতি* বিশ্বাসঘাতকতা করিল এই দুইজনের মধ্যে কে নারী কে পুরুষ? কমলাকান্তের এখন নিজেরই সন্দেহ হইতেছে যে, তিনি নিজে পুরুষ না স্ত্রী। চন্দ্র যদি পুরুষ হয় তবে তিনি স্ত্রী, আর চন্দ্র যদি স্ত্রী হয় তবে তিনি পুরুষ। যাহাই হউক কমলাকান্ত চাঁদকে কিছু উপদেশ দিতেছেন। যাহারা দুঃখবেদনায় কাতর চাঁদ যেন তাহাদের কাছে নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। চন্দ্রকে বিবাহ করিয়া কমলাকান্ত lunatic আখ্যা পাইতেও রাজি। বৈজ্ঞানিকের চক্ষে চাঁদ পাষাণী। কিন্তু তাহা হইলেও চাঁদকে তিনি বিবাহ করিবেন। চাঁদ যদি অভিমান করে কমলাকান্ত তখন শত শত বিবাহ করিয়া ফেলিবেন। বিবাহে রীতিনীতি এখন তাঁহার জানা হইয়া গিয়াছে। নব-মল্লিকা, পদ্ম, ঝর্ণা লতা—সংসারে পাত্রীর অভাব কি? নিজে ত বিবাহ করিতে পারিবেনই, এমন কি অপরের বিবাহে ঘটকালিও করিতে পারেন।

বসন্তের কোকিল—বসন্তের কোকিল কেবল বসন্তেরই—দারুণ শীত বা ঘোরতর বর্ষায় তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সংসারেও এরূপ লোক বিস্তর আছে যাহারা কেবল সুখের সময় আসিয়া জুটে, কিন্তু দুঃখ দেখা দিলে চারিদিকে ছুটিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। কোকিল যে কু করিয়া ডাকে তাহার অর্থ কি? তাহার চোখে সকলই কু, কিছুই সুন্দর নয়। কোকিল সুখের দিনের সঙ্গী, কোকিল নিন্দুক কিন্তু মিষ্টকণ্ঠে ডাকে বলিয়া কোকিলের ডাক সকলেই শুনিতে চায়। সংসারে গলা-বাজির জিত বরাবরই। তাহার উপর স্বর যদি মিষ্ট হয় ত

কথাই নাই। কোকিল যাহাই বলুক তাহার মিষ্ট স্বরকে কেহ উপেক্ষা করিতে পারে না।

কোকিল যেমন মনের আনন্দে ডালে ডালে গাহিয়া বেড়ায় কমলাকান্তেরও ইচ্ছা হয়, তিনিও মনের আনন্দে লিখিয়া যান। কোকিল যে কাহাকে ডাকে তাহা কোকিল জানে না। কমলাকান্ত যে কাহাকে ডাকেন তাহা তিনিও নিজে জানেন না। কোকিলের মত কণ্ঠ পাইলে কমলাকান্ত হয়ত অনেক কথা বলিতে পারিতেন। তিনি যখন তাহা পারিলেন না তখন কোকিলই না হয় একবার তাঁহার হইয়া ডাকুক।

স্ত্রীলোকের রূপ—রমণীকুল নিজেদের রূপের গৌরবে মাটিতে পা দেন না। তাঁহারা মনে করেন যে, তাঁহাদের রূপ বুঝি অসাধ্য সাধন করিতে পারে। কেবল সৌন্দর্যাভিমানী রমণীর এইরূপ ধারণা নয়, অনেক পুরুষের ধারণাও এইরূপ। নারীর রূপের বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলে পৃথিবীতে এমন বস্তু নাই যাহার সহিত নারীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের তুলনা কবিগণ না দিয়া থাকেন। কমলাকান্ত মনে করেন যে, এ সব বড়ই বাড়াবাড়ি। নারীর গমনভঙ্গী দেখিয়া তাঁহাকে গজেন্দ্রগামিনী বলা কমলাকান্তের সহ্য হইতেছে না। সেজন্য রহস্য করিয়া তিনি বলেন যেদিকে এখনও রেলপথ হয় নাই সেইদিকে বাছিয়া বাছিয়া গজেন্দ্রগামিনীদের ডাক বসাইলে কেমন হয়।

এককালে কমলাকান্তও নারীর রূপের উপাসক কবি ছিলেন। কিন্তু এখন তাঁহার মোহ ভঙ্গ হইয়াছে। তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছেন। জেলের পচাজাল ছিঁড়িয়া রাঘব বোয়াল যেমন ভাবে পালায়, মাকড়শার জাল ছিঁড়িয়া গুব্‌রে পোকা যেভাবে পলায়ন করে, রমণীরূপের মোহের জাল ছিঁড়িয়া কমলাকান্তও তেমনি পলায়ন করিয়াছেন।

যে যাহাই মনে করুক আফিমের কৃপায় কমলাকান্ত এবার কিছু সত্য কথা শুনাইবেন। যাহার যে বস্তু আছে সে তাহার জন্য লালায়িত হয় না। যাহার নিজের চুল সুন্দর সে পরচুলা পরিবে কেন? যাহার উজ্জ্বল দাঁত আছে তাহার বাঁধানো দাঁতে দরকার কি? যাহার বর্ণ নয়নরঞ্জন তাহার রঙ মাখিয়া লাবণ্য বৃদ্ধির প্রয়োজন কি? কমলাকান্ত দেখিয়া শুনিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সৌন্দর্যের বড়ই অভাব। সেইজন্য সর্বদাই তাহারা নিজেদের রূপ বাড়াইতে ব্যস্ত। অলংকার দিয়া তাহারা নানা অঙ্গের শোভা বৃদ্ধি করেন। পুরুষ বিনা অলংকারেই সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু স্ত্রীলোক অলংকার ছাড়া মনুষ্য সমাজে মুখ দেখাইতে লজ্জা পায়। নিজেদের ব্যবহারেই রমণীগণ প্রমাণ করিয়া দিতেছে, যে, পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য নিকৃষ্ট।

সৃষ্টিপদ্ধতি আলোচনা করিলেও আমাদের এই সিদ্ধান্ত যথার্থ বলিয়া মনে হয়। যে চমৎকার চন্দ্রকলাপ ময়ূরের আছে তাহা ময়ূরীর নাই। যে কেশর সিংহের শোভা বৃদ্ধি করে তাহা সিংহীর নাই। বৃষের ঝুঁটি আছে কিন্তু গাভীর তাহা নাই। উচ্চশ্রেণীর জীবগণের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ সুশ্রী। কমলাকান্ত মনে করেন না যে, মানুষ সৃষ্টি করিতে গিয়া সৃষ্টিকর্তা এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছেন। তারপর সৌন্দর্যের শোভাবৃদ্ধি হয় যৌবনে। কিন্তু স্ত্রীলোকের যৌবন কতদিন? চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশে পুরুষের যে শ্রী থাকে নারীর তাহা থাকে না। বেশভূষা-রূপ তেঁতুল মাখিয়া আদালবণের ছিটা দিয়া বুকরি চালের ঠাণ্ডা ভাত যেমন খাইতে হয় অতিক্রান্তযৌবনা নারীকে লইয়াও তেমনি ঘর করিতে হয়। কাব্যে, সাহিত্যে রমণীরূপের যে এত প্রশংসা তাহার একমাত্র কারণ যে, লেখকগণ অধিকাংশই পুরুষ। তাহারা প্রীতির চক্ষে দেখিয়াছে। তাহাদের মনের মোহ রমণীর রূপের বর্ণনা করিয়াছে। রূপ রূপ করিয়া স্ত্রীলোকের সর্বনাশ হইয়াছে। সকলেই ভাবে রূপই বুঝি নারীর মহামূল্য ধন। কিন্তু কমলাকান্ত মনে করেন, ক্ষণস্থায়ী রূপ নারীর সর্বস্ব নয়। নারীর গুণই কমলাকান্তের নিকট রূপ অপেক্ষা সহস্রগুণে আদরণীয়। নারী সহিষ্ণুতা, ভক্তি ও প্রীতির মূর্তি। সন্তানের জন্য জননীর কষ্ট, জননীর দুঃখবরণ, আর্ত ও পীড়িত আত্মীয়বর্গের সেবা ও শুশ্রূষার জন্য নারীর বিনিদ্র রাত্রিযাপন কে না দেখিয়াছে! পতিপুত্রের জন্য জীবনবিসর্জন, ধর্ম ও আদর্শের জন্য বাহ্যসুখবিসর্জন নারী যেমন অনায়াসে করিতে পারে তাহাতে নারীর মহত্ত্বই সূচিত হয। বেশীদিনের কথা নয় আমাদের দেশের পতিব্রতা রমণীগণ স্বামীর চিতায় হাসিযা পুড়িয়া মরিয়াছেন। কোমলাঙ্গী বঙ্গললনাগণ যে দেশে এইভাবে প্রাণবিসর্জন করিতে পারিতেন তাহাদের সে দেশে মহত্ত্বের বীজ নিহিত আছে। এই দেশের মহিলার পক্ষে মিথ্যা রূপের বড়াই অশোভন।

কমলাকান্তের দপ্তরে স্থান পাইলেও 'স্ত্রীলোকের রূপ' এই নিবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা নয়। ইহা রচনা করিয়াছেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। রাজকৃষ্ণের রচনা বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত করিবার সময় বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই ভাল করিয়া দেখিয়া দিয়াছেন। মাঝে মাঝে একটু অদলবদলও করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কমলাকান্তের ভাব, ভাষা ও ভঙ্গী রাজকৃষ্ণ সার্থকভাবে নিজস্ব করিয়া লইতে পারিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে কেহ বলিয়া না দিলে রচনাটি যে বঙ্কিমচন্দ্রের নয় তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

ফুলের বিবাহ—নসীরামবাবুর ফুলবাগানে বসিয়া নেশার ঘোরে কমলাকান্ত একটি বিবাহ দেখিলেন। যেমন যেমন দেখিয়াছেন তাহার যথার্থ বর্ণনা করিতেছেন।

বিবাহের কন্যা মল্লিকা, তাহার কলিকা-অবস্থা প্রায় শেষ, প্রায ফুটিবার সময় হইয়া আসিয়াছে, কন্যার পিতা সামান্য লোক। পরপর অনেকগুলি কন্যার বিবাহ দিতে হইবে কিন্তু সম্বল তেমন কিছুই নাই। অনেক জায়গায় বিবাহের কথা হইতেছিল কিন্তু কোনটাই স্থির হয নাই। রাজা স্থলপদ্ম পাত্র উৎকৃষ্ট বটে। কিন্তু জবা তাহার বড় বাধা—সতীনের ঘরে কন্যাকর্তা মেযে কি করিয়া দিবেন? গন্ধরাজ পাত্র ভাল বটে কিন্তু বড় দেমাক্। এমন সময ভ্রমর ঘটক হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মেয়ে আছে? মল্লিকাগাছ পাতা নাড়িয়া সায় দিল, আছে। ঘটক মেযে দেখিতে চাহিল। ঘোমটা-পরা মেয়ে দেখিযা খুসী হইল না, মুখ খুলিতে বলিল, কিন্তু মেয়েগুলি বড় লাজুক, মুখ দেখিতে হইলে ঘটককে একটু অপেক্ষা করিতে হয। ঘটক স্থলপদ্মের বৈঠকখানায় গিযা বসিল, তখন মল্লিকার দিদিঠাকুরাণী সন্ধ্যা আসিয়া মল্লিকাকে বুঝাইল—দিদি, একবার ঘোমটা খোল নহিলে বর আসিবে না, অনেক সাধ্যসাধনায অবশেষে মল্লিকা মুখ খুলিল। ঘটক আসিয়া দেখিল, দেখিয়া কন্যার গুণে মুগ্ধ হইল। কিন্তু কন্যার পিতা মধু দিতে পারিবে ত? কন্যাকর্তা শাখা নাড়িযা বলিল—সব কড়ায গণ্ডায় দেব, কিন্তু বর কে? ঘটক জানাইল—বর গোলাপ লাল গঙ্গোপাধ্যায, একেবারে ফুলে মেলের কুলীন, তারপব আবার সাক্ষাৎ বাগ্না মালীর সন্তান। এক দোষ কিছু কাঁটা আছে, তা কাঁটা কোন্ ফুলে বা কোন্ কুলে নেই?

ঘটক সম্বন্ধ স্থির করিয়া ভোঁ করিয়া উড়িয়া গোলাপের বাড়ীতে খবর দিল। গোলাপ বিবাহের কথায় খুসী হইয়া কন্যার বয়স জিজ্ঞাসা করিলে ঘটক বলিল—আজকালই ফুটিবে।

গোধূলি লগ্নে বিবাহ, মৌমাছি সানাই বাজাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু রাত-কাণা বলিয়া সঙ্গে যাইতে পারিল না।—উচ্চিংড়া নহবত বাজাইল, জোনাকি আলোর ঝাড় সাজাইল, বরযাত্র অনেকেই গেল, কিন্তু স্থলপদ্ম সন্ধ্যার পর অসুস্থ হইযা পড়ায় যাইতে পাড়িল না, জবা করবী সকলেই সাজসজ্জা করিয়া চলিল। চাঁপা গরদের জোড় পরিয়া আসিল। বেলার উগ্র গন্ধে মনে হইতেছে সে ব্র্যাণ্ডি টানিয়া আসিয়াছে। গন্ধরাজ গন্ধে দেশ মাতাইতে লাগিল। অশোক নেশায় লাল লইযা আসিয়া উপস্থিত। সকলের সঙ্গে একপাল পিঁপড়ে আসিল। তাহাদের দাঁতে বড জ্বালা, সব বিবাহে এই রকম কিছু কিছু বরযাত্রী আসে।

কমলাকান্তেরও নিমন্ত্রণ ছিল, তিনিও গেলেন। কমলাকান্ত গিয়া দেখিলেন বর-পক্ষের বড় বিপদ। বাতাস বাহকের বায়না লইয়াছিল, কিন্তু কার্যকালে কোথায়

লুকাইল আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। মল্লিকাদিগের কুল যায় দেখিয়া কমলাকান্ত বরযাত্রী সকলকে লইয়া মল্লিকাপুরে গেলেন। কন্যার বাড়ীতে কন্যার সকল ভগিনী আহ্লাদে ঘোমটা খুলিয়া সুখের হাসি হাসিতেছে। মালতী, বকুল, যুথী, রজনীগন্ধা প্রভৃতি এয়োগণ স্ত্রীআচার করিল। নসীবাবুর নবমবর্ষীয়া কন্যা কুসুমলতা পুরোহিত। কন্যাকর্ত্তা কন্যা সম্প্রদান করিতেই পুরোহিত দুইজনকে একসূতায় গাঁথিয়া ফেলিল।

এবার বাসর। প্রাচীনা ঠাকরুণ-দিদি টগর রসিকতা করিতে করিতে শুকাইয়া উঠিল। রঙ্গনের রাঙ্গা মুখে হাসি ধরে না। যুঁই কন্যার কাছ ঘেঁষিয়া বসিল। বকুল একে বয়সে ছোট, তার গুণের তুলনায় রূপ কম। সে একপাশে গিয়া বসিল। ঝুমকা ফুল বড় মানুষের গৃহিণীর মত আসর জমকাইয়া বসিল।

এই সময় কুসুমলতা কমলাকান্তকে হাত দিয়া ঠেলিতে লাগিল—কাকা, ওঠ, চল বাড়ী যাই। কমলাকান্তের চমক ভাঙ্গিল। সেই পুষ্পবাসর কোথায়? সেই হাস্য-মুখী পুষ্পসুন্দরীগণ কোথায়? সব যেন স্বপ্নের মত মিলাইয়া গেল। কিন্তু সবই কি মিলাইয়াছে? কুসুমলতা যে মালা গাঁথিয়াছিল, কমলাকান্ত দেখিলেন সেই মালায় বরকন্যা গাঁথা রহিয়াছে।

বড় বাজার—কমলাকান্ত নসীরামবাবুর গৃহে আসিয়া অবাধে প্রসন্ন গোয়ালিনীর নিকট দুধ, দই, ক্ষীর, সর প্রচুর পাইতেছেন। প্রত্যহই খাইবার সময় মনে করিতেন, পরলোকে সদ্গতির জন্যই প্রসন্ন ব্রাহ্মণকে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য খাওয়াইয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতেছে। কমলাকান্ত প্রত্যহ প্রসন্নর স্বর্গের জন্য দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু কি ভয়ানক! এখন প্রসন্ন মূল্য চাহিতেছে! যেদিন প্রসন্ন প্রথম মূল্য চাহিল, সেদিন কমলাকান্ত রসিকতা বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। দ্বিতীয় দিনে বিস্মিত হইলেন। তৃতীয় দিনে ক্রুদ্ধ হইয়া গালি দিলেন। প্রসন্ন দুগ্ধ দেওয়া বন্ধ করিয়াছে। এতদিনে কমলাকান্ত ঠেকিয়া শিখিলেন যে, মনুষ্যজাতি নিতান্ত স্বার্থপর। ভক্তি, প্রীতি, স্নেহ, প্রণয় সবই আকাশকুসুম। প্রসন্নর দই, দুধ আছে। আর কমলাকান্তের ক্ষুধা আছে। ইহার মধ্যে মূল্যের কথা কি করিয়া আসে? তাহা প্রথম কমলাকান্ত বুঝিতে পারেন নাই। এখন বুঝিতে পারিতেছেন যে, সকল সামগ্রী মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয়। দুধ, দই, চাল, ডাল, বিদ্যা, বুদ্ধি, যশ, মান, ধর্ম্ম এগুলি মূল্য দিয়া কিনিতে হয়। যদি বিষ খাইয়া মরিতে ইচ্ছা কর, তাহাও তোমাকে মূল্য দিয়া কিনিতে হইবে?

বিশ্বসংসার একটি বাজার, সকলেই দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছে।

সকলেরই উদ্দেশ্য নিজের মাল বেচিয়া মূল্য লাভ করা, বেশী দামে পচা মাল চালাইবার চেষ্টা সকলের। সস্তা খরিদের অবিরত চেষ্টার নামই মানব জীবন।

কমলাকান্ত ভাবিয়া-চিন্তিয়া মনের দুঃখে আফিং-এর মাত্রা চড়াইলেন। তাঁহার দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া গেল। কমলাকান্ত দেখিলেন, সংসারে কেবল দোকানদার আর খরিদদাব, সকলেই পরস্পরকে অঙ্গুষ্ঠ দেখাইতেছে। পৃথিবীর রূপসীগণ রুই, কাৎলা, মৃগেল, ইলিশ, কই, মাগুর, পুঁটি হইযা খরিদদারের জন্য লেজ আছড়াইযা ধড়ফড করিতেছে। বেলা বাড়িতেছে আর মাছগুলি খাবি খাইতেছে। রকমারি মাছেব গুণাগুণ বর্ণনা করিযা মেছুনি হাঁকিতেছে। কমলাকান্ত মাছ কিনিবাব জন্য আগাইযা গেলেন, দেখিলেন মাছের দালালের নাম পুরোহিত। যে মাছই কেনা হোক না কেন একদব—জীবন সর্বস্ব। দুই-চার দিন পরে যখন মাছ পচিয়া গন্ধ হইবে, তখন এত দর দিযা এ সামগ্রী কেনা কেন ? কমলাকান্ত মেছোহাটা হইতে পলাইলেন।

বিদ্যার বাজারে গিযা কমলাকান্তের চক্ষুস্থির। সেখানে আসল বস্তুব সন্ধান নাই—শাঁস ফেলিযা কেবল ছোবডা লইয়া টানাটানি। বিজ্ঞানের বাজাবের অবস্থাও ঐ প্রকার ; সেখানে ইউরোপীযগণ আমাদের দেশেব জ্ঞান আত্মসাৎ করিযা গবেষণা করিতেছে ও ফল ভোগ করিতেছে। সাহিত্যের বাজারে সংস্কৃত সাহিত্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের দোকান দেখিলেন। বাংলা সাহিত্যের দোকানও একটি আছে। কিন্তু বিক্রেয় পদার্থটি কি দেখিবার ইচ্ছা হওযায, কমলাকান্ত দেখিলেন যে, উহা খবরের কাগজে জড়ানো কতগুলি অপক্ক কদলী। কলুপটিতে যাইযা কমলাকান্ত ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেলেন, দেখিলেন উমেদার মোসাহেব সকলে কলু সাজিয়া তেলের ভাঁড লইয়া সারি সারি বসিয়া গিযাছে। কাহারও কাছে চাকুরী আছে শুনিতে পাইলেই পা টানিয়া লইযা ভাঁড় হইতে তেল মাখাইতে বসে। যাহার নগদ টাকা আছে তাহার কিঞ্চিৎ প্রাপ্তির লোভে তাহাকেও তেল দিতে কার্পণ্য করে না। কত লোকের কত প্রার্থনা। এই প্রার্থনা পূরণের জন্য তেল দিতে সকলেই প্রস্তুত।

কমলাকান্ত এইবার যশের ময়রাপটিতে প্রবেশ করিলেন। দুর্গন্ধে নাক জ্বলিযা যাইতেছে। দোকানদার গুড়ের সন্দেশ সস্তায় বিক্রয় করিতেছে। রাজপুরুষগণ রায় বাহাদুর, রাজা বাহাদুর প্রভৃতি মিঠাই বিক্রয় করিতেছে। কমলাকান্ত দেখিলেন যে, বিক্রয়ের ব্যবস্থা বড়ই খারাপ, কেহ সর্বস্ব দিয়াও এক ঠোঙা পাইতেছে না—কেহ বা শুধু সেলাম করিয়া দেড় মণ লইযা যাইতেছে।

কমলাকান্ত এইখানে একটি দোকান দেখিলেন, উহা বড় অন্ধকার। দোকানে

কোন ক্রেতা নাই। একটি ফলকে লেখা আছে যে, মহাকাল স্বয়ং অনন্ত যশ বিক্রয় করেন, ইহার মূল্য জীবন। জীবন্তে কেহই ইহা পায় না, খাঁটি যশ আর অন্যত্র পাওয়া যায় না। কমলাকান্ত বিচারের বাজারে গেলেন। সে এক মস্ত কসাইখানা, ছুরি হাতে ছোট-বড় সমস্ত কসাই ছাগ, মেষ, গরু কাটিতেছে। আর মহিষাদি বড় বড় জন্তু পা ও শিং নাড়িয়া ছুটিয়া পলাইতেছে।

কমলাকান্তের বাজার দেখিবার আর সাধ হইল না।

আমার দুর্গোৎসব—সপ্তমী পূজার দিন আফিম চড়াইয়া কমলাকান্ত প্রতিমা দেখিতে গেলেন। এই সময় কমলাকান্তের ধ্যানী দৃষ্টিতে যে দিব্যদৃশ্য প্রতিভাত হইল এবং হৃদয়ে যে অনুভূতি তিনি লাভ করিলেন তাহাই 'আমার দুর্গোৎসব' নামক নিবন্ধে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। দুর্গাপ্রতিমার রূপের ব্যাখ্যা, দেশ ও দেবতার অভেদ কল্পনা কমলাকান্তরূপী বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টি। পরবর্তী কালে 'দেশমাতৃকার' যে পরিকল্পনা বিপ্লবী বাংলার যুবকগণ করিয়াছিলেন তাহার মূল এইখানে। এই প্রবন্ধে বন্দেমাতরম্ গানে এবং আনন্দমঠ উপন্যাসে বঙ্কিম সর্বপ্রথম দেশ ও দেবতার অভেদ কল্পনা করিয়া দেশসেবাকে একটা বিশেষ আধ্যাত্মিক গৌরবে মণ্ডিত করিয়াছিলেন। মন্ত্র-আবিষ্কারেই বঙ্কিমের ঋষিত্ব; দশভুজা মূর্তির রূপের ব্যাখ্যায় জাতীয় জীবনের পরিপূর্ণ সমৃদ্ধির চিত্র তিনিই সর্বপ্রথম আঁকিয়া দেখাইয়াছেন।

কমলাকান্ত দিগন্তবিস্তৃত কালস্রোতে একা ভাসিয়া চলিযাছেন। প্রাণভয়ে ভীত হইয়া মা মা বলিয়া ডাকিতেছেন। সহসা তিনি স্বর্গীয় বাদ্য শুনিলেন। দিগন্ত উজ্জ্বল করিয়া সেই বিক্ষুব্ধ জলরাশির উপর দূরে সুবর্ণমণ্ডিতা দশভুজা মূর্তি ফুটিয়া উঠিল। মা তবে সাড়া দিয়াছেন। এই মৃন্ময়ী মূর্তি জন্মভূমির মূর্তি, দশদিকে প্রসারিত দশ বাহুতে নানা অস্ত্রে দেশরক্ষা করিতেছে। পদতলে শত্রু বিমর্দিত হইতেছে। দেবীর বাহন শত্রু নিপীড়ন করিতেছে। একদিকে ভাগ্যরূপিণী লক্ষ্মী, অন্যদিকে বিদ্যাবিজ্ঞানময়ী বাণী—সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয় ও কার্যসিদ্ধিদাতা গণেশ। এই তো শারদীয়া প্রতিমা, এই তো জন্মভূমির ভবিষ্যতের পরিপূর্ণ চিত্র।

কমলাকান্ত ভক্তিভরে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন, কিন্তু কালসমুদ্রে প্রতিমা ডুবিল। কমলাকান্ত কাঁদিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, উঠ মা, উঠ। সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে কালসমুদ্র তাড়িত ও মথিত করিয়া এই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করিয়া আনিয়া আবার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। মাতৃহীন জীবনে কাজ কি! যেদিন এই স্বর্ণপ্রতিমা দেশে আবার প্রতিষ্ঠিত হইবে, সেদিন বড় পূজার ধুম পড়িবে।

একটি গীত—'এসো এসো, বঁধু এসো আধ আঁচরে বসো, নয়ন ভরিয়া তোমা দেখি'—বৈষ্ণব পদাবলীর একটি গান দিয়া কমলাকান্ত এই প্রবন্ধ আরম্ভ করিযাছেন এবং এই সঙ্গীতের ছত্রগুলি হইতে তাঁহার স্বাদেশিকতার প্রেরণা লাভ করিযাছেন। কমলাকান্তের স্বদেশপ্রেম জড় দেশের প্রতি অনুরাগ নয়—যথার্থ কবি ও ভাবুকের মত এই দেশকে তিনি চিন্ময় করিযা তুলিযা ইহার সহিত আত্মার বন্ধন স্থাপন করিয়াছেন। যাহাকে দেখিযা সাধ মিটে না, সে কোথায় লুকাইল। পরাধীনতার বেদনাময় মূর্চ্ছনা এখানে যেন ফাটিয়া পড়িতেছে।

স্বাধীনতা হারাইযা বাঙ্গালীর সুখে কোন অধিকার নাই। আশাহীন, সুখহীন, ভবিষ্যৎহীন যে কমলাকান্ত, তিনিও দিন গণিতেছেন। পরাধীনতার সূত্রপাত হইতে সাতশত বৎসর কাটিয়া গেল—যে গৌরব ও শোভা অন্তর্হিত হইযাছে তাহা আর ফিরিয়া আসিল কৈ ?

কৃষ্ণ চলিয়া গিয়াছিলেন, রাধার দুঃখের সীমা ছিল না। কিন্তু তাঁহার থাকিবার একস্থান ছিল বৃন্দাবন ! সুখ গিয়াছে কিন্তু সুখের স্মৃতি আছে, সুখের নিদর্শন আছে। বাঙালীর গৌরবের স্মৃতি আছে, কিন্তু চিহ্ন নাই, নিদর্শন নাই। কেবল এক চিহ্ন আছে নবদ্বীপ—বাঙালীর স্বাধীন রাজত্বের শ্মশান। নবদ্বীপের পার্শ্ববর্তিনী গঙ্গার জলেই বাংলার রাজলক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইয়াছিলেন।

বিড়াল—সামাজিক ধনবৈষম্যের উপর বোধ হয় ইহাই আমাদের দেশে প্রথম কশাঘাত। কমলাকান্ত যুক্তি ও সহানুভূতি দিযা ধনীর কার্পণ্য যে সমাজে চোরের সৃষ্টি করে এই কথা প্রতিপাদন করিয়াছেন। এইটি বহুখ্যাত বহুপ্রশংসিত নিবন্ধ।

কমলাকান্ত শয়নগৃহের শয্যায় বসিযা ঝিমাইতেছেন। এমন সময় একটি বিড়াল 'মেও' করিযা শব্দ করিল। কমলাকান্তের দুধটুকু উদরসাৎ করিয়া বিড়াল পরিতৃপ্ত হইয়া এই শব্দ করিযাছে। কমলাকান্ত লাঠি লইয়া বিড়ালকে তাড়না করিতে মনস্থ করিযাছিলেন। কিন্তু হঠাৎ দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইযা শুনিলেন, বিড়াল বলিতেছে—মারপিট কেন ? এ সংসারের সমস্ত ভাল ভাল জিনিস কি শুধু তোমরাই খাইবে ? আমরা কি কিছুই পাইব না ? তোমাদের ক্ষুধা আছে আর আমাদের কি ক্ষুধা নাই ? তোমার দুগ্ধে আমার ক্ষুধার নিবৃত্তি হইল। সুতরাং তোমার পরোপকার সিদ্ধ হইয়াছে, তোমার পুণ্য হইয়াছে। আমি তোমার ধর্মসঞ্চয়ের মূল কারণ। তবে আমি যে চোর হইয়াছি সে তো ইচ্ছা করিয়া হই নাই। খাইতে পাইলে কে আবার চোর হয় ? নিজের ভাঁড়ারে যিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা হইতে এক কণা কাহাকেও দিতেছেন না, চোর তো তিনিই সৃষ্টি করিতেছেন। কৃপণ-

ধনী চোরের অপেক্ষাও অনেক বেশী দোষী। তোমাদের উদ্বৃত্ত তোমরা ফেলিয়া দাও, নষ্ট কর, অপচয় কর কিন্তু আমাদের দাও না। তেলা মাথায় তেল দেওয়া তোমাদের স্বভাব। খাইতে বলিলে যে বিরক্ত হয়, তাহার ভোজনের তোমরা আয়োজন কর। আর যে ক্ষুধার জ্বালায় বিনা আহ্বানে তোমার অন্ন খাইয়া ফেলে, চোর বলিয়া তাহাকে দণ্ড দাও। দেখ, আমাদের চেহারা দেখ। পেট শুকাইয়া গিয়াছে, হাড দেখা যাইতেছে, জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে, আমাদের কালো চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না। এই পৃথিবীর মৎস্য-মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও, নতুবা চুরি করিব।

কমলাকান্ত বিড়ালকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চুরি করিলে সমাজে বিশৃঙ্খলা বাড়িবে। সমাজে ধনসঞ্চয় হইবে না। কিন্তু বিড়াল হটিল না। সমাজে ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের ক্ষতি কি? কমলাকান্ত দেখিলেন এ বিড়ালটি খুব তার্কিক। ইহাকে ফাঁকি দিয়া কিছু বুঝান যাইবে না। তখন এই সমস্ত কথা অতি নীতিবিরুদ্ধ এই বলিয়া উপদেশ দিয়া তাহার সহিত আপোষ করিবার চেষ্টা করিলেন।

ঢেঁকি—ঢেঁকিকে কমলাকান্ত লোকহিতব্রতধারী মহাপুরুষ বলিযা মনে করেন। সে নিঃস্বার্থভাবে ধান্যকে চাউলে পরিণত করে।

ঢেঁকির এই পরোপকার-প্রবৃত্তির কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া কমলাকান্ত দেখিলেন যে, সে পুনঃপুনঃ খানায় পড়িতেছে। ইহা দেখিযা প্রথমে তাঁহার মনে হইল, পড়াই বুঝি পরার্থপরতার উৎস। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার ভ্রাতৃপ্রতিম রামচন্দ্র প্রমত্ততাবশতঃ বারবার খানায় পড়ে, কিন্তু তাহার মধ্যে পরহিতকামনা লেশমাত্র নাই। প্রসন্ন গোয়ালিনীর মঙ্গলা গাইয়ের তাড়ায় তিনি নিজে একদিন খানায় পড়িয়াছিলেন এবং শৃঙ্গহীন উৎস হইতে দুগ্ধ লাভের মতো পরোপকার-চিন্তা তাঁহার মনে জাগিয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি খানায় পড়াকেই ঢেঁকির অপরিমেয় মাহাত্ম্যের কারণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

এমন সময় বামাকণ্ঠের আহ্বানে চকিত হইয়া দেখিলেন যে, তরঙ্গিণী মাতঙ্গিনী দুইবোনে মিলিয়া ঢেঁকিতে পাড় দিতেছে। তখন তিনি বুঝিলেন যে রমণীর পাদপদ্মই ঢেঁকির মাহাত্ম্যের কারণ। সুন্দরীর শ্রীচরণের মৃদু বা কঠিন স্পর্শ লাভ করিয়াই সে ধান ভানে। বলিতে কি, এই ধান-ভানা এমনইভাবে তাহার প্রকৃতিগত হইয়া গিয়াছে যে, সে স্বর্গে গিয়াও ধান না-ভানিয়া থাকিতে পারে না।

কমলাকান্ত ঢেঁকির সঙ্গে সদালাপ সুরু করিতে চাহিলেন, কিন্তু ঢেঁকি তাঁহার কথার উত্তর দিল না। তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং চারপায়ীর উপর শয়ন করিয়া আফিম চড়াইলেন। তখন তাঁহার দিব্যদৃষ্টি-লাভ ঘটিল।

কমলাকান্ত দেখিলেন যে, এই সংসার কেবল ঢেঁকিশাল। সমগ্র জগৎ ঢেকি-শালেরই ছদ্মরূপ। কোথাও জমিদাররূপ ঢেঁকি প্রজাদিগের হৃৎপিণ্ড গড়ে পিষিয়া নূতন নিরিখরূপ চাউল ব্যবহার করিয়া, সুখে সিদ্ধ করিয়া অন্ন ভোজন করিতেছেন। কোথাও আইনকারক ঢেঁকি মিনিট-রিপোর্টের রাশি গড়ে পিষিয়া ভাঙ্গিয়া বাহির করিতেছে—আইন-বিচারক ঢেঁকি সেই আইনগুলি গড়ে পিষিয়া বাহির করিতেছেন—দারিদ্র্য, কারাবাস—ধনীর ধনান্ত, ভাল মানুষের দেহান্ত। বাবুঢেঁকি বোতল গড়ে পিতৃধন পিষিয়া বাহির করিতেছে—পিলে, যকৃৎ, আর গৃহিণী ঢেঁকি একাদশীর গড়ে বাজার খরচ পিষিয়া বাহির করিতেছে, অনাহার।···লেখক ঢেঁকি, সাক্ষাৎ মা সরস্বতীর মুণ্ড ছাপার গড়ে পিষিয়া বাহির করিতেছেন—স্কুল বুক।

কমলাকান্ত দেখিলেন তিনিও ঢেঁকিবিশেষ; 'নেশার গড়ে মনোদুঃখ ধান্য পিষিয়া দপ্তর চাউল বাহির' করিতেছেন। এই চাউলের অভিনবত্ব দেখিয়া তাঁহার মনে অহঙ্কার জন্মিল; তিনি স্বর্গে ধান ভানিবার উদ্দেশ্যে গেলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্রকে বাক্যকৌশলে মুগ্ধ করিয়া একসের অমৃত ও একঘণ্টা উর্বশীর গীত পুরস্কার লাভ করিলেন। অবশ্য নেশাটা কাটিয়া গেলে তিনি দেখিলেন যে, একসের দুগ্ধ লইয়া প্রসন্ন গোয়ালিনী তাঁহাকে কটূক্তি করিতেছে।

কমলাকান্তের পত্র

"কমলাকান্তের দপ্তর"-এর পরিশিষ্টে "কমলাকান্তের পত্র" সঙ্কলিত হইয়াছে। রচনার form বা রূপকল্প হিসাবে পত্রের মাধ্যম গ্রহণ নূতন নয়—এক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই হইয়াছে। "দপ্তর" রচনার সহিত পত্ররচনার উদ্দেশ্য আসলে একই। "কমলাকান্তের দপ্তর"-এর জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করিয়াই হয়ত বঙ্কিমচন্দ্র এই জাতীয় রসরচনার আর একটি সঙ্কলন প্রস্তুত করিতে চাহিয়াছিলেন—"কমলাকান্তের পত্র" সম্ভবতঃ তাহারই সূচনা।

প্রথম সংখ্যা

কি লিখিব

কমলাকান্তের পূর্ব আশ্রয়দাতা নসীবাবুর মৃত্যু হইয়াছে। কমলাকান্তের সান্ধ্য-আসর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ছন্নছাড়া মানুষটা আরো যেন ছন্নছাড়া হইয়া গিয়াছে। ভীষ্মদেব খোসনবীশের লেখা হইতে জানিতে পারি যে, কমলাকান্ত কিছুকাল তাঁহার বাড়ীতে ছিলেন ; কিন্তু বাউণ্ডুলে মানুষের এ সুখ অধিক দিন সহ্য হইল না। কমলাকান্ত তাহার পর কোথায় চলিয়া গেলেন, সে খবর কেহ রাখিল না। কমলাকান্তের একটা বাতিক ছিল দপ্তর লেখার—আফিমের নেশায় বুঁদ হইয়া নিজের খেয়ালে তিনি দপ্তরগুলি লিখিতেন। কমলাকান্ত চলিয়া যাইবার সময় দপ্তরগুলি রাখিয়া গেলেন ভীষ্মদেব উকিলের বাড়ীতে—সুবিধা বুঝিয়া ভীষ্মদেব সেগুলি "বঙ্গদর্শন" সম্পাদকের নিকট বিক্রয় করিয়া আসিলেন। এত কথা কমলাকান্ত কিছুই জানিতেন না, প্রথম জানিলেন জুতা কিনিতে গিয়া। "বঙ্গদর্শন"-এ মুদ্রিত দপ্তরের একটি পাতা নূতন জুতার আবরণী হইয়া আসিল—দেখিয়া তো কমলাকান্তের চক্ষুস্থির। তখনই বসিলেন কাগজ-কলম লইয়া সম্পাদককে পত্র লিখিতে। পয়সার অভাবে তিনি এতটুকু আফিং কিনিতে পারেন না, আর তাঁহারই আবোলতাবোল লেখা বেচিয়া খোসনবীশ পয়সা রোজগার করিবে, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারেন না। এইটুকু গেল পত্র-রচনার ভূমিকা। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি কমলাকান্তের অন্যান্য রচনার মত এ রচনাটিও আসলে একটি রসরচনা। এ রচনার মধ্য দিয়া কমলাকান্তের বকলমে বঙ্কিমচন্দ্র দেশব্যাপী সাংস্কৃতিক অবনতির প্রতিই ইঙ্গিত করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। সাহিত্যের বাজারে দেনা-পাওনার প্রশ্নই আজ বড় হইয়া দেখা দিয়াছে—টাকা দিয়া যে-কোন প্রকার রচনাই ক্রয় করিতে পারা যায়, অথচ সাধারণ পাঠকশ্রেণীর রুচিজ্ঞান একেবারেই নাই। ভাল জিনিসের মূল্য দিতে তাহারা শেখে নাই। তাই "বঙ্গদর্শন"-এর কাগজও জুতা মোড়ার কাজে ব্যবহৃত হয়।

এমন কি "বঙ্গদর্শন" বলিয়া যে একখানা কাগজ আছে তাহার খবরই বা কয়জন রাখে ? "বঙ্গদর্শন" শব্দের প্রকৃত অর্থ কি হইতে পারে, অর্থাৎ "বঙ্গদর্শন" কাগজের মূল লক্ষ্য কি, তাহার কথাই বা কয়জন চিন্তা করে।

আসল কথা সাহিত্য-সংস্কৃতি, এ সকল বিষয় লইয়া কেহই গভীরভাবে মাথা ঘামায় না। নব যুগক্রম অনুযায়ী কাগজ বাহির করিতে হয়, তাই "বঙ্গদর্শন" বাহির

হয়। যুগের ফরমায়েস অনুযায়ী পলিটিক্‌স্ হইতে সুরু করিয়া ভৌগোলিক তত্ত্বালোচনা, সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, ঐতিহাসিক গবেষণা এমন কি নাটক-নবেল পর্যন্ত সব কিছুই নৈবেদ্য সাজাইয়া না দিলে জন-গণেশের তুষ্টি হইবে না। অন্তঃসার-শূন্য রচনার মূল্য বাড়াইবার জন্য তাহাতে অবান্তর কোটেশন, ফুটনোট এবং অলঙ্কারের গুরুভার চাপাইয়া দিতে হয়—আসল কথা পাঠকশ্রেণী যতটা না বোঝে, লেখা যেন ততই মূল্যবান হইয়া দাঁড়ায়। লেখকেরাও পেশাদার—পয়সা পাইলে তাঁহারা সব্যসাচীর মত চাহিদা অনুযায়ী রচনার যোগান দিতে পারেন। আফিং পাইলে কমলাকান্ত "বঙ্গদর্শন" সম্পাদককে যে-কোন প্রকার লেখাই সরবরাহ করিতে পারেন। এ যুগে সংস্কৃতির বাজারে আড়ম্বরেরই দাম—গভীরতার নয়।

প্রসঙ্গতঃ, কমলাকান্ত ভীষ্মদেব খোশনবীশ মহাশয়ের পুত্রের জন্যও সম্পাদকের নিকট সুপারিশ করিতে ছাড়েন নাই। বস্তুতঃ, এই সর্ববিদ্যাবিশারদ অকাল কুষ্মাণ্ডটি তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের একটি শ্রেণীপ্রতীক মাত্র। "তিনি চিতোরের রাজা আলফ্রেড দি গ্রেটের একখানি জীবনচরিত দশ পনের পৃষ্ঠা লিখিযা রাখিয়াছেন এবং বাংলা সাহিত্য-সমালোচনা বিষয়ক একখানি গ্রন্থ মহাভারত হইতে সঙ্কলিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাতে হার্বাট-স্পেনসারের মত খণ্ডন আছে এবং ডারউইন যে বলেন যে, মাধ্যাকর্ষণ বলে পৃথিবী স্থির আছে তাহারও প্রতিবাদ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে মালতী-মাধব হইতে চার পাঁচটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে।" ইহাই তো সেই বিদ্যাকুলতিলকটির বিদ্যার পরিমাণ। এইস্থানে বঙ্কিমচন্দ্র সমসাময়িক পাণ্ডিত্যাভিমানীদিগকে ব্যঙ্গবিদ্ধ করিয়াছেন।

সৃষ্টিসাহিত্যের ক্ষেত্রেও সেই একই অন্তঃসারশূন্য কৃত্রিম সস্তা ভাবের আমদানি করা হইতেছে। সম্ভব-অসম্ভব কথার জাল বুনিয়া একটা রোমান্টিক প্রেমের গল্প খাড়া করিতে পারিলেই সাধারণ পাঠকের তৃপ্তি সাধিত হয়। কিংবা "ডনকুইকসোট"-এর মত একটা কিম্ভূতকিমাকার কিছু সৃষ্টি করিলেই চলে। প্রয়োজন হইলে ইহার জন্য কুম্ভীলকবৃত্তি (চৌর্য) গ্রহণে পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না। স্বাধীন-সৃষ্টিতে অপারগ হইলে পরিচিত রচনাবিশেষের পুচ্ছগ্রহণে পরিশিষ্ট-রচনা অন্যায় নয়। কাজের ক্ষেত্রে শুধু মিলের কৌশলটাকে চট করিয়া আয়ত্ত করা সম্ভব নয়, তবে শ্রীমধুসূদনের অনুকরণে অমিত্রাক্ষর কাব্যপ্রণয়ন সহজেই চলিতে পারে। আসল কথা হইতেছে এই যে, এ যুগের পত্রিকার লেখককে পয়সার জন্য যে-কোন প্রকার লেখা যেমন-তেমন করিয়া খাড়া করিতেই হয়। আফিং পাইলে কমলাকান্তও এই আধুনিক-রীতি গ্রহণ করিতে রাজি আছেন।

বর্তমান পত্রের আলোচনা হইতে রহস্যের অন্তরালে শ্লেষটুকু আমরা ধরিতে পারি। কমলাকান্তের প্রায় সমস্ত রচনার মধ্যেই এই শ্লেষাত্মকতা বর্তমান। কিন্তু প্রসঙ্গতঃ ইহাও মনে হয় যে, লেখকের "cynicism" যেন এখানে বড় বেশী তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পূর্বে তাঁহার হাসির পশ্চাতে অশ্রু টলমল করিয়া উঠিত—স্নেহের জারক রসে শ্লেষোক্তির তীক্ষ্ণতা কিছুটা প্রশমিত হইত। কিন্তু এখন যাহা দেখিতেছি তাহা প্রৌঢ় মনের তিক্ততার প্রকাশে ভার-মন্থর।

দ্বিতীয় সংখ্যা

পলিটিক্স্

সম্পাদকের নিকট কমলাকান্ত আফিং প্রার্থনা করিয়া যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহা মঞ্জুর হইয়াছে। কিন্তু আফিং-এর বিনিময়ে সম্পাদক লেখা চাহিয়াছেন—পলিটিক্স্-বিষয়ক রচনা। বলাবাহুল্য রাজনীতি-সম্পর্কিত গবেষণার উদ্বোধন সম্পাদকের আসল উদ্দেশ্য নয়—সাময়িক হুজুগ-অনুযায়ী কাগজের কাটতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই ব্যবস্থা। কিন্তু কমলাকান্ত গোড়া হইতেই বাঁকিয়া বসিয়াছেন। পলিটিক্স্ বলিতে তিনি বোঝেন স্বার্থ-সিদ্ধির উপায়। কিন্তু "কমলাকান্ত স্বার্থপর নহে—আফিং ভিন্ন জগতে আমার স্বার্থ নাই, আমার উপর পলিটিকেল চাপ কেন? আমি রাজা না খোসামুদে, না জুয়াচোর, না ভিক্ষুক, না সম্পাদক যে, আমাকে পলিটিক্স্ লিখিতে বলেন?" সুতরাং রাজনীতির অর্থ কখনও ভিক্ষা (আবেদন-নিবেদন), কখনও চুরি—কখনও ডাকাতি। আর একটি কথা এই যে, এ-কার্যে সূক্ষ্মবুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা প্রায় কিছুই নাই—মহতী কল্পনার অবকাশ নিতান্তই অল্প ("কমলাকান্ত শর্মা উচ্চাশয় কবি, কমলাকান্ত ক্ষুদ্রজীবী পলিটিশ্যান নহে।")

এই সকল কথার অলস রোমন্থন করিতে করিতে একসময় লেখক শিবে কলুর গরুগুলিকে নিশ্চিন্তে ভোজন করিতে দেখিয়া আশ্বস্ত হইলেন। আর যাহাই হউক গবাদি পশুর নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রার মধ্যে পলিটিক্স্ নাই—স্বার্থবুদ্ধির তাগিদে তাহাদিগকে প্রতিযোগিতায় নামিতে হয় নাই। সত্য কথা বলিতে কি, আমাদের জীবনও ঐ গবাদি পশুর জীবনযাত্রার মতই নিস্তরঙ্গ—কোন বড় কাজ করিবার উৎসাহ আমাদের নাই—আমাদের জীবনে পলিটিক্স্-এর ব্যস্ততা একটা হুজুগ ছাড়া আর কি? "সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছিল, তাহাদের পলিটিক্স্ নাই। 'জয় রাধে কৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গো!' ইহাই তাহাদের

পলিটিক্‌স্!" অর্থাৎ আমাদের রাজনীতি শুধুমাত্র আবেদন-নিবেদনের দরখাস্ত রচনার ইতিহাসমাত্র।

পরবর্তী অংশে একটি রূপক সাদৃশ্য সৃষ্টি করিয়া উপরোক্ত ভাবকেই স্পষ্টতা দান করা হইয়াছে। শিবে কলুর পুত্র যখন খাইতে বসিল তখন ক্ষুধিত কুকুরটি তাহার অদূরে অন্নকণার প্রত্যাশী হইয়া বসিয়া রহিল—দু'এক মুষ্টি ভিক্ষার অন্নও জুটিল, কিন্তু ভিক্ষা করিয়া তো আর চিরকাল চলে না, শেষ পর্যন্ত তাহার ভাগ্যে মিলিল ইষ্টখণ্ডক। কলুপত্নীর ঢেলা খাইয়া পলাইয়া বাঁচা ছাড়া তাহার গত্যন্তর রহিল না। আমরাও সেদিন এই পথকুকুটির মতই ইংরাজ প্রভুর নিকট দরবার করিয়া দুই-এক মুষ্টি ভিক্ষা পাইয়াছি মাত্র—প্রত্যাশা যখনই সীমা ছাড়াইয়াছে তখনই রাজরোষের উদ্যত দণ্ড নামিয়া আসিয়া নিমেষে আমাদিগকে শান্ত করিয়া দিয়াছে। ইহাই তো আমাদের রাজনীতির ইতিহাস।

কিন্তু ইহার বিপরীত দৃষ্টান্তও বর্তমান। কলুর বলদের নাদায় মুখ দিয়াছিল একটি ভীষণদর্শন বৃষ। কলুপত্নী তাহাকেও বাঁশ লইয়া তাড়া করিয়াছিল, কিন্তু শেষে বৃষের শিং নাড়া খাইয়া পলাইয়া বাঁচিল। কমলাকান্ত লিখিতেছেন—"আমি ভাবিলাম যে, এও পলিটিক্‌স্। দুই রকমের পলিটিক্‌স্ দেখিলাম, এক কুকুরজাতীয়, আর এক বৃষজাতীয়।" আবেদন-নিবেদনের প্রহসন ছাড়াও রাজনীতি আছে—আত্মশক্তিতে বলীয়ান হইয়া অত্যাচারী রাজশক্তির নিকট হইতে অধিকার ছিনাইয়া লওয়াও রাজনীতির আর এক রূপ। বিসমার্ক এবং গর্শাকফ-এর রাজনীতি এই শক্তির সাধনা। কার্ডিনাল উলসী-র মত তথাকথিত দেশনায়কেরা কিন্তু চিরকাল শক্তিমান প্রভুর পদলেহন করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছেন—আমাদের দেশের রায়-বাহাদুর ও রাজাবাহাদুরের দল এই পদলেহনকেই জীবনের ধর্ম করিয়াছিলেন—তাহাতেই তাঁহাদের শ্রীবৃদ্ধি। "মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত" নামক রসরচনায় বঙ্কিমচন্দ্র যে মুচিরাম বাবুর ছবি আঁকিয়াছেন তিনি এই পদলেহী শ্রেণীরই প্রতিভূ। কান্তমুদির সময় হইতে আজ পর্যন্ত এদেশের ইতিহাস খুঁজিলে এইরূপ বহু চরিত্র পাওয়া যাইবে।

পরবর্তী পত্রের আলোচনায় আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের যে cynicism-এর কথা বলিয়াছি তাহার সুর এখানেও বর্তমান। কিন্তু দেশকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিলেন বলিয়াই জাতীয়-চরিত্রের বীর্যহীনতায় তাঁহার এই তিক্ততা জাগিয়াছে ইহা বুঝিতেও কষ্ট হয় না। "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রের ঋষিও প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"অবলা কেন মা এত বলে ?" "একটি গীত" ও "আমার দুর্গোৎসব" প্রবন্ধদ্বয়ের মধ্যেও এই একই ক্ষুব্ধতা

গুমরিয়া কাঁদিয়াছে। সারা জীবন ধরিয়াই তো বঙ্কিম এই তামসিকতায় আচ্ছন্ন জাতির কানে বীরাচারী তান্ত্রিকের মত, দেশমাতার বোধনকল্পে, মহামন্ত্র জপ করিয়াছেন; কিন্তু শবসাধনায় শব কি জাগিয়াছে? মৃত জাতির প্রাণে নবজীবনের প্রবাহ তো সঞ্চারিত হয় নাই। এইদিক দিয়া দেখিলে বঙ্কিমচন্দ্রের এই তিক্ত আক্ষেপের স্বরূপ আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে, পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথও তাঁহার রাজনৈতিক রচনায় এদেশের নির্বীর্য ভিক্ষা-প্রবণতাকে বারংবার ধিক্কৃত করিয়াছেন। আবেদন-নিবেদনের রাজনীতিতে তাঁহার বিশ্বাস ছিল না এবং আত্মশক্তিতে বলীয়ান হওয়ার কথা তিনিও বহুবার বলিয়াছেন।

তৃতীয় সংখ্যা

বাঙালীর মনুষ্যত্ব

জগতের কোলাহল হইতে একান্তে একটি শান্তির নীড় স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন কমলাকান্ত। জীবনের সহিত অত্যন্ত-সংযোগে আজ তিনি ক্লান্ত। সভ্যতার অত্যাচারে নিজেকে যেন নিতান্ত পীড়িত মনে হয়। ভালো লাগে না আর অতি-সন্তর্পণে লোকের মন যোগাইয়া চলিতে কিম্বা তুচ্ছ স্বার্থের আশায় লোকের খোসামোদ করিয়া বেড়াইতে। একাকিত্বে দুঃখ নাই, কিন্তু শান্তি চাই। সংসারের সহিত সম্পর্ক চুকাইয়া কমলাকান্ত কুটীরের চারিপাশে ফুলের বাগান করিলেন। ফুলের ভালবাসা কি তাঁহার সারা জীবনের আহরিত গ্লানির ক্ষতিপূরণ করিতে পারিবে না? রূপকার্থে ধরিলে এই ফুলের চাষ শিল্পচর্চার উপমান হইতে পারে। প্রৌঢ় জীবনে কমলাকান্ত সাংসারিকতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া শিল্পচর্চায় আত্মনিয়োগ করিতে চাহিলেন।

কিন্তু সংসার কি এত সহজে ছাড়ে? সেই যে Wordsworth বলিয়াছিলেন—"The world is too much with us"—কমলাকান্তের ফুলের বাগানেও তাই অর্থলোভীর দল ছুটিয়া আসিল। তাহাদের পক্ষ-বিধুননে সেই অতি-পরিচিত শব্দ বাজিয়া উঠিল—সংসারের সেই অতি-পরিচিত—"ঘ্যানঘ্যানানি"। অনেক চেষ্টা করিয়াও কমলাকান্ত ইহাদের হাত হইতে বাঁচিতে পারিলেন না। সংসারে থাকিয়া কে কবে সংসারকে এড়াইতে পারিয়াছে? নেপোলিয়ন, হানিবল কিংবা চার্লস-এর মত কমলাকান্তকেও অবশেষে বীরের মত পরাজয় বহন করিতে হইল।

কিন্তু কমলাকান্ত ঠিক সংসারকে এড়াইতে চাহেন নাই—তিনি চাহিয়াছিলেন

সংসারের "ঘ্যানঘ্যানানি" হইতে বাঁচিতে। কিন্তু তাহা তো সম্ভব নয়—পতঙ্গ তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছে—"তোমার এ বঙ্গভূমে জন্মগ্রহণ করিয়া ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিব না ত কি করিব? বাঙ্গালি হইয়া কে ঘ্যান্ ঘ্যানানি ছাড়া?" "ঘ্যানঘ্যানানি" কথাটির নির্গলিতার্থ এতক্ষণে স্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। "ঘ্যানঘ্যানানি" অর্থ, অপ্রয়োজনে বাজে কথা বলা কিংবা স্বার্থের খাতিরে স্তাবকতার বাগ্‌বিস্তার। খেতাবধারী রাজা-মহারাজা হইতে সামান্য চাকরীর উমেদার পর্যন্ত সকলেই এই স্তাবকতার বাহক, আর উকিল-মোক্তার হইতে সুরু করিয়া তথাকথিত দেশনেতা কিংবা সমাজসেবকের দল অথবা সাহিত্যিক ও সম্পাদকেরা সকলেই বাজে কথায় পঞ্চ-মুখ। কোন্ "বাঙ্গালির ঘ্যান্ ঘ্যানানি ছাড়া অন্য ব্যবসা আছে?" পতঙ্গ কমলাকান্তকে যথার্থই বলিয়াছিল—"একটা কাজের সঙ্গে খোঁজ নাই—কেবল কাঁদুনে মেয়ের মত দিবা-রাত্রি—ঘ্যান্ ঘ্যান্। একটু বকাবকি লেখালেখি কম করিয়া কিছু কাজে মন দাও—তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। মধু সংগ্রহ করিতে শেখ—হুল ফুটাইতে শেখ।" অর্থাৎ শুধু কথায় চিড়া ভিজিবে না—কাজ করিতে হইবে। কাজটি যে কি তাহাও পতঙ্গের নির্দেশ হইতে পাইতেছি—মধুসংগ্রহ ও হুলফোটান। মৌমাছি যেমন মধু আহরণ করিয়া মধুচক্র গড়িয়া তোলে, সেইরূপ আমাদেরও চিত্ত-মধুচক্রকে জ্ঞানে পূর্ণ করিতে হইবে, শিব-সুন্দরের উপলব্ধিতে ভরিয়া তুলিতে হইবে। "হুলফোটান" অর্থে যে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হইবার ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহা আর ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

অন্যান্য পত্রের মত কমলাকান্তের এ পত্রখানিও জাতীয়-চরিত্রের সমালোচনা। জাতিকে ভালবাসিতেন বলিয়াই তাহাকে এইরূপ কঠিন সমালোচনা করিবার অধিকার বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল। কিন্তু বর্তমান রচনায় মার্জিত হাস্যরসের সুসমঞ্জস প্রয়োগ লেখকের রুক্ষতাকে সরসতা দান করিয়াছে। ইহা যদি মৃতকল্প জাতির প্রতি লেখকের উপদেশ হয়, তাহা হইলে তাহাকে আলঙ্কারিক অর্থে "কান্তাসম্মত" বলিতে বাধিলেও বান্ধববিহিত বলিতে পারি।

চতুর্থ সংখ্যা

বুড়া বয়সের কথা

সম্পাদকের নিকট চিঠিতে কমলাকান্ত বুড়া বয়সের কথা বলিতেছেন। এ জাতীয় কথা তিনি আগেও বলিয়াছেন, কিন্তু বর্তমানে পূর্বের সুর যেন কিছুটা পরিবর্তিত। একটা তীব্রতর নৈরাশ্য ও তিক্ততার বোধ যেন তাঁহার সমস্ত

চতনাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। বুড়া বয়সের একথা তাঁহার শুনিবে কে? বৃদ্ধেরা অধ্যয়ন পছন্দ করেন না—যুবকেরা বৃদ্ধের রচনা পড়িবে কিনা সন্দেহ—তবে একটা কথা এই যে, কমলাকান্ত ঠিক পূর্ণ বৃদ্ধ নন—তাঁহার যৌবনের সূর্য কিছুটা পশ্চিমে হেলিযাছে এইমাত্র।

কিন্তু মানুষের যৌবন ও বার্ধক্যের প্রকৃত বিচার হইবে কিরূপে? বযস কম হওয়া সত্ত্বেও কেহ মনের দিক দিয়া বৃদ্ধ—আবার অনেকে বার্ধক্যেও নবীন। কমলাকান্তের মতে "প্রাচীনতা বয়সেরই ফল, আর কিছুরই নহে। ধাতুবিশেষে কিছু তারতম্য হয়।"

পৃথিবীতে চিরতারুণ্যের রাজ্য চলিযাছে, তবে মানুষ কেন বৃদ্ধ হইবে? কমলাকান্ত ভাবিতে থাকেন—"এই চির-প্রাচীন ভুবনমণ্ডল ত আজিও নবীন"—কোকিলের গান, বকুলের গন্ধ, নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা, গঙ্গাতরঙ্গের সৌন্দর্য ইত্যাদি কিছুই তো পুরানো হয় না তবে তিনি কেন বৃদ্ধ হইবেন?

কিন্তু এসকল অলস কল্পনাবিলাসে ফল কি? দেহে-মনে জরার সুস্পষ্ট পদধ্বনি কমলাকান্ত শুনিতে পাইয়াছেন—"আমি বুড়া প্রতি নিঃশ্বাসে তাহা জানিতে পারিতেছি।" জীবনের আশা-ভরসা—উৎসাহ-উদ্দীপনা তাঁহার চলিয়া গিয়াছে।

"জীবনের অপরাহ্ণবেলায দাঁড়াইয়া" তাঁহার মনে হয় পিছনে ফেলিয়া আসা দিনগুলির কথা। অতীতের অন্ধকারে হারাইয়া গিয়াছে কতকগুলি প্রিয়মুখের ছবি—"কেবল মুখ নহে—হৃদয়।" কত ফুল ঝরিযাছে। কত দীপ নিবিয়াছে; কত বন্ধুত্বের বন্ধন শিথিল হইযা গিযাছে। কালের পরিবর্তনই ইহার জন্য একমাত্র দাযী।

কিন্তু একথা ভাবিয়া ফল কি—পৃথিবীতে যখন একা আসিয়াছি, তখন একাই যাইতে হইবে। মৃত্যুর পরে তো সকল জ্বালা জুড়াইযা যাইবে—ঈশ্বরের শান্তি তো সেখানে সকলের জন্যই অপেক্ষা করিতেছে।

আপন বৃদ্ধত্বকে স্বীকার করিয়া লইয়া কমলাকান্ত পঞ্চাশোর্ধ্বে বনগমনের প্রাচীন নির্দেশের কথা ভাবিতে থাকেন। কিন্তু বৃদ্ধ হইলে সত্যসত্যই বনে যাইবার কি কোন প্রয়োজন আছে? তখন তো গৃহ-সংসার-সমাজই তাহার নিকট অরণ্যতুল্য। বৃদ্ধকে কেহই আমোদ-প্রমোদে আমন্ত্রণ জানায় না—বড় জোর তাহার নিকট হইতে সময়োচিত উপদেশ লওয়া চলিতে পারে। বৃদ্ধকে সকলেই ভয করিয়া কিংবা ভক্তি করিয়া দূরে সরিয়া থাকে। সন্তান কিংবা সন্তানতুল্য যাহাদের সহিত একদিন তাহার নিবিড় স্নেহের সম্পর্ক ছিল আজ হয়ত তাহারাই বয়োধর্মে তাহার অবমাননা

করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না। বৃদ্ধের মনের কষ্ট কে বোঝে! বৃদ্ধের নিকট তাহার অতীতের অতিপ্রিয় বাস্তব পরিবেশও বর্তমানে কালগ্রাসে পতিত। যে ফুলের বাগান একদিন সে সাধ করিয়া গড়িয়াছিল, আজ হয়ত সেখানে লাঙ্গল চলিতেছে। অতি যত্নে গড়িয়া তোলা অট্টালিকা হয়ত সংস্কারের অভাবে দিনে দিনে জীর্ণতর হইতেছে। দুই চোখ ভরিয়া একদিন যাহাদের রূপসুধা পান করিয়া আশা মিটে নাই, আজ হয়ত তাহারা নিতান্ত কুৎসিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বৃদ্ধ যে জগতে বাস করিতে বাধ্য হয় সে জগৎ তাহার পরিচিত হইয়াও অপরিচিত—তাহার যৌবনের পৃথিবী হারাইয়া গিয়াছে—জনপূর্ণ নগরীতে, বহু মানুষের মাঝখানে থাকিয়াও সে তাই অরণ্যেই বাস করে।

কিন্তু তবুও আবার একদিক দিয়া বৃদ্ধ-জীবনের সান্ত্বনা রহিয়াছে। বৃদ্ধ তাহার অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শনের সাহায্যে মানবকল্যাণে আত্মনিয়োগ করিতে পারে।

বিসমার্ক, মোল্টকে, ফ্রেডেরিক প্রভৃতি যাঁহারা জার্মান জাতিকে গড়িয়াছেন, কিংবা ফ্রান্সের স্বাধীনতার পুরোহিত টিয়র অথবা গ্লাডস্টোন, ডিস্রেলির মত বৃটিশ সাম্রাজ্যের কর্ণধারগণ সকলেই বৃদ্ধ। বুড়া বয়সই আসলে কাজের সময়। "যৌবন-অতীতে মনুষ্য বহুদর্শী, স্থিরবুদ্ধি, লব্ধপ্রতিষ্ঠ এবং ভোগাসক্তির অনধীন, এ জন্য সেই কার্যকারিতার সময়।" যৌবনে মানুষের আত্মকেন্দ্রিকতা প্রবল থাকে, কিন্তু বার্ধক্যে "আপনার কাজ ফুরাইয়াছে বিবেচনা করিয়া পরহিতে রত" হইতে হয়। অনেকের ধারণা বৃদ্ধবয়সে সব কাজ ফেলিয়া বুঝি পরলোকের কাজ করিতে হয়। কমলাকান্ত একথা বিশ্বাস করেন না। শৈশব হইতে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ঈশ্বরকে ডাকিতে হইবে এবং তাহার সহিত কালোচিত জাগতিক কর্তব্যও পালন করিতে হইবে।

কিন্তু এত গেল উপদেশের কথা অথচ এই ধান ভানিতে শিবের গীত গাহিবার মত প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে উপদেশ দেওয়া ছাড়া বৃদ্ধের আর কি করিবার আছে? তাহার সম্ভোগের দিন অতীত হইয়াছে—জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা কিংবা দর্শনের আলোচনায় তাহার মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। কিছুই ভালো লাগে না—জীবন হইয়া গিয়াছে বিস্বাদ—রুচিহীন। জীবনের সন্ধ্যায় পরলোকের চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া একমাত্র অবলম্বন ঈশ্বরকে ডাকিতে ডাকিতে কোনমতে তাহার দিন কাটে।

"বুড়া বয়সের কথা" বলিতে গিয়া কমলাকান্ত যে নৈরাশ্যবাদের পরিচয় দিয়াছেন তাহার প্রকাশ বঙ্কিম সাহিত্যে আর কোথাও ঘটিয়াছে কিনা জানি না। "কমলাকান্তের দপ্তর"-এর অন্তর্গত "একা", "আমার মন" প্রভৃতি রচনার মধ্যে কমলাকান্ত প্রায়

একই কথা বলিয়াছেন, কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধের সহিত স্বরগত ভিন্নতা সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। "বুড়া বয়সের কথা"-তে এমন একটা তিক্ত-অভিজ্ঞতার পরিবেশন হইয়াছে যাহা পাঠমাত্রেই আমাদিগকে আচ্ছন্ন করে—এবং বলা বাহুল্য এধরণের আচ্ছন্নতা পাঠকচিত্তে একটা স্বতন্ত্র বিষাদ অবস্থার সৃষ্টি করিয়া তাহার সমস্ত শান্তি নষ্ট করে। এ প্রবন্ধেও সেই Humanitarianism-এর কথা আছে, কিন্তু তাহার আবেদন নিতান্তই যান্ত্রিক। "প্রীতি সংসারে সর্ব্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি।......মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে অন্য সুখ চাহি না।"—ইত্যাদি উক্তির পাশাপাশি "বার্দ্ধক্যে আপনার কাজ ফুরাইয়াছে, বিবেচনা করিষা পরহিতে রত হও" জাতীয় উপদেশকে মিলাইয়া দেখিলেই আমাদের কথাটি স্পষ্ট হইবে।

পঞ্চম সংখ্যা

কমলাকান্তের বিদায়

"কমলাকান্তের বিদায়" পত্রগুচ্ছের সর্বশেষ খণ্ড। কমলাকান্ত "বঙ্গদর্শন"-এ আর লিখিবেন না, তাই পত্রে সম্পাদকের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিতেছেন। তাঁহার এই সঙ্কল্প একটা আকস্মিক খেয়ালমাত্র নয়—একটা সুচিন্তিত আত্মসমালোচনা ইহার মূলে। আত্মসমালোচনা করিতে গিয়া তিনি যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহা যেন চতুর্থ পত্রেরই অনুকরণ। বার্ধক্যের গুরুভার যেন তাঁহার সমস্ত জীবনরস-রসিকতার কণ্ঠরোধ করিতেছে। রসসৃষ্টির ইচ্ছা আছে কিন্তু উপায় নাই—কারণ, আনন্দ কমলাকান্তের জীবন হইতে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইয়াছে। প্রিয়জনেরা ছাড়িয়া গিয়াছে—প্রিয় পরিবেশ পরিবর্তিত হইয়াছে। এখনকার রচনা মানে শুধু "নস্‌ট্যালজিয়া" (Nostalgia) ফেলিয়া আসা দিনগুলির স্মরণে একটু কান্নাকাটি—কিন্তু সেই করুণ সুরের শিল্পায়নও এখন তাঁহার সহজসাধ্য নয়—"কমলাকান্তের আর সে রস নাই।" সুতরাং আর লিখিয়া কি হইবে—"প্রাণ গিয়াছে ভাই, আর নিঃশ্বাস কেন? সুর গিয়াছে ভাই, আর কান্না কেন?" কমলাকান্ত তাই আর লিখিবেন না।

কমলাকান্তের জোবানবন্দী

"কমলাকান্তের জোবানবন্দী" কমলাকান্ত প্রসঙ্গে বঙ্কিমের সর্বশেষ রচনা। ইহার অভিনবত্ব আমাদিগকে সহজেই মুগ্ধ করেন। প্রসন্ন গোয়ালিনী তাহার গোরু

চুরি মামলায় কমলাকান্তকে সাক্ষী মানিয়াছে। সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া উকিলের জেরার উত্তর দিতে গিয়া কমলাকান্ত কিন্তু উকিলবাবুকেই ব্যস্ত করিয়া তুলিযাছেন। উকিল এক কথা বলেন তো কমলাকান্ত বক্রোক্তি করিয়া তাহার এমন ব্যাখ্যা করেন যে, আদালত শুদ্ধ সকলেরই নাকাল হইবার জোগাড। সাক্ষীর কাটরাকে কমলাকান্ত প্রথমে খোঁযাড়ের সহিত মনে করিয়া হাসিয়াছেন—"বাবা, কার ক্ষেতে ধান খেয়েছি—যে, আমাকে এর মধ্যে পুরিলে?" তাহার পর হলফ পড়িতে গিযা আর এক বিপত্তি—পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া সত্যভাষণের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ কেমন করিয়া সম্ভব?—এত বড মিথ্যা কমলাকান্ত গোড়াতেই কেমন করিয়া বলিবেন। দুঃখের বিষয়, হাকিমও কমলাকান্তের যুক্তি বুঝিলেন না, আর উকিলবাবু তো চটিযা উঠিলেন। তাঁহারা গতানুগতিক মানুষ—"Status Quo"-কে মানিযা লওযা ছাডা তাঁহাদের গত্যন্তর নাই—স্বাধীন বুদ্ধির প্রকাশ তাঁহাদের আচ্ছন্ন। কিন্তু গোলমাল করিলেও কমলাকান্তকে ছাড়া চলে না, কারণ তিনিই মূল সাক্ষী, তাই শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে "simple affirmation" দেওযা হইল। কিন্তু প্রতিজ্ঞার বিষয় না জানিয়া কমলাকান্ত শপথ গ্রহণ করিতে পারেন না, তাই চাপরাশী তাঁহাকে জানাইযা দিল যে, এ প্রতিজ্ঞা সত্যভাষণের—তখন অবশ্য কমলাকান্ত বিনা প্রতিবাদে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলেন।

ইহার পর উকিল কমলাকান্তকে বলিলেন—"...আমি যা জিজ্ঞাসা করি, তার যথার্থ উত্তর দাও। বাজে কথা ছাডিযা দাও।" শুনিযাই তো কমলাকান্তের মেজাজ খারাপ হইযা গেল। প্রকৃত সত্যভাষণকে এমন করিয়া সীমাবদ্ধ করা চলে না, অথচ আদালতে এই সাজান-গোছান কৃত্রিম সত্যেরই কারবার চলে। কমলাকান্তকে ভীষ্মদেব খোসনবীশ এবং উকিলবাবু যতই উন্মাদ মনে করুন না কেন, তাঁহার এই সময়ের প্রচ্ছন্ন শ্লেষের উক্তিগুলি সহজ-সত্যের আলোকে উজ্জ্বল। জবানবন্দী-গ্রহণের গতানুগতিকতাকেও কমলাকান্ত ব্যঙ্গ করিতে ছাড়েন নাই। এত পিতৃপরিচয়, কুল-পরিচয়, জাতিবর্ণ জিজ্ঞাসার প্রযোজনই বা কোথায়? বর্ণহীনের কি সত্যভাষণের অধিকার নাই? ইহার পর উকিলবাবু আরো বিপদগ্রস্ত হইলেন কমলাকান্তের নিবাস, পেশা ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া। কিন্তু সবচেয়ে বাধিল, কমলাকান্ত প্রসন্ন গোয়ালিনীকে চেনেন কিনা এই প্রশ্নে। কমলাকান্ত স্পষ্টই বলিলেন যে, তিনি প্রসন্নর দুধ, দই চেনেন কিন্তু প্রসন্নকে চেনেন না—"মেয়ে-মানুষকে কে কবে চিনিতে পেরেছে, দিদি?" কথাটি রহস্যচ্ছলে বলা হইলেও ইহার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন দার্শনিকতা রহিয়াছে তাহার ইঙ্গিত বুঝিতে পারা নিতান্ত কষ্টসাধ্য

নয়। পৃথিবীতে আমরাও আচরণের দ্বারা মানুষকে দেখি, কিন্তু তাহাতে মানুষের কতটা ধরা পড়ে—এইজন্য কোন মানুষকে সম্পূর্ণ চিনিযাছি, একথা বলা একান্ত ভুল।

ইহার পর উঠিল গোরুচুরির প্রসঙ্গ। উকিল কমলাকান্তকে এবিষয়ে প্রশ্ন করিতেই তিনি সাফ্ বলিযা দিলেন যে, গোরুচুরির বিদ্যা কোন পুরুষেই তাঁহাদের জ্ঞাত নয়, আর চোরে চুরি করিবার সময় কাহাকেও বলিয়া কহিযা সাক্ষী রাখিযা চুরি করে না। উকিলবাবু বেগতিক দেখিয়া প্রসন্নর কথামত চুরির প্রসঙ্গ ছাড়িযা কমলাকান্তকে গোরু সনাক্ত করিতে বলিলেন। ইহার পর কমলাকান্তকে রোখা দায় হইল—কথার পিঠে কথা বলিতে বলিতে তিনি বিচারক হইতে উকিল পর্যন্ত সকলকেই গোরু বলিযা ফেলিলেন—

'কমলাকান্ত জোড়হাত করিয়া বলিল, "কোন্ গোরুটি, ধর্ম্মাবতার?"

হাকিম বলিলেন, "কোন্ গোরুটি কি? একটি বই ত সাম্‌নে নাই?"

কমলা। আপনি দেখিতেছেন একটি—আমি দেখিতেছি অনেকগুলি।'

গোরু ছাড়া আর কি? যে মানুষগুলি মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়া কৃত্রিম কথার কার-চুপিকেই সর্বস্ব জ্ঞান করিযা বিচারের প্রহসনকেই বিচার মনে করিতেছে তাহাদিগকে গোরু ছাড়া আর কি বলা যায়? বিশেষ করিযা শামলা-মাথায় উকিলবাবু তো বৃষকুলতিলক। "Contempt of Court"-এর বিধানে কমলাকান্তের পাঁচ টাকা জরিমানা হইল, অনাদায়ে একমাস কয়েদের নির্দেশবাণী আসিল। কমলাকান্ত তাহাতেই রাজি—একমাসের জাযগায় দুইমাস হইলে আরো ভালো, ইহা তো রাজসরকারের ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ।

কিন্তু গোরু দেখিয়া কমলাকান্ত বলিলেন যে, গোরু তাঁহার। প্রসন্ন তাহার পালনকর্ত্রী হইতে পারে, কিন্তু যেহেতু গোরুর দুধ, ঘি, ছানা, মাখন কমলাকান্তই খাইয়াছেন, সুতরাং গোরুর আসল অধিকার তাঁহাতেই বর্তিয়াছে। অভিজ্ঞ পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, কথাটি রহস্যচ্ছলে বলা হইলেও ইহার মধ্যে সমাজতন্ত্রবাদের প্রচ্ছন্ন ইংগিত বর্তমান। জমির প্রকৃত মালিক কে? অত্যাচারী জমিদার না চাষী? "বিড়াল" প্রবন্ধে এই আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছিল। মামলা যখন মিটিয়া গিয়াছে তখনও কমলাকান্তকে এই কথাই বলিতে শুনি—

"তোর মঙ্গলার বাঁটের দিব্য, তোর দুধের কেঁড়ের দিব্য, তোর ঘোলমউনির দিব্য, তোর ফাঁদি-নথের দিব্য, তুই যদি চোরকে গোরু ছেড়ে না দিস্!"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "চক্রবর্ত্তী মহাশয়! চোরকে গরু ছাড়িয়া দিবে কেন?"

কমলাকান্ত বলিল, "Liberty! Individuality! Fraternity! Humanity! মটরস্থঁটি!"

"কমলাকান্তের জোবানবন্দী" বঙ্কিম সাহিত্যের একটি আশ্চর্য রত্ন। "কমলাকান্তের দপ্তর"-এর বঙ্কিমচন্দ্র মূলতঃ Humourist—"ইহাদের মধ্যে পূর্ব্বে Humour-এর যে সমস্ত স্বভাবসিদ্ধ গুণ বিশ্লেষণ করা হইয়াছে তাহা পূর্ণমাত্রায় প্রতিফলিত" ("বঙ্গ-সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা")। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে Humour-এর সহিত Wit জাতীয় হাস্যরসের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। "Wit হইতেছে বুদ্ধির তরবারি-খেলা, নিঃসম্পর্কিত বস্তু বা চিন্তার মধ্যে বিদ্যুৎ-ঝলকের ন্যায় অতর্কিত সাদৃশ্য আবিষ্কার।" (ঐ)। উপস্থিত ক্ষেত্রে Wit সৃষ্ট হইয়াছে প্রধানতঃ "Pun" বা শ্লেষোক্তি প্রয়োগের মধ্য দিয়া। এই বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরসের উজ্জ্বল ব্যবহার কমলাকান্তের বৌদ্ধিক-ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। ভীষ্মদেব খোসনবীশের মত অনেকেই হয়ত কমলাকান্তকে পাগল বলিবে—G. K. Chesterton-এর সেই "Queer Traders' Club" উপন্যাসের বেসিল গ্রাণ্টকেও সাধারণ লোক পাগল বলিয়া জানিত—দিলদারের উক্তিগুলিও সাধারণ্যে অসংলগ্ন বাক্যবিলাস বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্তু গভীরভাবে দেখিলে বুঝিতে পারি যে, সাধারণ মানুষের গতানুগতিক মননভূমির অনেক ঊর্ধ্বে ছিলেন বলিয়াই ইঁহাদের এই দুর্গতি।

কমলাকান্তের হাস্যরসের প্রকৃতি

কমলাকান্তের দপ্তরের পরিচয়দান প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, "এই প্রবন্ধগুলিতে জীবনের তীক্ষ্ণ, মৌলিক বিশ্লেষণ, সমালোচনার বিশিষ্ট ভঙ্গী, কল্পনাসমৃদ্ধিযোগে অপরূপ ও বিশুদ্ধ-হাস্য-কিরণ-সম্পাতে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। গভীর চিন্তাশীলতা, জীবনের করুণ রিক্ততা বঞ্চনার আবেগ-কম্পিত উপলব্ধির সহিত হাস্যোদ্দীপক, লীলায়িত অথচ সূক্ষ্ম সংযমবোধ-নিয়ন্ত্রিত কল্পনা-বিলাসের অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। আবার এই কল্পনাবিলাস ও হাস্যরসেরও নানাপ্রকার সূক্ষ্ম স্তরবিভেদ অনুভব করা যায়। কল্পনা কোথাও শান্ত, মৃদু, গভীর চিন্তার ভাবে আত্মসংবৃত ও মন্থরগতি; কোথাও বা তীব্র আবেগকম্পিত; কোথাও বা বাধাবন্ধনহীন, পূর্ণাচ্ছাদিত। তেমনই হাস্যরসও কোথাও অতিসংযত, অলক্ষিত-প্রায়, একটু বক্র কটাক্ষ ও ওষ্ঠাধরের ঈষৎ বঙ্কিম আন্দোলনে মাত্র প্রকাশিত; কোথাও farce-এর মত উতরোল, উচ্চকণ্ঠ; কোথাও বা comedyর উদার

প্রাণখোলা উচ্ছাস, কোথাও বা tragedyর গম্ভীর-বিষণ্ণ আভাসে স্নিগ্ধসজল। ভাবরাজ্যের সুরগ্রামের সমস্ত উচ্চনীচ পর্দা ও তাহাদের মধ্যবর্তী সূক্ষ্ম মীড়মূর্ছনার উপর লেখকের সমান অধিকার—'কমলাকান্তের দপ্তর' একটি তাললয়শুদ্ধ সঙ্গীতের মত আমাদের রসবোধককে পরিপূর্ণ তৃপ্তিদান করে।

…humour-এর লক্ষণ হইতেছে—একটি অসাধারণ দৃষ্টিকেন্দ্র হইতে জীবনের পর্যবেক্ষণ ও তাহার প্রচলিত গতির মধ্যে নানা বক্ররেখা ও সূক্ষ্ম অসঙ্গতির কৌতুককর আবিষ্কার। অনেকগুলি প্রবন্ধে—বঙ্কিমচন্দ্র জীবনকে একটা প্রবল, সর্বব্যাপী, হাস্যকর অথচ গভীর অর্থপূর্ণ কল্পনার মধ্য দিয়া দেখিয়াছেন; সেই কল্পনার দ্বারা বিকৃত ও রূপান্তরিত হইয়া জীবনের সমস্ত প্রচেষ্টা ও উদ্দেশ্য এক ব্যর্থ উদ্ভট খেয়ালের সূত্রে গ্রথিত বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। 'মনুষ্যফল', 'পতঙ্গ', 'বড় বাজার', 'বিড়াল', 'ঢেঁকি', 'পলিটিকৃস্', 'বাঙ্গালির মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধগুলি এই প্রণালীর উদাহরণ। এই সমস্ত প্রবন্ধেই জীবনক্ষেত্রে কল্পনার প্রয়োগ খুব স্বাভাবিক হইয়াছে ও উপমাগুলির নির্বাচন সাদৃশ্য-আবিষ্কারের আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় দেয়। হয়ত স্থানে স্থানে তুলনার মধ্যে একটু কষ্টকল্পনার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়; হয়ত কোথাও কোথাও লেখকের জীবন-সমালোচনা যেন একটু অতিরিক্ত মাত্রায় কল্পনাবিলাসী (far-fetched) বলিয়া আমাদের মৃদু প্রতিবাদ স্পৃহা জাগায়। কিন্তু লেখকের অনুভূতির প্রখরতায়, কল্পনাস্রোতের প্রবল প্রবাহে এসমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্দেহ কোথায় ভাসিয়া যায়। এই সমস্ত প্রবন্ধে ভাবের নৌকা, কল্পনার প্রবাহবিস্তারে এমন অবলীলাক্রমে, স্বচ্ছন্দগতিতে ভাসিয়া যায় যে, কোথাও বাস্তবের অর্ধমগ্ন চড়ায় ঠেকিয়া বিরক্তিকর পৌনঃপুনিক আবর্তনের ঘূর্ণিচক্রে পাক খাইয়া ইহার অগ্রগতি প্রতিহত হয় না। আকাশে মেঘের স্তরবিন্যাসের মধ্যে যেমন একটি সূক্ষ্ম, অথচ সুস্পষ্ট পর্যায়-রেখা অনুভব করা যায়, একবর্ণ যেমন প্রায় অলক্ষিতভাবে ভাবে, অথচ সুষমার সহিত বর্ণান্তরে মিলাইয়া যায়, 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর সন্দর্ভগুলিতেও প্রসঙ্গ-পরিবর্তন রীতির মধ্যে (method of transition) সেইরূপ একটি স্বচ্ছন্দ, ক্ষিপ্র লঘুগতির পরিচয় পাওয়া যায়। চিন্তাধারা নদীর বাঁকের মত অত্যন্ত অনায়াস গতিতে, সাবলীল ভঙ্গীতে, অথচ অনিবার্য নিয়মাধীন হইয়া মোড় ফিরিয়াছে—সেখানে লেখক তরল রঙ্গরস ও ব্যঙ্গবিদ্রূপ হইতে হঠাৎ উচ্চ নীতিবাদের অচপল গাম্ভীর্যে আসীন হইয়াছেন, সেখানেও প্রায়ই সুরের ঐকতান ছিন্ন বা খণ্ডিত হয় নাই। অশোভন ব্যস্ততা বা আয়াসসাধ্য চমক-

প্রদানের কোন চিহ্ন নাই—এই অবিচ্ছিন্ন সুর সন্দর্ভগুলিকে গীতিকাব্যের ঐক্য দান করিয়াছে!

…কমলাকান্ত যেখানে নীতিপ্রচারকের উচ্চমঞ্চে আরোহণ করিয়াছে, সেখানেও সে তাহার স্বাভাবিক বিনয় ও সরস বচনভঙ্গী হারায় নাই। নীতির তিক্ত বটিকা রসিকতার শর্করাবৃত হইযা সুখসেব্য হইয়াছে।

…বসন্তের কোকিল ও ফুলের বিবাহ কল্পনার ক্রীড়াশীল উচ্ছ্বাস—ইংরাজিতে যাহাকে fantasy বলে সেই জাতীয় রচনা। ইহাদের মধ্যে প্রথম প্রবন্ধে কোকিলের প্রতিকূল সমালোচনা হঠাৎ সহানুভূতির ও সমব্যবসায়ীর প্রীতিবন্ধনে রূপান্তরিত হইয়াছে।

…কমলাকান্তের দপ্তর যে কেবল মাত্র উচ্চরঙ্গের রসিকতার নিদর্শন, বা তীক্ষ্ণ চিন্তাশীলপূর্ণ দার্শনিক প্রবন্ধের সমষ্টি শুধু তাহা নহে। ইহার সন্দর্ভগুলির মধ্যে কেবল যে একটা ভাবগত ঐক্য আছে—তাহাও নহে, বক্তার চরিত্রগত ঐক্যও সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছে। রচনাগুলির মধ্য দিয়া কমলাকান্তের একটি উজ্জ্বল ছবি বর্ণ ও রেখায় মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে—কমলাকান্ত Dickens-এর Pickwick-এর ন্যায় আমাদের হৃদয়ে চিরপরিচিত বন্ধুর আসন গ্রহণ করিয়াছে। তাই মন্তব্যগুলিকে আমরা লেখকের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের সহিত বিচ্ছিন্ন করিযা দেখিতে পারি না। প্রবন্ধগুলির মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আত্মপরিচযের ইঙ্গিতগুলি লেখকের কলাকৌশলে যথাযথ বিন্যস্ত হইয়া একটি পূর্ণাঙ্গ, জীবন্ত সৃষ্টির রূপ ধরিয়াছে। তাহার অহিফেনাসক্তি ও ঔদরিকতা, সাংসারিক নির্লিপ্ততা, নসীবাবুর পরিবারে প্রতিপাল্যের ন্যায় আশ্রয়গ্রহণ, তাহার কল্পনাপ্রবণতা, তাহার লৌকিক ব্যবহারে ও বৈষয়িক চিন্তাধারায় হাস্যকর অসঙ্গতি, প্রসন্ন গোয়ালিনীর প্রতি তাহার গব্যরস ও কাব্যরসে মিশ্রিত অর্ধ-প্রণয়ীর সরস মনোভাব, তাহার গ্রাম্য জীবনের প্রতিভা হইতে দার্শনিক চিন্তার খোরাক সংগ্রহ, সর্বোপরি আদালতের বিসদৃশ ক্ষেত্রে তাহার দার্শনিক ও তার্কিক প্রতিভার বিস্ময়কর বিকাশ—এই সমস্তই কমলাকান্তকে জীবনের বৈদ্যুতিক শক্তিতে পূর্ণ রক্তমাংসের মানুষরূপে আমাদের সম্মুখে দাঁড় করাইয়াছে। শুধু সে নহে, তাহার সংসর্গে যে সমস্ত ব্যক্তি আসিয়াছে—যথা, নসীরামবাবু ও প্রসন্ন গোয়ালিনী, তাহারা কমলাকান্তের পূর্ণ জীবনীশক্তির কতকটা অংশ গ্রহণ করিয়াছে। দার্শনিকতার মধ্যে সমসাময়িক রাজনীতি-তত্ত্বের ইঙ্গিত তাহার ব্যক্তিত্বকে আরও বিশিষ্ট রূপ দিয়াছে, আরও পূর্ণ বিকশিত করিয়াছে। এই জীবন্ত চরিত্র সৃষ্টির জন্য, একটা

গতিশীল জীবননাট্যের ক্ষুদ্র ঘাতপ্রতিঘাতের আভাস ব্যঞ্জনার জন্য 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর উপন্যাসের ইতিহাসে একটা প্রকৃত স্থান আছে—বঙ্কিমের সৃষ্ট চরিত্র-মালার মধ্যে কমলাকান্ত কুসুমও গ্রথিত হইবার যোগ্য।"

ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব

কমলাকান্তের দপ্তরের উপর ইংরেজী সাহিত্যেব প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিযা শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন, "বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তরের ভাব ও রীতির উপরে ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। এখানে সেখানে বহিরঙ্গে যে সকল মিল রহিযাছে তাহার কথা বাদ দিলেও মৌলিক আকৃতি-প্রকৃতির সাদৃশ্য উপেক্ষণীয নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের পরিহাস এবং বিদ্রূপ-সমন্বিত—সমালোচনাত্মক প্রবন্ধগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজী রচনা-সাহিত্যের, বিশেষ করিয়া এডিসন এবং ষ্টীলের রচনার সমধর্মী। এডিসন, ষ্টীল প্রভৃতির লেখা যে সকল সাময়িক পত্রে বাহির হইত তাহার ভিতরে প্রধান পত্র—'স্পেক্টেটর'। ইহার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন পত্রিকার নামসাদৃশ্যও লক্ষণীয। এডিসন ও ষ্টীল একজাতীয হাস্যরসাত্মক রচনার প্রচলন করিযাছিলেন, যাহার ভিতর দিয়া তাঁহারা পরিহাসচ্ছলে তৎকালীন সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে যে সকল গলদ দেখা দিযাছিল তাহার তীব্র সমালোচনা করিযাছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের দপ্তরগুলির মধ্যে অনেকগুলি দপ্তর এই আদর্শে অনুপ্রাণিত।"

২৯।৬ গল্‌ফ ক্লাব রোড
কলিকাতা-৩৩
১২ই কার্তিক, ১৩৬৫

শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগ্‌চী

প্রথমবারের বিজ্ঞাপন

কমলাকান্তের দপ্তর বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত করা গেল। বঙ্গদর্শনে যে কয় সংখ্যা প্রকাশ হইয়াছে, তাহার মধ্যে "চন্দ্রালোকে", "মশক" এবং "স্ত্রীলোকের রূপ" এই তিন সংখ্যা আমার প্রণীত নহে, এইজন্য ঐ তিন সংখ্যা পুনর্মুদ্রিত করিতে পারিলাম না।

বঙ্গদর্শনে কমলাকান্তের দপ্তর সমাপ্ত হয় নাই। এইজন্য এই গ্রন্থের নামকরণে "প্রথম খণ্ড" লেখা হইল।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিজ্ঞাপন

এই গ্রন্থ কেবল "কমলাকান্তের দপ্তরের" পুনঃ সংস্করণ নহে। "কমলাকান্তের দপ্তর" ভিন্ন ইহাতে "কমলাকান্তের পত্র" ও "কমলাকান্তের জোবানবন্দী" এই দুইখানি নূতন গ্রন্থ আছে।

কমলাকান্তের দপ্তরেও দুইটি নূতন প্রবন্ধ এবার বেশী আছে। "চন্দ্রালোকে" এবং "স্ত্রীলোকের রূপ" এই দুইটি প্রবন্ধ কমলাকান্তের দপ্তরের প্রথম সংস্করণে পরিত্যাগ করা গিয়াছিল। তাহার কারণ এই যে, ঐ দুইটি আমার প্রণীত নহে। "চন্দ্রালোকে" আমার প্রিয় সুহৃৎ শ্রীমান্ বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকারেব রচিত, এবং "স্ত্রীলোকের রূপ" আমার প্রিয় সুহৃৎ শ্রীমান্ বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রচিত। উঁহারা স্ব স্ব রচনার সঙ্গে ঐ প্রবন্ধদ্বয় পুনর্মুদ্রিত করিবেন, এই ইচ্ছায় আমি কমলাকান্তের দপ্তরের প্রথম সংস্করণে এই দুইটি পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। এক্ষণে লেখকদিগের নিকট জানিয়াছি যে, তাঁহারা ঐ দুইটি প্রবন্ধ নিজে নিজে পুনর্মুদ্রিত করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব, তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে ঐ দুইটি প্রবন্ধ কমলাকান্তের দপ্তরের দ্বিতীয় সংস্করণ-ভুক্ত করা গেল।

কমলাকান্তের পত্র তিনখানি মাত্র বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয। তিনখানি ভাঙ্গিযা এখন চারখানি হইয়াছে। "বুড়া বয়সের কথা" যদিও বঙ্গদর্শনে কমলাকান্তের নামযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই, তথাপি উহার মর্ম্ম কমলাকান্তি

বলিযা উহাও "কমলাকান্তের পত্র" মধ্যে সন্নিবেশিত করিযাছি। মোটে পাঁচখানি।

"কমলাকান্তের জোবানবন্দী" সমেত সর্ব্বশুদ্ধ আটটি নূতন পুনর্মুদ্রিত করা গেল। গ্রন্থের আকার অনেক বাড়িযাছে বলিয়া এবং অন্য কারণেও গ্রন্থের মূল্যও বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইযাছি।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন

"ঢেঁকি" শীর্ষক প্রবন্ধটি ভুলক্রমে পূর্ব্বসংস্করণভুক্ত হয নাই। উহাও বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইযাছিল, কিন্তু এই প্রথম পুনর্মুদ্রিত হইল।

কমলাকান্তের দপ্তর

(তৃতীয় সংস্করণ)

উৎসর্গ

পণ্ডিতাগ্রগণ্য

শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন মহাশয়কে

এই গ্রন্থ

প্রণয়োপহার স্বরূপ

অর্পিত

হইল।

কমলাকান্তের দপ্তর

অনেকে কমলাকান্তকে পাগল বলিত। সে কখন্ কি বলিত, কি করিত, তাহার স্থিরতা ছিল না। লেখাপড়া না জানিত, এমত নহে। কিছু ইংরেজি, কিছু সংস্কৃত জানিত। কিন্তু যে বিদ্যায় অর্থোপার্জ্জন হইল না, সে বিদ্যা কি বিদ্যা? আসল কথা এই, সাহেব সুবোর কাছে যাওয়া আসা চাই। কত বড় বড় মূর্খ, কেবল নাম দস্তখত করিতে পারে,—তাহারা তালুক মুলুক করিল—আমার মতে তাহারাই পণ্ডিত। আর কমলাকান্তের মত বিদ্বান্, যাহারা কেবল কতকগুলা বহি পড়িয়াছে, তাহারা আমার মতে গণ্ডমূর্খ।

কমলাকান্তের একবার চাকরি হইয়াছিল। একজন সাহেব তাহার ইংরেজি কথা শুনিয়া, ডাকিয়া লইয়া গিয়া একটি কেরাণীগিরি দিয়াছিলেন। কিন্তু কমলাকান্ত চাকরি রাখিতে পারিল না। আপিসে গিয়া, আফিসের কাজ করিত না। সরকারি বহিতে কবিতা লিখিত—আফিসের চিঠিপত্রের উপরে সেক্ষপীয়র নামক কে লেখক আছে, তাহার বচন তুলিয়া লিখিয়া রাখিত; বিলবহির পাতায় ছবি আঁকিয়া রাখিত। এক বার সাহেব তাহাকে মাস্কাবারের পে-বিল প্রস্তুত করিতে বলিয়াছিলেন। কমলাকান্ত বিলবহি লইয়া একটি চিত্র আঁকিল যে, কতকগুলি নাগা ফকির সাহেবের কাছে ভিক্ষা চাহিতেছে, সাহেব দুই চারিটা পয়সা ছড়াইয়া ফেলিয়া দিতেছেন। নীচে লিখিয়া দিল "যথার্থ পে-বিল।" সাহেব নূতনতর পে-বিল দেখিয়া কমলাকান্তকে মানে মানে বিদায় দিলেন।

কমলাকান্তের চাকরি সেই পর্য্যন্ত। অর্থেরও বড় প্রয়োজন ছিল না। কমলাকান্ত কখন দারপরিগ্রহ করেন নাই। স্বয়ং যেখানে হয়, দুইটি অন্ন এবং আধ ভরি আফিম পাইলেই হইত। যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকিত। অনেক দিন আমার বাড়ীতে ছিল। আমি তাহাকে পাগল বলিয়া যত্ন করিতাম। কিন্তু আমিও তাহাকে রাখিতে পারিলাম না। সে কোথাও স্থায়ী হইত না। এক দিন প্রাতে উঠিয়া ব্রহ্মচারীর মত গেরুয়া-বস্ত্র পরিয়া, কোথায় চলিয়া গেল। কোথায় চলিয়া গেল, আর তাহাকে পাইলাম না। সে এ পর্য্যন্ত আর ফিরে নাই।

তাহার একটি দপ্তর ছিল। কমলাকান্তের কাছে ছেঁড়া কাগজ পড়িতে পাইত না; দেখিলেই তাহাতে কি মাথা মুণ্ড লিখিত, কিছু বুঝিতে পারা যাইত না। কখন কখন আমাকে পড়িয়া শুনাইত—শুনিলে আমার নিদ্রা আসিত। কাগজগুলি

একখানি মসীচিত্রিত, পুরাতন, জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডে বাঁধা থাকিত। গমনকালে, কমলাকান্ত আমাকে সেই দপ্তরটি দিয়া গেল। বলিয়া গেল, তোমাকে ইহা বখ্‌শিশ করিলাম।

এ অমূল্য রত্ন লইয়া আমি কি করিব? প্রথমে মনে করিলাম, অগ্নিদেবকে উপহার দিই। পরে লোকহিতৈষিতা আমার চিত্তে বড় প্রবল হইল। মনে কবিলাম যে, যে লোকের উপকার না করে, তাহার বৃথায় জন্ম। এই দপ্তরটিতে অনিদ্রার অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ আছে—যিনি পড়িবেন, তাঁহারই নিদ্রা আসিবে। যাঁহারা অনিদ্রারোগে পীড়িত, তাঁহাদিগেব উপকারার্থে আমি কমলাকান্তের রচনাগুলি প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম।

শ্রীভীষ্মদেব খোশনবীস

প্রথম সংখ্যা

একা

"কে গায় ওই?"

বহুকাল বিস্মৃত সুখস্বপ্নের স্মৃতির ন্যায় ঐ মধুর গীতি কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। এত মধুর লাগিল কেন? এই সঙ্গীত যে অতি সুন্দর, এমত নহে। পথিক পথ দিয়া, আপন মনে গায়িতে গায়িতে যাইতেছে। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি দেখিয়া, তাহার মনের আনন্দ উছলিয়া উঠিয়াছে। স্বভাবতঃ তাহার কণ্ঠ মধুর;—মধুর কণ্ঠে, এই মধুমাসে, আপনার মনের সুখের মাধুর্য্য বিকীর্ণ করিতে করিতে যাইতেছে। তবে বহুতন্ত্রীবিশিষ্ট বাদ্যের তন্ত্রীতে অঙ্গুলিস্পর্শের ন্যায়, ঐ গীতিধ্বনি আমার হৃদয়কে আলোড়িত করিল কেন?

কেন, কে বলিবে? রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী—নদী-সৈকতে কৌমুদী হাসিতেছে। অর্দ্ধাবৃতা সুন্দরীর নীল বসনের ন্যায় শীর্ণ-শরীরা নীল-সলিলা তরঙ্গিণী, সৈকত বেষ্টিত করিয়া চলিয়াছেন; রাজপথে, কেবল আনন্দ—বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, বিমল চন্দ্রকিরণে স্নাত হইয়া, আনন্দ করিতেছে। আমিই কেবল নিরানন্দ—তাই ঐ সঙ্গীতে আমার হৃদয়যন্ত্র বাজিয়া উঠিল।

আমি একা—তাই এই সঙ্গীতে আমার শরীর কণ্টকিত হইল। এই বহুজনাকীর্ণ নগরীমধ্যে, এই আনন্দময়, অনন্ত জনস্রোতোমধ্যে, আমি একা। আমিও কেন ঐ অনন্ত জনস্রোতোমধ্যে মিশিয়া, এই বিশাল আনন্দতরঙ্গ-তাড়িত জলবুদ্বুদসমূহের মধ্যে আর একটি বুদ্বুদ না হই? বিন্দু বিন্দু বারি লইয়া সমুদ্র; আমি বারিবিন্দু এ সমুদ্রে মিশাই না কেন?

তাহা জানি না—কেবল ইহাই জানি যে, আমি একা। (কেহ একা থাকিও না। যদি অন্য কেহ তোমার প্রণয়ভাগী না হইল, তবে তোমার মনুষ্যজন্ম বৃথা। পুষ্প সুগন্ধি, কিন্তু যদি ঘ্রাণগ্রহণকর্ত্তা না থাকিত, তবে পুষ্প সুগন্ধি হইত না—ঘ্রাণেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট না থাকিলে গন্ধ নাই। পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না। পরের জন্য তোমার হৃদয়-কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।)

কিন্তু বারেক মাত্র শ্রুত ঐ সঙ্গীত আমার কেন এত মধুর লাগিল, তাহা বলি নাই। অনেক দিন আনন্দোত্থিত সঙ্গীত শুনি নাই—অনেক দিন আনন্দানুভব করি

নাই। যৌবনে যখন পৃথিবী সুন্দরী ছিল, যখন প্রতি পুষ্পে সুগন্ধ পাইতাম, প্রতি পত্রমর্ম্মরে মধুর শব্দ শুনিতাম, প্রতি নক্ষত্রে চিত্রা রোহিণীর শোভা দেখিতাম, প্রতি মনুষ্যমুখে সরলতা দেখিতাম, তখন আনন্দ ছিল। পৃথিবী এখনও তাই আছে, সংসার এখনও তাই আছে, মনুষ্য-চরিত্র এখনও তাই আছে। কিন্তু এ হৃদয় আর তাই নাই। তখন সঙ্গীত শুনিযা আনন্দ হইত। আজি এই সঙ্গীত শুনিযা সেই আনন্দ মনে পড়িল। যে অবস্থায, যে সুখে সেই আনন্দ অনুভূত করিতাম, সেই অবস্থা, সেই সুখ, মনে পড়িল। মুহূর্ত্ত জন্য আবার যৌবন ফিরিয়া পাইলাম। আবার তেমনি করিযা, মনে মনে সমবেত বন্ধুমণ্ডলীমধ্যে বসিলাম; আবার সেই অকারণসঞ্জাত উচ্চ হাসি হাসিলাম, যে কথা নিষ্প্রযোজনীয বলিযা এখন বলি না, নিষ্প্রযোজনেও চিত্তের চাঞ্চল্য হেতু তখন বলিতাম, আবার সেই সকল বলিতে লাগিলাম; আবার অকৃত্রিম হৃদযে পরের প্রণয অকৃত্রিম বলিযা মনে মনে গ্রহণ করিলাম। ক্ষণিক ভ্রান্তি জন্মিল—তাই এ সঙ্গীত এত মধুর লাগিল; শুধু তাই নয়। তখন সঙ্গীত ভাল লাগিত,—এখন লাগে না—চিত্তের যে প্রফুল্লতার জন্য ভাল লাগিত, সে প্রফুল্লতা নাই বলিয়া ভাল লাগে না। আমি মনের ভিতর মন লুকাইয়া সেই গত যৌবনসুখ চিন্তা করিতেছিলাম—সেই সমযে এই পূর্ব্বস্মৃতিসূচক সঙ্গীত কর্ণে প্রবেশ করিল, তাই এত মধুব বোধ হইল।

সে প্রফুল্লতা, সে সুখ আর নাই কেন? সুখের সামগ্রী কি কমিযাছে? অর্জ্জন এবং ক্ষতি, উভযেই সংসারের নিযম। কিন্তু ক্ষতি অপেক্ষা অর্জ্জন অধিক, ইহাও নিয়ম। তুমি জীবনের পথ যতই অতিবাহিত করিবে, ততই সুখদ সামগ্রী সঞ্চয় করিবে। তবে বয়সে স্ফূর্ত্তি কমে কেন? পৃথিবী আর তেমন সুন্দরী দেখা যায় না কেন? আকাশের তারা আর তেমন জ্বলে না কেন? আকাশের নীলিমায় আর সে উজ্জ্বলতা থাকে না কেন? যাহা তৃণপল্লবময়, কুসুমসুবাসিত, স্বচ্ছ কল্লোলিনী-শীকর-সিক্ত, বসন্তপবনবিধূত বলিযা বোধ হইত, এখন তাহা বালুকাময়ী মরুভূমি বলিয়া বোধ হয় কেন? কেবল রঙ্গিল কাচ নাই বলিযা। আশা সেই রঙ্গিল কাচ। যৌবনে অর্জ্জিত সুখ অল্প, কিন্তু সুখের আশা অপরিমিতা। এখন অর্জ্জিত সুখ অধিক, কিন্তু সেই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী আশা কোথায? তখন জানিতাম না, কিসে কি হয়, অনেক আশা করিতাম। এখন জানিয়াছি, এই সংসারচক্রে আরোহণ করিয়া, যেখানকার আবার সেইখানে ফিরিয়া আসিতে হইবে; যখন মনে ভাবিতেছি, এই অগ্রসর হইলাম, তখন কেবল আবর্ত্তন করিতেছি মাত্র। এখন বুঝিয়াছি যে, সংসার-সমুদ্রে সন্তরণ আরম্ভ করিলে, তরঙ্গে তরঙ্গে আমাকে প্রহত করিয়া আবার আমাকে

ফুলে ফেলিয়া যাইবে। এখন জানিয়াছি যে, এ অরণ্যে পথ নাই, এ প্রান্তরে জলাশয় নাই, এ নদীর পার নাই, এ সাগরে দ্বীপ নাই, এ অন্ধকারে নক্ষত্র নাই। এখন জানিয়াছি যে, কুসুমে কীট আছে, কোমল পল্লবে কণ্টক আছে, আকাশে মেঘ আছে, নির্ম্মলা নদীতে আবর্ত্ত আছে, ফলে বিষ আছে, উদ্যানে সর্প আছে; মনুষ্য-হৃদয়ে কেবল আত্মাদর আছে। এখন জানিয়াছি যে, বৃক্ষে বৃক্ষে ফল ধরে না, ফুলে ফুলে গন্ধ নাই, মেঘে মেঘে বৃষ্টি নাই, বনে বনে চন্দন নাই, গজে গজে মৌক্তিক নাই। এখন বুঝিতে পারিযাছি যে, কাচও হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল, পিতলও সুবর্ণের ন্যায় ভাস্বর, পঙ্কও চন্দনের ন্যায় স্নিগ্ধ, কাংস্যও রজতের ন্যায় মধুরনাদী।—কিন্তু কি বলিতেছিলাম, ভুলিযা গেলাম। সেই গীতধ্বনি! উহা ভাল লাগিযাছিল বটে, কিন্তু আর দ্বিতীয বার শুনিতে চাহি না। উহা যেমন মনুষ্যকণ্ঠজাত সঙ্গীত, তেমনি সংসারের এক সঙ্গীত আছে। সংসাররসে রসিকেরাই তাহা শুনিতে পায। সেই সঙ্গীত শুনিবার জন্য আমার চিত্ত আকুল। সে সঙ্গীত আর কি শুনিব না? শুনিব, কিন্তু নানাবাদ্যধ্বনিসংমিলিত বহুকণ্ঠপ্রসূত সেই পূর্ব্বশ্রুত সংসার-সঙ্গীত আর শুনিব না। সে গাযকেরা আর নাই—সে বযস নাই, সে আশা নাই। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যাহা শুনিতেছি, তাহা অধিকতর প্রীতিকর। অনন্তসহায একমাত্র গীতধ্বনিতে কর্ণবিবর পরিপূরিত হইতেছে। প্রীতি সংসারে সর্ব্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি। প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসার-সঙ্গীত! অনন্ত কাল সেই মহাসঙ্গীত সহিত মনুষ্য-হৃদয়-তন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে তবে আমি অন্য সুখ চাই না।

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী

দ্বিতীয় সংখ্যা

মনুষ্য ফল

আফিমের একটু বেশী মাত্রা চড়াইলে, আমার বোধ হয, মনুষ্যসকল ফলবিশেষ—মাযাবৃন্তে সংসার বৃক্ষে ঝুলিযা রহিয়াছে, পাকিলেই পড়িয়া যাইবে। সকলগুলি পাকিতে পায় না—কতক অকালে ঝড়ে পড়িয়া যায। কোনটি পোকায় খায়, কোনটিকে পাখীতে ঠোকরায়। কোনটি শুকাইয়া ঝরিযা পড়ে। কোনটি সুপক্ক হইয়া আহরিত হইলে গঙ্গাজলে ধৌত হইয়া দেবসেবায বা ব্রাহ্মণভোজনে লাগে—তাহাদিগেরই ফলজন্ম বা মনুষ্যজন্ম সার্থক; কোনটি সুপক্ক হইয়া, বৃক্ষ হইতে খসিয়া পড়িয়া মাটিতে পড়িয়া থাকে, শৃগালে খায়। তাহাদিগের মনুষ্যজন্ম বা ফলজন্ম বৃথা।

কতকগুলি তিক্ত, কটু বা কষায়,—কিন্তু তাহাতে অমূল্য ঔষধ প্রস্তুত হয়। কতকগুলি বিষময়—যে খায়, সেই মরে। আর কতকগুলি মাকাল জাতীয়—কেবল দেখিতে সুন্দর।

কখন কখন ঝিমাইতে ঝিমাইতে দেখিতে পাই যে, পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ের মনুষ্য পৃথক্ জাতীয় ফল। আমাদের দেশের এক্ষণকার বড়মানুষদিগকে মনুষ্যজাতিমধ্যে কাঁটাল বলিয়া বোধ হয়। কতকগুলি খাসা খাজা কাঁটাল, কতকগুলির বড় আটা, কতকগুলি কেবল ভুতুড়িসার, গরুর খাদ্য। কতকগুলি ইঁচোড়ে পাকে, কতকগুলি কেবল ইঁচোড়ই থাকে, কখন পাকে না। কতকগুলি পাকিলে পাকিতে পারে, কিন্তু পাকিতে পায় না, পৃথিবীর রাক্ষস রাক্ষসীরা ইঁচোড়েই পাড়িয়া দাল্‌না রাঁধিয়া খাইয়া ফেলে। যদি পাকিল ত বড় শৃগালের দৌরাত্ম্য। যদি গাছ ঘেরা থাকে ত ভালই। যদি কাঁটাল উঁচু ডালে ফলিয়া থাকে, ভালই; নহিলে শৃগালেরা কাঁটাল কোনমতে উদরসাৎ করিবে। শৃগালেরা কেহ দেওয়ান, কেহ কারকুন, কেহ নাএব, কেহ গোমস্তা, কেহ মোছায়েব, কেহ কেবল আশীর্ব্বাদক। যদি এ সকলের হাত এড়াইয়া, পাকা কাঁটাল ঘরে গেল, তবে মাছি ভন্‌ভন্ করিতে আরম্ভ করিল। মাছিরা কাঁটাল চায় না, তাহারা কেবল একটু একটু রসের প্রত্যাশাপন্ন। এ মাছিটি কন্যাভারগ্রস্ত, উহাকে এক ফোঁটা রস দাও,—ওটির মাতৃদায়, একটু রস দাও। এটি একখানি পুস্তক লিখিয়াছে, একটু রস দাও,—সেটি পেটের দায়ে একখানি সম্বাদ-পত্র করিয়াছে, উহাকেও একটু রস দাও। এই মাছিটি কাঁটালের পিসীর ভাশুর-পুত্রের শ্যালীপুত্র—খাইতে পায় না, কিছু রস দাও;—সে মাছিটির টোলে পৌনে চোদ্দটি ছাত্র পড়ে, কিছু রস দাও। আবার এদিকে কাঁটাল ঘরে রাখাও ভাল না—পচিয়া দুর্গন্ধ হইয়া উঠে। আমার বিবেচনায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া, উত্তম নির্জ্জল দুগ্ধের ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া, কমলাকান্তের ন্যায় সুব্রাহ্মণকে ভোজন করানই ভাল।

এদেশের সিবিল সার্ব্বিসের সাহেবদিগকে আমি মনুষ্যজাতিমধ্যে আম্রফল মনে করি। এদেশে আম ছিল না, সাগরপার হইতে কোন মহাত্মা এই উপাদেয় ফল এদেশে আনিয়াছেন। আম্র দেখিতে রাঙ্গা রাঙ্গা, ঝাঁকা আলো করিয়া বসে। কাঁচায় বড় টক—পাকিলে সুমিষ্ট বটে, কিন্তু তবু হাড়ে টক যায় না। কতকগুলা আম এমন কদর্য্য যে, পাকিলেও টক যায় না। কিন্তু দেখিতে বড় বড় রাঙ্গা রাঙ্গা হয়, বিক্রেতা ফাঁকি দিয়া পঁচিশ টাকা শ বিক্রয় করিয়া যায়। কতকগুলি আম কাঁচামিটে আছে—পাকিলে পান্‌শে। কতকগুলো জাঁতে পাকা। সেগুলি কুটিয়া নুন মাখিয়া আমসী করাই ভাল।

সকলে আম্র খাইতে জানে না। সদ্য গাছ হইতে পাড়িয়া এ ফল খাইতে নাই। ইহা কিয়ৎক্ষণ সেলাম-জলে ফেলিয়া ঠাণ্ডা করিও—যদি জোটে, তবে সে জলে একটু খোসামোদ-বরফ দিও—বড় শীতল হইবে। তারপরে ছুরি চালাইয়া স্বচ্ছন্দে খাইতে পার।

স্ত্রীলোকদিগকে লৌকিক কথায় কলাগাছের সহিত তুলনা করিয়া থাকে। কিন্তু সে গেছো কথা। কদলীফলের সঙ্গে ভুবনমোহিনী জাতির আমি সৌসাদৃশ্য দেখি না। স্ত্রীলোক কি কাঁদি কাঁদি ফলে? যাহার ভাগ্যে ফলে ফলুক—কমলাকান্তের ভাগ্যে ত নয়। কদলীর সঙ্গে কামিনীগণের এই পর্য্যন্ত সাদৃশ্য আছে যে, উভয়েই বানরের প্রিয়। কামিনীগণের এ গুণ থাকিলেও কদলীর সঙ্গে তাঁহাদিগের তুলনা করিতে পারি না। পক্ষান্তরে কতকগুলি কটুভাষী আছেন, তাঁহারা ফলের মধ্যে মাকাল ফলকেই যুবতীগণের অনুরূপ বলেন! যে বলে, সে দুর্ম্মুখ—আমি ইঁহাদিগের ভৃত্য-স্বরূপ; আমি তাহা বলিব না।

আমি বলি, রমণীমণ্ডলী এ সংসারের নারিকেল। নারিকেলও কাঁদি কাঁদি ফলে বটে, কিন্তু (ব্যবসায়ী নহিলে) কেহ কখন কাঁদি কাঁদি পাড়ে না। কেহ কখন দ্বাদশীর পারণার অনুরোধে, অথবা বৈশাখ মাসে ব্রাহ্মণসেবার জন্য একটি আধটি পাড়ে। কাঁদি কাঁদি পাড়িয়া খাওয়ার অপরাধে যদি কেহ অপরাধী থাকে, তবে কুলীন ব্রাহ্মণেরা। কমলাকান্ত কখন সে অপরাধে অপরাধী নহে।

বৃক্ষের নারিকেলের ন্যায় সংসারের নারিকেলের বয়োভেদে নানাবস্থা। কচি বেলা উভয়েই বড় স্নিগ্ধকর—নারিকেলের জলে উদর স্নিগ্ধ হয়—কিশোরীর অকৃত্রিম বিলাস-লক্ষণ-শূন্য প্রণয়ে হৃদয় স্নিগ্ধ হয়। কিন্তু দুই জাতীয়,—ফলজাতীয় এবং মনুষ্যজাতীয়, নারিকেলের ডাবই ভাল। তখন দেখিতে কেমন উজ্জ্বল শ্যাম—কেমন জ্যোতির্ম্ময়, রৌদ্র তাহা হইতে প্রতিহত হইতেছে—যেন সে নবীন শ্যাম শোভায় জগতের রৌদ্র শীতল হইতেছে। গাছের উপর কাঁদি কাঁদি নারিকেল আর গবাক্ষ-পথে কাঁদি কাঁদি যুবতী, আমার চক্ষে একই দেখায়—উভয়ই চতুর্দ্দিক্ আলো করিয়া থাকে। কিন্তু দেখ—দেখিয়া ভুলিও না—এই চৈত্র মাসের রৌদ্র, গাছ হইতে পাড়িয়া ডাব কাটিও না—বড় তপ্ত। সংসারশিক্ষাশূন্যা কামিনীকে সহসা হৃদয়ে গ্রহণ করিও না—তোমার কলিজা পুড়িয়া যাইবে। আম্রের ন্যায়, ডাবকেও বরফ-জলে রাখিয়া শীতল করিও—বরফ না যোটে, পুকুরের পাঁকে পুঁতিয়া রাখিয়া ঠাণ্ডা করিও—মিষ্ট কথায় না করিতে পার, কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর আজ্ঞা, কড়া কথায় করিও।

নারিকেলের চারিটি সামগ্রী—জল, শস্য, মালা আর ছোব্‌ড়া। নারিকেলের জলের সঙ্গে স্ত্রীলোকের স্নেহের আমি সাদৃশ্য দেখি। উভয়ই বড় স্নিগ্ধকর; যখন তুমি সংসারের রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে, গৃহের ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম কামনা কর, তখন এই শীতল জল পান করিও—সকল যন্ত্রণা ভুলিবে। তোমার দারিদ্র্য-চৈত্রে বা বন্ধুবিয়োগ-বৈশাখে—তোমার যৌবন মধ্যাহ্নে বা রোগতপ্ত-বৈকালে, আর কিসে তোমার হৃদয় শীতল হইবে? মাতার আদর, স্ত্রীর প্রেম, কন্যার ভক্তি, ইহার অপেক্ষা জীবনের সন্তাপে আর কি সুখের আছে? গ্রীষ্মের তাপে ডাবের জলের মত আর কি আছে?

তবে, ঝুনো হইলে জল একটু ঝাল হইয়া যায়। রামার মা ঝুনো হইলে পর, রামার বাপ ঝালের চোটে বাড়ী ছাড়িয়াছিল। এইজন্য নারিকেলের মধ্যে ডাবেরই আদর।

নারিকেলের শস্য, স্ত্রীলোকের বুদ্ধি। করকচি বেলায় বড় থাকে না; ডাবের অবস্থায় বড় সুমিষ্ট, বড় কোমল; ঝুনোর বেলায় বড় কঠিন, দন্তস্ফুট করে কার সাধ্য? তখন ইহাকে গৃহিণীপনা বলে। গৃহিণীপনা রসাল বটে, কিন্তু দাঁত বসে না। একদিকে কন্যা বসিয়া আছেন, মায়ের অলঙ্কারের বাক্স হইতে কিয়দংশ সংগ্রহ করিবেন,—কিন্তু ঝুনোর শস্য এমনি কঠিন যে, মেয়ের দাঁত বসিল না—ঝুনো দয়া করিয়া একটি মাকড়ি বাহির করিয়া দিল। হয় ত পুত্র বসিয়া আছেন, মায়ের নগদ পুঁজির উপর দাঁত বসাইবেন,—ঝুনো দয়া করিয়া নগদ সাত সিকা বাহির করিয়া দিল। স্বামী প্রাচীন বয়সে একটি ব্যবসায় ফাঁদিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু শেষ বয়সে হাত খালি—টাকা নহিলে ব্যবসায় হয় না—ঝুনোর পুঁজির উপর দৃষ্টি। দুই চারিটি প্রবৃত্তিরূপ দন্ত ফুটাইয়া দিলেন—বুড়া বয়সের দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল। শেষ যদি দাঁত বসিল, নারিকেল জীর্ণ করিবার সাধ্য কি? যতদিন না টাকা ফিরাইয়া দেন, ততদিন অজীর্ণ রোগে রাত্রে নিদ্রা হয় না।

তারপরে মালা—এটি স্ত্রীলোকের বিদ্যা—কখন আধখানা বৈ পূরা দেখিতে পাইলাম না। নারিকেলের মালা বড় কাজে লাগে না; স্ত্রীলোকের বিদ্যাও বড় নয়। মেরি সমরবিল বিজ্ঞান লিখিয়াছেন, জেন্ অষ্টেন্ বা জর্জ্জ এলিয়ট উপন্যাস লিখিয়াছেন—মন্দ হয় নাই, কিন্তু দুই মালার মাপে।

ছোব্‌ড়া স্ত্রীলোকের রূপ। ছোব্‌ড়া যেমন নারিকেলের বাহ্যিক অংশ, রূপও স্ত্রীলোকের বাহ্যিক অংশ। দুই বড় অসার;—পরিত্যাগ করাই ভাল। তবে ছোব্‌ড়ায় একটি কাজ হয়—উত্তম রজ্জু প্রস্তুত হয়, তাহাতে জাহাজ বাঁধা যায়।

স্ত্রীলোকের রূপের কাছিতেও অনেক জাহাজ বাঁধা গিযাছে। তোমরা যেমন নারিকেলের কাছিতে জগন্নাথের রথ টান, স্ত্রীলোকেরা রূপের কাছিতে কত ভারি ভারি মনোরথ টানে। যখন রথ-টানা বারণের আইন হইবে,—তখন তাহাতে এ রথ-টানা নিষেধের জন্য যেন একটা ধারা থাকে—তাহা হইলে অনেক নরহত্যা নিবারণ হইবে। আমি জানি না, নারিকেলের রজ্জু গলায বাঁধিযা কেহ কখন প্রাণত্যাগ করিযাছে কি না, কিন্তু রমণীর রূপরজ্জু গলায বাঁধিয়া কত লোক প্রাণত্যাগ করিযাছে, কে তাহার গণনা করিবে?

বৃক্ষের নারিকেল এবং সংসারের নারিকেলের সঙ্গে আমার বিবাদ এই যে, আমি হতভাগা, দুইযের এককেও আহরণ করিতে পারিলাম না। অন্য ফল আকর্ষী দিযা পাড়া যায, কিন্তু নারিকেল গাছে না উঠিলে পাড়া যায না। গাছে উঠিতে গেলেও হয নিজের পাযে দড়ি বাঁধিতে হইবে, না হয ডোমের খোসামোদ করিতে হইবে।*

ডোমের খোসামোদ করিতেও রাজি আছি। কিন্তু আমার ভাগ্যদোষে কপালে নারিকেল যোটে না। আমি যেমন মানুষ, তেমনি গাছে তেমনি রূপগুণের আকর্ষী দিযা নারিকেল পাড়িতে পারি। পারি, কিন্তু ভয—পাছে নারিকেল ঘাড়ে পড়ে। এমন অনেক শ্যামী, বামী, রামী, কামিনী আছে যে, কমলাকান্তকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু পরের মেযে ঘাড়ে করিযা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে এ দীন অসমর্থ। অতএব এ যাত্রা, কমলাকান্ত ভক্তিভাবে, নারিকেল ফলটি বিশ্বেশ্বরকে দিলেন। তিনি একে শ্মশানবাসী, তাহাতে আবার বিষপান করিয়াছেন—ছাই ডাব নারিকেলে তাঁহার কি করিবে?

এ দেশে এক জাতি লোক সম্প্রতি দেখা দিযাছেন তাঁহারা দেশহিতৈষী বলিয়া খ্যাত। তাঁহাদের আমি শিমুল ফুল ভাবি। যখন ফুল ফুটে, তখন দেখিতে শুনিতে বড় শোভা—বড় বড়, রাঙ্গা রাঙ্গা, গাছ আলো করিযা থাকে। কিন্তু আমার চক্ষে নেড়া গাছে অত রাঙ্গা ভাল দেখায না। একটু একটু পাতা ঢাকা থাকিলে ভাল দেখাইত; পাতার মধ্য হইতে যে অল্প অল্প রাঙ্গা দেখা যায, সেই সুন্দর। ফুলে গন্ধ মাত্র নাই—কোমলতা মাত্র নাই, কিন্তু তবু ফুল বড় বড, রাঙ্গা রাঙ্গা। যদি ফুল ঘুচিয়া, ফল ধরিল, তখন মনে করিলাম, এইবার কিছু লাভ হইবে। কিন্তু তাহা বড় ঘটে না। কালক্রমে চৈত্র মাস আসিলে রৌদ্রের তাপে, অন্তর্লঘু ফল, ফট করিয়া

* কমলাকান্ত বোধ হয়, পুরোহিতকে ডোম বলিতেছে; কেননা, পুরোহিতই বিবাহ দেয়। উঃ কি পাষণ্ড!—ভীষ্মদেব।

ফাটিয়া উঠে; তাহার ভিতর হইতে খানিক তুলা বাহির হইয়া বঙ্গদেশময় ছড়াইয়া পড়ে।

অধ্যাপক ব্রাহ্মণগণ সংসারের ধুতূরা ফল। বড় বড় লম্বা লম্বা সমাসে, বড় বড় বচনে, তাঁহাদিগকে অতি সুদীর্ঘ কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হয়, ফলের বেলা কণ্টকময় ধুতূরা। আমি অনেক দিন হইতে মানস করিয়াছি যে, কুক্কুটমাংস ভোজন করিয়া হিন্দুজন্ম পবিত্র করিব—কিন্তু এই অধম ধুতূরাগুলার কাঁটার জ্বালায় পারিলাম না। গুণের মধ্যে এই যে, এই ধুতূরায মাদকের মদকতা বৃদ্ধি করে। যে গাঁজাখোরের গাঁজায় নেশা হয় না, তাঁহার গাঁজার সঙ্গে দুইটা ধুতূরার বীচি সাজিয়া দেয়—যে সিদ্ধিখোরের সিদ্ধিতে নেশা না হয়, তাহার সিদ্ধির সঙ্গে দুইটা ধুতূরার বীচি বাটিয়া দেয়। বোধ হয়, এই হিসাবেই বঙ্গীয় লেখকেরা আপনাপন প্রবন্ধমধ্যে অধ্যাপকদিগের নিকট দুই চারিটা বচন লইয়া গাঁথিয়া দেন। প্রবন্ধ-গাঁজার মধ্যে সেই বচন-ধুতূরার বীচিতে পাঠকের নেশা জমাইয়া তুলে। এই নেশায় বঙ্গদেশ আজি কালি মাতিয়া উঠিয়াছে।

আমাদের দেশের লেখকদিগকে আমি তেঁতুল বলিয়া গণি। নিজের সম্পত্তি খোলা আর সিটে, কিন্তু দুগ্ধকেও স্পর্শ করিলে দধি করিয়া তোলেন। গুণের মধ্যে কেবল অম্লগুণ—তাও নিকৃষ্ট অম্ল। তবে এক গুণ মানি—ইহারা সাক্ষাৎ কাষ্ঠাবতার। তেঁতুল কাঠ নীরস বটে, কিন্তু সমালোচনার আগুনে পোড়েন ভাল। সত্য কথা বলিতে কি, তেঁতুলের মত কুসামগ্রী আমি সংসারে দেখিতে পাই না। যেই কিয়ৎপরিমাণে খায়, তাহারই অজীর্ণ হয়, সেই অম্ল উদ্গার করে। যেই অধিক পরিমাণে খায়, সেই অম্ল-পিত্তরোগে চিররুগ্ন। যাঁহারা সাহেব হইয়াছেন, টেবিলে বসিয়া, গ্যাসের আলোতে, বা আর্গাগু জ্বালিয়া, ফয়জু খানসামার হাতের পাক, কাঁটা চামচে ধরিয়া খাইতে শিখিয়াছেন—তাঁহারা এক দায় এড়াইয়াছেন—তেঁতুলের অম্লের বড় ধার ধারিতে হয় না—আগা গোড়া তেঁতুলের মাছ দিয়া ভাত মারিতে হয় না। কিন্তু যাহাদিগকে চালা-ঘরে বসিয়া, মুঙ্গেরে পাতর কোলে করিয়া, পদী পিসীর রান্না খাইতে হয়, তাহাদের কি যন্ত্রণা! পদী পিসী কুলীনের মেয়ে, প্রাতঃস্নান করে, নামাবলী গায়ে দেয়, হাতে তুলসীর মালা, কিন্তু রাঁধিবার বেলা কলাইয়ের দাল, আর তেঁতুলের মাছ ছাড়া আর কিছুই রাঁধিতে জানেন না। ফয়জু জাতিতে নেড়ে, কিন্তু রাঁধে অমৃত।

আর একটি মনুষ্যফলের কথা বলা হইলেই অস্ত ক্ষান্ত হই। দেশী হাকিমেরা কোন্ ফল বল দেখি? যিনি রাগ করেন করুন, আমি স্পষ্ট কথা বলিব, ইঁহারা পৃথিবীর কুষ্মাণ্ড। যদি চালে তুলিয়া দিলে, তবেই ইঁহারা উঁচুতে ফলিলেন—নহিলে মাটিতে

গড়াগড়ি যান। যেখানে ইচ্ছা, সেখানে তুলিযা দাও, একটু ঝড বাতাসেই লতা ছিঁডিয়া ভুমে গড়াগড়ি। অনেকগুলি রূপেও কুষ্মাণ্ড, গুণেও কুষ্মাণ্ড।—তবে কুষ্মাণ্ড এখন দুই প্রকার হইতেছে—দেশী কুমডা ও বিলাতী কুমড়া। বিলাতী কুমড়া বলিলে এমত বুঝায না যে, এই কুমড়াগুলি বিলাত হইতে আসিযাছে। যেমন দেশী মুচির তৈযারি জুতাকে ইংরেজি জুতা বলে, ইঁহারাও সেইরূপ বিলাতী। বিলাতী কুমডার যে গৌরব অধিক, ইহা বলা বাহুল্য। সংসারোদ্যানে আরও অনেক ফল ফলে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অকর্ম্মণ্য, কদর্য্য, টক—

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

তৃতীয় সংখ্যা

ইউটিলিটি* বা উদর-দর্শন

বেন্থাম হিতবাদ দর্শনের সৃষ্টি করিয়া ইওরোপে অক্ষয কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আমি এই হিতবাদমতে অমত করি না; বরং আমি ইহার অনুমোদক, তবে আপনারা জানেন কি না, বলিতে পারি না, আমি একজন সুযোগ্য দার্শনিক। আমি এই হিতবাদ দর্শন অবলম্বন করিযা, কিছু ভাঙ্গিয়া, কিছু গড়িযা, একটি নূতন দর্শনশাস্ত্র প্রণযন করিয়াছি। প্রকৃত পক্ষে, তাহা বাঙ্গালায প্রচলিত হিতবাদ দর্শনের নূতন ব্যাখ্যা মাত্র। তাহার স্থূল মর্ম্ম আমি সংক্ষেপতঃ লিপিবদ্ধ করিতেছি। প্রাচীন প্রথানুসারে দর্শনটি সূত্রাকারে লিখিত হইয়াছে। এবং আমি স্বযংই সূত্রের ভাষ্য করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে লিখিযাছি। বাঙ্গালাতেই সূত্রগুলি লিখিত হইযাছে। আমি যে অসংস্কৃতজ্ঞ, এমত কেহ মনে করিবেন না। তবে সংস্কৃতে সূত্রগুলি কযজন

* "ইউটিলিটি" শব্দের অর্থ কি? ইহার কি বাঙ্গালা নাই? আমি নিজে ইংরেজি জানি না—কমলাকান্তও কিছু বলিয়া দেয় নাই—অতএব অগত্যা আমার পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। আমার পুত্র ডেক্‌সনারী দেখিয়া এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছে—"ইউ" শব্দে তুমি বা তোমরা, "টিল" শব্দে চাষ করা, "ইট" শব্দে খাওয়া, "ই" অর্থে কি, তাহা সে বলিতে পারিল না, কিন্তু বোধ করি কমলাকান্ত, "ইউ-টিল-ইট-ই" পদে ইহাই অভিপ্রেত করিয়াছেন যে, "তোমরা চাষ করিয়াই খাও।" কি পাষণ্ড! সকলকেই চাষা বলিল! ঈদৃশ দুর্ব্বৃত্ত দশানন লম্বোদর গজাননের রচনা পাঠ করাতেও পাপ আছে। বোধ হয়, আমার পুত্রটি ইংরেজি লেখাপড়ায় ভাল হইয়াছে, নচেৎ এরূপ দুরূহ শব্দের সদর্থ করিতে পারিত না।—শ্রীভীষ্মদেব খোশনবীস।

বুঝিতে পারিবে? অতএব, সাধারণ পাঠকের প্রতি অনুকূল হইযা বাঙ্গালাতেই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছি। সে সূত্রগ্রন্থের সারাংশ এই ;—

১। জীবশরীরস্থ বৃহৎ গহ্বরবিশেষকে উদর বলে।

ভাষ্য।

"বৃহৎ"—অর্থাৎ নাসিকা কর্ণাদি ক্ষুদ্র গহ্বরকে উদর বলা যায না। বলিলে বিশেষ প্রত্যবায আছে।

"জীবশরীরস্থ বৃহৎ গহ্বর"—জীবশরীরস্থ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, নহিলে পর্ব্বতগুহা প্রভৃতিকে উদর বলিয়া পরিচয দিযা কেহ তাহার পূর্ত্তির প্রত্যাশা করিতে পারেন।

"গহ্বর"—যদিও জীবশরীরস্থ গহ্ববিশেষই উদব শব্দে বাচ্য, তথাপি অবস্থা-বিশেষ অঞ্জলি প্রভৃতিও উদরমধ্যে গণ্য। কোন স্থানে উদর পূরাইতে হয়, কোন স্থানে অঞ্জলি পূরাইতে হয।

২। উদরের ত্রিবিধ পূর্ত্তিই পরম পুরুষার্থ।

ভাষ্য।

সাংখ্যেরও এই মত। আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক এবং আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ উদর-পূর্ত্তি।

"আধিভৌতিক"—অন্ন ব্যঞ্জন সন্দেশ মিষ্টান্ন প্রভৃতি ভৌতিক সামগ্রীর দ্বারা উদরের যে পূর্ত্তি হয, তাহাই আধিভৌতিক পূর্ত্তি।

"আধ্যাত্মিক"—যাঁহারা বডলোকের বাক্যে লুব্ধ হইযা, কালযাপন করেন, তাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক উদর পূর্ত্তি হয।

"আধিদৈবিক"—দৈবানুকম্পায প্লীহা যকৃৎ প্রভৃতি দ্বারা যাঁহাদেব উদর পূরিযা উঠে, তাঁহাদিগেব আধিদৈবিক উদর-পূর্ত্তি।

৩। এতন্মধ্যে আধিভৌতিক পূর্ত্তিই বিহিত।

ভাষ্য।

"বিহিত"—বিহিত শব্দের দ্বারা অন্যান্য পূর্ত্তির প্রতিষেধ হইল কি না, ভবিষ্যৎ ভাষ্যকারেরা মীমাংসা করিবেন।

এক্ষণে সিদ্ধ হইল, উদরনামক মহা-গহ্বরে লুচি সন্দেশ প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থের প্রবেশই পুরুষার্থ। অতএব এ গর্ত্তের মধ্যে কি প্রকার ভূত প্রবেশ করান যাইতে পারে, তাহা নির্ব্বাচন করা যাইতেছে।

৪। বিদ্যা বুদ্ধি পরিশ্রম উপাসনা বল এবং প্রতারণা, এই ষড়্‌বিধ পুরুষার্থের উপায়, পূর্ব্বপণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ভাষ্য।

১। "বিদ্যা"—বিদ্যা কি, তাহা অবধারণ করা কঠিন। কেহ কেহ বলেন, লিখিতে ও পড়িতে শিখাকে বিদ্যা বলে। কেহ কেহ বলেন, বিদ্যার জন্য বিশেষ লিখিতে বা পড়িতে শিখার প্রয়োজন নাই, গ্রন্থ লিখিতে, সম্বাদ পত্রাদিতে লিখিতে জানিলেই হইল। কেহ কেহ তাহাতে আপত্তি করেন যে, যে লিখিতে জানে না, সে পত্রাদিতে লিখিবে কি প্রকারে? আমার বিবেচনায় এরূপ তর্ক নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কুম্ভীরশাবক ডিম্ব ভেদ করিবামাত্র জলে গিয়া সাঁতার দিয়া থাকে, শিখিতে হয় না। সেইরূপ বিদ্যা বাঙ্গালির স্বতঃসিদ্ধ, তজ্জন্য লেখাপড়া শিখিবার প্রয়োজন নাই।

২। "বুদ্ধি"—যে আশ্চর্য্য শক্তিদ্বারা তুলাকে লৌহ, লৌহকে তুলা বিবেচনা হয়, সেই শক্তিকেই বুদ্ধি বলে। কৃপণের সঞ্চিত ধনরাশির ন্যায় ইহা আমরা স্বয়ং সর্ব্বদা দেখিতে পাই, কিন্তু পরে কখন দেখিতে পায় না। পৃথিবীর সকল সামগ্রীর অপেক্ষা বোধ হয়, জগতে ইহারই আধিক্য। কেন না, কখন কেহ বলিল না যে, ইহা আমি অল্প পরিমাণে পাইয়াছি।

৩। "পরিশ্রম"—উপযুক্ত সময়ে ঈষদুষ্ণ অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন, তৎপরে নিদ্রা, বায়ু সেবন, তামাকুর ধূমপান, গৃহিণীর সহিত সম্ভাষণ ইত্যাদি গুরুতর কার্য্য-সম্পাদনের নাম পরিশ্রম।

৪। "উপাসনা"—কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলে, হয় তাহার গুণানুবাদ, নয় দোষকীর্ত্তন করিতে হয়। কোন ক্ষমতাশালী প্রধান ব্যক্তি সম্বন্ধে এরূপ কথা হইলে, যদি তিনি প্রকৃত দোষযুক্ত ব্যক্তি হয়েন, তবে তাঁহার দোষকীর্ত্তন করাকে নিন্দা বলে। আর তিনি যদি দোষযুক্ত না হয়েন, তবে তাঁহার দোষ-কীর্ত্তনকে স্পষ্টবক্তৃত্ব বা রসিকতা বলে। গুণ পক্ষে, তিনি যদি গুণহীন হয়েন, তবে তাঁহার গুণকীর্ত্তনকে ন্যায়নিষ্ঠতা বলে। আর যদি তিনি যথার্থ গুণবান্ হয়েন, তবে তাঁহার গুণকীর্ত্তনকে উপাসনা বলে।

৫। "বল"—দীর্ঘচ্ছন্দ বাক্য—মুখ চক্ষুর আরক্তভাব—ঘোরতর ডাক হাঁক,—মুখ হইতে অনর্গল হিন্দী, ইংরাজী এবং নিষ্ঠীবনের বৃষ্টি,—দূর হইতে ভঙ্গীদ্বারা কিল, চড়, ঘুষা এবং লাথি প্রদর্শন ও সার্দ্ধ তিপ্পান্ন প্রকার অন্যান্য অঙ্গভঙ্গী—এবং বিপক্ষের কোনপ্রকার উদ্যম দেখিলে অকালে পলায়ন ইত্যাদিকে বল বলে।

বল ষড়্‌বিধ যথা :—

মৌখিক—অভিসম্পাত, গালি, নিন্দা প্রভৃতি।

হাস্ত—কিল চড় প্রদর্শন প্রভৃতি।

পাদ—পলায়নাদি।

চাক্ষুষ—রোদনাদি। যথা, চাণক্যপণ্ডিত,—"বালানাং রোদনং বলং" ইত্যাদি।

ত্বাচ—প্রহারসহিষ্ণুতা ইত্যাদি।

মানস—দ্বেষ, ঈর্ষা, হিংসা প্রভৃতি।

৬। প্রতারণা—

নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের পৃথিবীমধ্যে প্রতারক বলিয়া জানিও।

এক, পণ্যাজীব। প্রমাণ—দোকানদার জিনিষ বেচিয়া আবার মূল্য চাহিতে থাকে। মূল্যদাতা মাত্রেরই মত যে, তিনি ক্রয়কালীন প্রতারিত হইয়াছেন।

দ্বিতীয়, চিকিৎসক। প্রমাণ—রোগী রোগ হইতে মুক্ত হইলে পরে যদি চিকিৎসক বেতন চায়, তবে রোগী প্রায় সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে, আমি নিজে আরাম হইয়াছি ; এ বেটা অনর্থক ফাঁকি দিয়া টাকা লইতেছে।

তৃতীয়, ধর্ম্মোপদেষ্টা এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তি। ইঁহারা চিরপ্রথিত প্রতারক, ইঁহাদিগের নাম "ভণ্ড"। ইঁহারা যে প্রতারক, তাহার বিশেষ প্রমাণ এই যে, ইঁহারা অর্থাদির কামনা করেন না। ইত্যাদি।

৫। এই ষড়্‌বিধ উপায়ের দ্বারা উদরপূর্ত্তি বা পুরুষার্থ অসাধ্য।

ভাষ্য।

এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপণ্ডিতদিগের মত খণ্ডন করা যাইতেছে। বিদ্যাদি ষড়্‌বিধ উপায়ের দ্বারা যে উদরপূর্ত্তি হইতে পারে না, ক্রমে তাহার উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

"বিদ্যা"—বিদ্যাতে যদি উদরপূর্ত্তি হইত, তবে বাঙ্গালা সম্বাদপত্রের অন্নাভাব কেন?

"বুদ্ধি"—বুদ্ধিতে যদি উদরপূর্ত্তি হইত, তবে গর্দ্দভ মোট বহিবে কেন?

"পরিশ্রম"—পরিশ্রমে যদি হইত, তবে বাঙ্গালি বাবুরা কেরাণী কেন?

"উপাসনা"—উপাসনায় যদি হইত, তবে সাহেবগণ কমলাকান্তকে অনুগ্রহ করেন না কেন? আমি ত মন্দ পে-বিল লিখি নাই।

"বল"—বলে যদি হইত, তবে আমরা পড়িয়া মার খাই কেন?

"প্রতারণা"—প্রতারণায় যদি হইত, তবে মদের দোকান কখন কখন ফেল হয় কেন।

৬। উদরপূর্ত্তি বা পুরুষার্থ কেবল হিতসাধনের দ্বারা সাধ্য।

ভাষ্য।

উদাহরণ। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা লোকের কানে মন্ত্র দিয়া তাহাদের হিতসাধন করিয়া থাকেন। ইউরোপীয় জাতিগণ অনেক বন্য জাতির হিতসাধন করিয়াছেন, এবং রুসেরা এক্ষণে মধ্য-আসিযার হিতসাধনে নিযুক্ত আছেন। বিচারকগণ বিচার করিয়া দেশের হিতসাধন করিতেছেন। অনেকে সুবিক্রেয এবং অবিক্রেয় পুস্তক ও পত্রাদি প্রণযন দ্বারা দেশের হিতসাধন করিতেছেন। এ সকলের প্রচুর পরিমাণে উদরপূর্ত্তি অর্থাৎ পুরুষার্থলাভ হইতেছে।

৭। অতএব সকলে দেশের হিতসাধন কর।

ভাষ্য।

এই শেষ সূত্রের দ্বারা হিতবাদ দর্শন এবং উদর দর্শনের একতা প্রতিপাদিত হইল। সুতরাং এই স্থলে কমলাকান্তের সূত্র-গ্রন্থের সমাপ্তি হইল। ভরসা করি, ইহা ভারতবর্ষের সপ্তম দর্শনশাস্ত্র বলিয়া আদৃত হইবে।

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

চতুর্থ সংখ্যা

পতঙ্গ

বাবুর বৈঠকখানায় সেজ জ্বলিতেছে—পাশে আমি, মোসায়েবি ধরণে বসিয়া আছি। বাবু দলাদলির গল্প করিতেছেন,—আমি আফিং চড়াইয়া ঝিমাইতেছি। দলাদলিতে চটিয়া মাত্রা বেশী করিয়া ফেলিয়াছি। বিধিলিপি! এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অনাদি ক্রিয়াপরম্পরায় একটি ফল এই যে, উনবিংশ শতাব্দীতে কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ করিয়া অদ্য রাত্রে নশীরামবাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া মাত্রা বেশী করিয়া ফেলিবেন। সুতরাং আমার সাধ্য কি যে, তাহা অন্যথা করি।

ঝিমাইতে ঝিমাইতে দেখিলাম যে, একটা পতঙ্গ আসিয়া ফানুসের চারিপাশে শব্দ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। "চোঁ-ও-ও-ও" "বোঁ-ও-ও" করিয়া শব্দ করিতেছে। আফিমের ঝোঁকে মনে করিলাম, পতঙ্গের ভাষা কি বুঝিতে পারি না? কিছুক্ষণ

কান পাতিয়া শুনিলাম—কিছু বুঝিতে পারিলাম না। মনে মনে পতঙ্গকে বলিলাম, "তুমি কি ও চোঁ বোঁ করিয়া বলিতেছ, আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।" তখন হঠাৎ আফিম প্রসাদাৎ দিব্য কর্ণ প্রাপ্ত হইলাম—শুনিলাম, পতঙ্গ বলিল, "আমি আলোর সঙ্গে কথা কহিতেছি—তুমি চুপ কর।" আমি তখন চুপ করিয়া পতঙ্গের কথা শুনিতে লাগিলাম। পতঙ্গ বলিতেছে—

দেখ, আলো মহাশয়, তুমি সে কালে ভাল ছিলে—পিতলের পিলসুজের উপর মেটে প্রদীপে শোভা পাইতে—আমরা স্বচ্ছন্দে পুড়িয়া মরিতাম। এখন আবার সেজের ভিতর ঢুকিয়াছ—আমরা চারিদিকে ঘুরে বেড়াই—প্রবেশ করিবার পথ পাই না, পুড়িয়া মরিতে পাই না।

দেখ, পুড়িয়া মরিতে আমাদের রাইট আছে—আমাদের চিরকালের হক্। আমরা পতঙ্গজাতি, পূর্ব্বাপর আলোতে পুড়িয়া মরিয়া আসিতেছি—কখন কোন আলো আমাদের বারণ করে নাই। তেলের আলো, বাতির আলো, কাঠের আলো, কোন আলো কখন বারণ করে নাই। তুমি কাচ মুড়ি দিয়া আছ কেন, প্রভু? আমরা গরিব পতঙ্গ—আমাদের উপর সহমরণ নিষেধের আইন জারি কেন? আমরা কি হিন্দুর মেয়ে যে, পুড়িয়া মরিতে পাব না?

দেখ, হিন্দুর মেয়ের সঙ্গে আমাদের অনেক প্রভেদ। হিন্দুর মেয়েরা আশা ভরসা থাকিতে কখন পুড়িয়া মরিতে চাহে না—আগে বিধবা হয়, তবে পুড়িয়া মরিতে বসে। আমরাই কেবল সকল সময়ে আত্মবিসর্জ্জনে ইচ্ছুক। আমাদের সঙ্গে স্ত্রীজাতির তুলনা?

আমাদিগের ন্যায়, স্ত্রীজাতিও রূপের শিখা জ্বলিতে দেখিলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে বটে, ফলও এক,—আমরাও পুড়িয়া মরি, তাহারাও পুড়িয়া মরে। কিন্তু দেখ, সেই দাহতেই তাদের সুখ,—আমাদের কি সুখ? আমরা কেবল পুড়িবার জন্য পুড়ি, মরিবার জন্য মরি। স্ত্রীজাতিতে পারে? তবে আমাদের সঙ্গে তাহাদের তুলনা কেন?

শুন, যদি জ্বলন্ত রূপে শরীর না ঢালিলাম, তবে এ শরীর কেন? অন্য জীবে কি ভাবে, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু আমরা পতঙ্গজাতি, আমরা ভাবিয়া পাই না, কেন এ শরীর?—লইয়া কি করিব?—নিত্য নিত্য কুসুমের মধু চুম্বন করি, নিত্য নিত্য বিশ্ব-প্রফুল্লকর সূর্য্যকিরণে বিচরণ করি—তাহাতে কি সুখ? ফুলের সেই একই গন্ধ, মধুর সেই একই মিষ্টতা, সূর্য্যের সেই এক প্রকারই প্রতিভা। এমন অসার, পুরাতন, বৈচিত্র্যশূন্য জগতে থাকিতে আছে? কাচের বাহিরে আইস, জ্বলন্ত রূপশিখায় গা ঢালিব।

দেখ, আমার ভিক্ষাটি বড় ছোট—আমার প্রাণ তোমাকে দিয়া যাইব, লইবে না? দিব বৈ ত গ্রহণ করিব না। তবে ক্ষতি কি? তুমি রূপ, পোড়াইতে জন্মিয়াছ, আমি পতঙ্গ, পুড়িতে জন্মিয়াছি; আইস, যার যে কাজ, করিয়া যাই। তুমি হাসিতে থাক, আমি পুড়ি।

তুমি বিশ্বধ্বংসক্ষম—তোমাকে রোধিতে পারে, জগতে এমন কিছুই নাই—তুমি কাচের ভিতর লুকাইয়া আছ কেন? তুমি জগতের গতির কারণ—কার ভয়ে তুমি ডোমের ভিতর লুকাইয়াছ? কোন্ ডোমে এ ডোম গড়িযাছে? কোন্ ডোমে তোমাকে এ ডোমের ভিতর পুরিযাছে? তুমি যে বিশ্বব্যাপী, কাচ ভাঙ্গিয়া আমায় দেখা দিতে পার না?

তুমি কি? তা আমি জানি না—আমি জানি না—কেবল জানি যে, তুমি আমার বাসনার বস্তু—আমার জাগ্রতের ধ্যান—নিদ্রার স্বপ্ন—জীবনের আশা—মরণের আশ্রয়। তোমাকে কখন জানিতে পারিব না—জানিতে চাহিও না—যেদিন জানিব, সেইদিন আমার সুখ যাইবে। কাম্য বস্তুর স্বরূপ জানিলে কাহার সুখ থাকে?

তোমাকে কি পাইব না? কতদিন তুমি কাচের ভিতর থাকিবে? আমি কাচ ভাঙ্গিতে পারিব না। ভাল থাক—আমি ছাড়িব না—আবার আসিতেছি—বোঁ—ও—ও

পতঙ্গ উড়িয়া গেল।

নসীরামবাবু ডাকিল, "কমলাকান্ত!" আমার চমক হইল—চাহিয়া দেখিলাম—বুঝি বড় ঢুলিযা পড়িয়াছিলাম। কিন্তু চাহিয়া দেখিয়া নসীরামকে চিনিতে পারিলাম না—দেখিলাম, মনে হইল, একটা বৃহৎ পতঙ্গ বালিশ ঠেসান দিযা, তামাকু টানিতেছে। সে কথা কহিতে লাগিল—আমার বোধ হইতে লাগিল যে, সে চোঁ বোঁ করিযা কি বলিতেছে। এখন হইতে আমার বোধ হইতে লাগিল যে, মনুষ্য মাত্রেই পতঙ্গ। সকলেরই এক একটি বহ্নি আছে—সকলেই সেই বহ্নিতে পুড়িযা মরিতে চাহে, সকলেই মনে করে, সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে তাহার অধিকার আছে—কেহ মরে, কেহ কাচে বাধিযা ফিরিয়া আসে। জ্ঞান-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নি, রূপ-বহ্নি, ধর্ম্ম-বহ্নি, ইন্দ্রিয়-বহ্নি, সংসার বহ্নিময়। আমার সংসার কাচময। যে আলো দেখিয়া মোহিত হই—মোহিত হইয়া যাহাতে ঝাঁপ দিতে যাই—কই, তাহা ত পাই না—আবার ফিরিয়া বোঁ করিযা চলিয়া যাই—আবার আসিয়া ফিরিযা বেড়াই। কাচ না থাকিলে, সংসার এতদিন পুড়িয়া যাইত। যদি সকল ধর্ম্মবিৎ চৈতন্যদেবের

ন্যায় ধর্ম্ম মানস-প্রত্যক্ষে দেখিতে পাইত, তবে কয়জন বাঁচিত? অনেকে জ্ঞান-বহ্নির আবরণ-কাচে ঠেকিয়া রক্ষা পায়, সক্রেতিস্, গেলিলিও তাহাতে পুড়িয়া মরিল। রূপ-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নিতে নিত্য নিত্য সহস্র পতঙ্গ পুড়িয়া মরিতেছে,—আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি। এই বহ্নির দাহ যাহাতে বর্ণিত হয়, তাহাকে কাব্য বলি। মহাভারতকার মান-বহ্নি সৃজন করিয়া দুর্যোধন পতঙ্গকে পোড়াইলেন;—জগতে অতুল্য কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টি হইল। জ্ঞান-বহ্নিজাত দাহের গীত "Paradise Lost"। ধর্ম্ম-বহ্নির অদ্বিতীয় কবি, সেণ্ট পল। ভোগ-বহ্নির পতঙ্গ, "আণ্টনি, ক্লিওপেত্রা"। রূপ-বহ্নির "রোমিও ও জুলিয়েত," ঈর্ষ্যা-বহ্নির "ওথেলো"। গীতগোবিন্দ ও বিদ্যা-সুন্দরে ইন্দ্রিয়-বহ্নি জ্বলিতেছে। স্নেহ-বহ্নিতে সীতাপতঙ্গের দাহ জন্য রামায়ণের সৃষ্টি। বহ্নি কি, আমরা জানি না। রূপ, তেজ, তাপ, ক্রিয়া, গতি এ সকল কথার অর্থ নাই। এখানে দর্শন হারি মানে, বিজ্ঞান হারি মানে। ধর্ম্মপুস্তক হারি মানে, কাব্যগ্রন্থ হারি মানে। ঈশ্বর কি, ধর্ম্ম কি, জ্ঞান কি, স্নেহ কি? তাহা কি, কিছু জানি না। তবু সেই অলৌকিক, অপরিজ্ঞাত পদার্থ বেড়িয়া বেড়িয়া ফিরি। আমরা পতঙ্গ না ত কি?

দেখ ভাই, পতঙ্গের দল, ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোন ফল নাই। পার, আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া মর। না পার চল, "বোঁ" করিয়া চলিয়া যাই।

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

পঞ্চম সংখ্যা

আমার মন

আমার মন কোথায় গেল? কে লইল? কই, যেখানে আমার মন ছিল, সেখানে ত নাই। যেখানে রাখিয়াছিলাম, সেখানে নাই। কে চুরি করিল? কই, সাত পৃথিবী খুঁজিয়া ত আমার "মনচোর" কাহাকে পাইলাম না? তবে কে চুরি করিল?

একজন বন্ধু বলিলেন, দেখ, পাকশালা খুঁজিয়া দেখ, সেখানে তোমার মন পড়িয়া থাকিতে পারে। মানি, পাকের ঘরে আমার মন পড়িয়া থাকিত। যেখানে পোলাও, কাবাব, কোফ্তার সুগন্ধ, যেখানে ডেকচী-সমারূঢ়া অন্নপূর্ণার মৃদু মৃদু ফুটফুটবুটবুট-টকবকোধ্বনি, সেইখানে আমার মন পড়িয়া থাকিত। যেখানে ইলিস মৎস্য, সতৈল অভিষেকের পর ঝোলগঙ্গায় স্নান করিয়া, মৃন্ময়, কাংস্যময়, কাচময় বা রজতময় সিংহাসনে উপবেশন করেন, সেইখানেই আমার মন প্রণত হইয়া পড়িয়া

থাকে, ভক্তিরসে অভিভূত হইযা, সেই তীর্থস্থান আর ছাড়িতে চায় না। যেখানে ছাগ-নন্দন, দ্বিতীয় দধীচির ন্যায়, পরোপকারার্থ আপন অস্থি সমর্পণ করেন, যেখানে মাংসসংযুক্ত সেই অস্থিতে কোরমা-রূপ বজ্র নির্ম্মিত হইয়া, ক্ষুধারূপ বৃত্রাসুর বধের জন্য প্রস্তুত থাকে, আমার মন সেইখানেই, ইন্দ্রত্বলাভের জন্য বসিযা থাকে। যেখানে, পাচকরূপী বিষ্ণুকর্ত্তৃক, লুচিরূপ সুদর্শন চক্র পরিত্যক্ত হয়, আমার মন সেইখানেই গিযা বিষ্ণুভক্ত হইয়া দাঁড়ায। অথবা যে আকাশে লুচি-চন্দ্রের উদয হয়, সেইখানেই আমার মন-রাহু গিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে চায়। অন্যে যাহাকে বলে বলুক, আমি লুচিকেই অখণ্ড মণ্ডলাকার বলিয়া থাকি। যেখানে সন্দেশরূপ শালগ্রামের বিরাজ, আমার মন সেইখানেই পূজক। হালদারদিগের বাড়ীর রামমণি দেখিতে অতি কুৎসিতা, এবং তাহার বয়ঃক্রম ষাট্‌ বৎসর, কিন্তু রাঁধে ভাল এবং পরিবেশণে মুক্তহস্তা বলিয়া, আমার মন তাহার সঙ্গে প্রসক্তি করিতে চাহিযাছিল। কেবল রামমণির সজ্ঞানে গঙ্গালাভ হওয়ায় এটি ঘটে নাই।

সুহৃদের প্রবর্ত্তনায়, পাকশালায় মনের সন্ধান করিলাম, সেখানে পাইলাম না। পলান্ন, কোফ্‌তা প্রভৃতি অধিষ্ঠাতৃদেবগণ জিজ্ঞাসায় বলিলেন, তাঁহারা কেহ আমার মন চুরি করেন নাই।

বন্ধু বলিলেন, একবার প্রসন্ন গোয়ালিনীর নিকট সন্ধান জান। প্রসন্নের সঙ্গে আমার একটু প্রণয় ছিল বটে, কিন্তু সে প্রণয়টা কেবল গব্যরসাত্মক। তবে প্রসন্ন দেখিতে শুনিতে মোটাসোটা, গোলগাল, বয়সে চল্লিশের নীচে, দাঁতে মিসি, হাসিভরা মুখ, কপালের একটি ছোট উল্‌কী টিপের মত দেখাইত; সে রসের হাসি পথে ছড়াইতে ছড়াইতে যাইত, আমি তাহা কুড়াইয়া লইতাম, এইজন্য লোকে আমার নিন্দা করিত। পূজারি বামণের জ্বালায় বাগানে ফুল ফুটিতে পায না—আর নিন্দকের জ্বালায় প্রসন্নের কাছে আমার মুখ ফুটিতে পায় না—নচেৎ গব্যরসে ও কাব্যরসে বিলক্ষণ বিনিময় চলিত। ইহাতে আমার নিজের জন্য আমি যত দুঃখিত হই, না হই, প্রসন্নের জন্য আমি একটু দুঃখিত। কেন না, প্রসন্ন সতী, সাধ্বী, পতিব্রতা। এ কথাও আমি মুখ ফুটিয়া বলিতে পাই না। বলিয়াছিলাম বলিযা, পাড়ার একটি নষ্টবুদ্ধি ছেলে ইহার বিপরীত অর্থ করিয়াছিল। সে বলিল যে, প্রসন্ন আছেন, এজন্য সৎ বা সতী বটে, তিনি সাধুঘোষের স্ত্রী, এজন্য সাধ্বী; এবং বিধবাবস্থাতেও পতিছাড়া নহেন, এজন্য ঘোরতর পতিব্রতা। বলা বাহুল্য যে, যে অশিষ্ট বালক এই ঘৃণিত অর্থ মুখে আনিয়াছিল, তাহার শিক্ষার্থ, তাহার গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে আমার কলঙ্ক গেল না।

যখন লিখিতে বসিয়াছি, তখন স্পষ্ট কথা বলা ভাল—আমি প্রসন্নের একটু অনুরাগী বটে। তাহার কারণ আছে—প্রথমতঃ, প্রসন্ন যে দুগ্ধ দেয়, তাহা নির্জ্জল, এবং দামে সস্তা; দ্বিতীয়, সে কখন কখন ক্ষীর, সর, নবনীত আমাকে বিনামূল্যে দিয়া যায়; তৃতীয়, সে একদিন আমাকে কহিয়াছিল, "দাদাঠাকুর, তোমার দপ্তরে ও কিসের কাগজ?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "শুনবি?" সে বলিল, "শুনিব।" আমি তাহাকে কয়েকটি প্রবন্ধ পড়িয়া শুনাইলাম—সে বসিয়া শুনিল। এত গুণে কোন্ লিপিব্যবসায়ী ব্যক্তি বশীভূত না হয়? প্রসন্নের গুণের কথা আর অধিক কি বলিব—সে আমার অনুরোধে আফিম ধরিয়াছিল।

এই সকল গুণে আমার মন কখন কখন প্রসন্নের ঘরের জানালার নীচে ঘুরিয়া বেড়াইত ইহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু কেবল তাহার ঘরের জানালার নীচে নয়, তাহার গোহালঘরের আগড়ের পাশেও উঁকি মারিত। প্রসন্নের প্রতি আমার যেরূপ অনুরাগ, তাহার মঙ্গলা নামে গাইয়ের প্রতিও তদ্রূপ। একজন ক্ষীর সর নবনীতের আকর, দ্বিতীয়, তাহার দানকর্ত্রী। গঙ্গা বিষ্ণুপদ হইতে জন্মগ্রহণ করিযাছেন বটে, কিন্তু ভগীরথ তাঁহাকে আনিয়াছেন; মঙ্গলা আমার বিষ্ণুপদ; প্রসন্ন আমার ভগীরথ; আমি দুইজনকেই সমান ভালবাসি। প্রসন্ন এবং তাহার গাই, উভয়েই সুন্দরী; উভয়েই স্থূলাঙ্গী, লাবণ্যময়ী এবং ঘটোধ্নী। একজন গব্যরস সৃজন করে, আর একজন, হাস্যরস সৃজন করেন। আমি উভয়েরই নিকট বিনামূল্যে বিক্রীত।

কিন্তু আজি কালি সন্ধান করিয়া দেখিলাম, প্রসন্নের গবাক্ষতলে, অথবা তাহার গোহালঘরে আমার মন নাই। আমার মন কোথা গেল?

কাঁদিতে কাঁদিতে পথে বাহির হইলাম। দেখিলাম, এক যুবতী জলের কলসী কক্ষে লইয়া যাইতেছে। তাহার মুখের উপর গভীর-কৃষ্ণ দোদুল্যমান কুঞ্চিতালকরাজি, গভীর-কৃষ্ণ ভ্রূযুগ, এবং গভীর-কৃষ্ণ চঞ্চল নয়নতারা দেখিয়া বোধ হইল, যেন পদ্মবনে কতকগুলা ভ্রমর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—বসিতেছে না, উড়িয়া বেড়াইতেছে। তাহার গমনে যেরূপ অঙ্গ দুলিতেছিল, বোধ হইল, যেন লাবণ্যের নদীতে ছোট ছোট ঢেউ উঠিতেছে; তাহার প্রতি পদক্ষেপে বোধ হইল, যেন পাঁজরের হাড় ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছে। ইহাকে দেখিয়া আমার বোধ হইল, নিঃসন্দেহ এই আমার মন চুরি করিয়াছে। আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। সে ফিরিয়া দেখিয়া ঈষৎ রুষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ও কি ও? সঙ্গ নিয়েছ কেন?"

আমি বলিলাম, "তুমি আমার মন চুরি করিয়াছ।"

যুবতী কটূক্তি করিয়া গালি দিল। বলিল, "চুরি করি নাই। তোমার ভগিনী আমাকে যাচাই করিতে দিয়াছিল। দর কষিয়া আমি ফিরিয়া দিয়াছি।"

সেই অবধি শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া, মনের সন্ধানে আর রসিকতা করিতে প্রয়াস পাই না, কিন্তু মনে মনে বুঝিয়াছি যে, এ সংসারে আমার মন কোথাও নাই। রহস্য ছাড়িয়া সত্য কথা বলিতেছি, কিছুতেই আমার আর মন নাই। শারীরিক সুখ-স্বচ্ছন্দতায় মন নাই, যে রহস্যালাপের আমি প্রিয় ছিলাম, সে রহস্যালাপে আমার মন নাই। আমার কতকগুলি ছেঁড়া পুঁথি ছিল—তাহাতে আমার মন থাকিত, তাহাতে আমার মন নাই। অর্থসংগ্রহে কখন ছিল না—এখনও নাই। কিছুতেই আমার মন নাই—আমার মন কোথা গেল ?

বুঝিযাছি, লঘুচেতাদিগের মনের বন্ধন চাই ; নহিলে মন উড়িযা যায়। আমি কখন কিছুতে মন বাঁধি নাই—এজন্য কিছুতেই মন নাই। এ সংসারে আমরা কি করিতে আসি, তাহা ঠিক বলিতে পারি না—কিন্তু বোধ হয়, কেবল মন বাঁধা দিতেই আসি। আমি চিরকাল আপনার রহিলাম—পরের রইলাম না, এইজন্যই পৃথিবীতে আমার সুখ নাই। যাহারা স্বভাবতঃ নিতান্ত আত্মপ্রিয়, তাহারাও বিবাহ করিয়া, সংসারী হইযা, স্ত্রী পুত্রের নিকট আত্মসমর্পণ করে, এজন্য তাহারা সুখী। নচেৎ তাহারা কিছুতেই সুখী হইত না। আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেছি, পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থাযী সুখের অন্য কোন মূল নাই। ধন, যশঃ, ইন্দ্রিয়াদিলব্ধ সুখ আছে বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী নহে। এ সকল প্রথমবারে যে সুখদায়ক হয, দ্বিতীয়বারে সে পরিমাণে হয় না, তৃতীয়বারে আরও অল্প সুখদায়ক হয়, ক্রমে অভ্যাসে তাহাতে কিছুই সুখ থাকে না। সুখ থাকে না, কিন্তু দুইটি অসুখের কারণ জন্মে ; প্রথমতঃ অভ্যস্ত বস্তুর ভাবে সুখ না হউক, অভাবে গুরুতর অসুখ হয় ; এবং অপরিতোষণীয়া আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধিতে যন্ত্রণা হয়। অতএব পৃথিবীতে যে সকল বিষয় কাম্যবস্তু বলিয়া চিরপরিচিত, তাহা সকলই অতৃপ্তিকর এবং দুঃখের মূল। সকল স্থানেই যশের অনুগামিনী নিন্দা, ইন্দ্রিয়সুখের অনুগামী রোগ, ধনের সঙ্গে ক্ষতি ও মনস্তাপ ; কান্ত বপু জরাগ্রস্ত বা ব্যাধিদুষ্ট হয় ; সুনামেও মিথ্যা কলঙ্ক রটে ; ধন পত্নীজারেও ভোগ করে ; মান সম্ভ্রম মেঘমালার ন্যায় শরতের পর আর থাকে না। বিদ্যা তৃপ্তিদায়িনী নহে, কেবল অন্ধকার হইতে গাঢ়তর অন্ধকারে লইয়া যায়, এ সংসারের তত্ত্বজিজ্ঞাসা কখন নিবারণ করে না। স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে বিদ্যা কখন সক্ষম হয় না। কখন শুনিয়াছ, কেহ বলিয়াছে, আমি ধনোপার্জ্জন করিয়া সুখী হইয়াছি বা যশস্বী হইয়া সুখী হইয়াছি ? যেই এই কয় ছত্র পড়িবে, সেই বেশ করিয়া

স্মরণ করিয়া দেখুক, কখন এমন শুনিয়াছে কি না। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, কেহ এমত কথা কখন শুনে নাই। ইহার অপেক্ষা ধনমানাদির অকার্য্যকারিতার গুরুতর প্রমাণ আর কি পাওয়া যাইতে পারে? বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এমন অকাট্য প্রমাণ থাকিতেও মনুষ্যমাত্রেই তাহার জন্য প্রাণপাত করে। এ কেবল কুশিক্ষার গুণ। মাতৃস্তন্য দুগ্ধের সঙ্গে সঙ্গে ধনমানাদির সর্ব্বসারবত্তায় বিশ্বাস শিশুর হৃদযে প্রবেশ করিতে থাকে—শিশু দেখে, রাত্রিদিন পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী গুরু ভৃত্য প্রতিবেশী শত্রু মিত্র সকলেই প্রাণপণে হা অর্থ, হা যশ, হা মান, হা সম্ভ্রম! করিষা বেড়াইতেছে। সুতরাং শিশু কথা ফুটিবার আগেই সেই পথে গমন করিতে শিখে। কবে মনুষ্য নিত্য সুখের একমাত্র মূল অনুসন্ধান করিষা দেখিবে? যত বিদ্বান, বুদ্ধিমান্, দার্শনিক, সংসারতত্ত্ববিৎ, যে কেহ আস্ফালন কর, সকলে মিলিয়া দেখ, পরসুখবর্দ্ধন ভিন্ন মনুষ্যের অন্য সুখের মূল আছে কি না? নাই। আমি মরিযা ছাই হইব, আমার নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইবে, কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, একদিন মনুষ্যমাত্রে আমার এই কথা বুঝিবে যে, মনুষ্যের স্থাযী সুখের অন্য মূল নাই। এখন যেমন লোকে উন্মত্ত হইয়া ধন মান ভোগাদির প্রতি ধাবিত হয়, একদিন মনুষ্যজাতি সেইরূপ উন্মত্ত হইয়া পরের সুখের প্রতি ধাবমান হইবে। আমি মরিয়া ছাই হইব, কিন্তু আমার এ আশা একদিন ফলিবে! ফলিবে, কিন্তু কত দিনে! হায, কে বলিবে, কত দিনে।

কথাটি প্রাচীন। সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে শাক্যসিংহ এই কথা কত প্রকারে বলিয়া গিয়াছেন। তাহার পর, শত সহস্র লোকশিক্ষক শত সহস্র বার এই শিক্ষা শিখাইয়াছেন। কিন্তু কিছুতেই লোকে শিখে না—কিছুতেই আত্মাদরের ইন্দ্রজাল কাটাইযা উঠিতে পারে না। আবার আমাদের দেশ ইংরেজি মুলুক হইযা এ বিষযে বড গণ্ডগোল বাধিয়া উঠিযাছে। ইংরেজি শাসন, ইংরেজি সভ্যতা ও ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে "মেটিরিয়েল্ প্রস্পেরিটির"* উপর অনুরাগ আসিযা দেশ উৎসন্ন দিতে আরম্ভ করিযাছে। ইংরেজ জাতি বাহ্য সম্পদ্ বড ভালবাসেন—ইংরেজি সভ্যতার এইটি প্রধান চিহ্ন—তাঁহারা আসিয়া এদেশের বাহ্য সম্পদ্ সাধনেই নিযুক্ত—আমরা তাহাই ভালবাসিয়া আর সকল বিস্মৃত হইয়াছি। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেবমূর্ত্তিসকল মন্দিরচ্যুত হইয়াছে—সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত কেবল বাহ্য সম্পদের পূজা আরম্ভ হইয়াছে। দেখ, কত বাণিজ্য বাড়িতেছে—দেখ, কেমন রেলওয়েতে হিন্দু-ভূমি জাল-নিবদ্ধ হইয়া উঠিল—দেখিতেছ, টেলিগ্রাফ কেমন বস্তু! দেখিতেছি, কিন্তু

* বাহ্য সম্পদ্।

কমলাকান্তের জিজ্ঞাসা এই যে, তোমার রেলওযে টেলিগ্রাফে কতটুকু মনের সুখ বাড়িবে? আমার এই হারান মন খুঁজিয়া আনিযা দিতে পারিবে? কাহারও মনের আগুন নিবাইতে পারিবে? ঐ যে কৃপণ ধনতৃষায় মরিতেছে, উহার তৃষা নিবারণ করিবে? অপমানিতের অপমান ফিরাইতে পারিবে? রূপোন্মত্তের ক্রোড়ে রূপসীকে তুলিয়া বসাইতে পারিবে? না পারে, তবে তোমার রেলওযে টেলিগ্রাফ প্রভৃতি উপাড়িয়া জলে ফেলিযা দাও—কমলাকান্ত শর্ম্মা তাতে ক্ষতি বিবেচনা করিবেন না।

কি ইংরেজি, কি বাঙ্গালা, যে সম্বাদ-পত্র, সামযিক পত্র, স্পীচ, ডিবেট, লেকৃচর, যাহা কিছু পড়ি বা শুনি, তাহাতে এই বাহ্য সম্পদ্ ভিন্ন আর কোন বিষযের কোন কথা দেখিতে পাই না। হর হর বম্ বম্! বাহ্য সম্পদের পূজা কর। হর হর বম্ বম্! টাকার রাশির উপর টাকা ঢাল। টাকা ভক্তি, টাকা মুক্তি, টাকা নতি, টাকা গতি। টাকা ধর্ম্ম, টাকা অর্থ, টাকা কাম, টাকা মোক্ষ! ও পথে যাইও না, দেশের টাকা কমিবে, ও পথে যাও, দেশের টাকা বাড়িবে! বম্ বম্ হর হর! টাকা বাড়াও, টাকা বাড়াও, রেলওযে টেলিগ্রাফ অর্থ-প্রসূতি, ও মন্দিরে প্রণাম কর! যাতে টাকা বাড়ে, এমন কর; শূন্য হইতে টাকা বৃষ্টি হইতে থাকুক। টাকার ঝন্ঝনিতে ভারতবর্ষ পুরিয়া যাউক! মন! মন আবার কি? টাকা ছাড়া মন কি? টাকা ছাড়া আমাদের মন নাই; টাকশালে আমাদের মন ভাঙ্গে গড়ে। টাকাই বাহ্য সম্পদ্। হর হর বম্ বম্! বাহ্য সম্পদের পূজা কর। এ পূজার তাম্রশ্মশ্রুধারী ইংরেজ নামে ঋষিগণ পুরোহিত; এডাম্ স্মিথ পুরাণ এবং মিল তন্ত্র হইতে এ পূজার মন্ত্র পড়িতে হয়; এ উৎসবে ইংরেজি সম্বাদ-পত্রসকল ঢাক ঢোল, বাঙ্গালা সম্বাদ-পত্র কাঁসিদার; শিক্ষা এবং উৎসাহ ইহাতে নৈবেদ্য, এবং হৃদয় ইহাতে ছাগবলি। এ পূজার ফল, ইহলোকে ও পরলোকে অনন্ত নরক। তবে, আইস, সবে মিলিয়া বাহ্য সম্পদের পূজা করি। আইস, যশোগঙ্গার জলে ধৌত করিযা, বঞ্চনা-বিল্বদলে মিষ্টকথা-চন্দন মাখাইযা, এই মহাদেবের পূজা করি। বল হর হর বম্ বম্! বাহ্য সম্পদের পূজা করি। বাজা ভাই ঢাক ঢোল—ছ্যাড়্ ছ্যাড়্ ছ্যাড়্ ছ্যাড়্ ছ্যাড়্ ছ্যাড়্ ছ্যাড়্! বাজা ভাই কাঁসিদার,—ট্যাং ট্যাং ট্যাং নাট্যাং নাট্যাং! আসুন পুরোহিত মহাশয! মন্ত্র বলুন। আমাদের এই বহুকালের পুরাতন ঘৃতটুকু লইয়া স্বধা স্বাহা বলিয়া আগুনে ঢালুন। কোথা ভাই ইউটিলিটেরিযেন্ কামার! পাঁটা হাড়িকাটে ফেলিযাছি; একবার বাবা পঞ্চানন্দের * নাম করিয়া, এক কোপে

* পঞ্চানন নাম প্রসিদ্ধ নহে—পঞ্চানন্দই প্রসিদ্ধ। মদ্য, মাংস, গাড়িজুড়ি, পোষাক এবং বেশ্যা—এই পাঁচটি আনন্দে এই নূতন পঞ্চানন্দ।

পাচার কর! হর হর বম্ বম্! কমলাকান্ত দাঁড়াইয়া আছে, মুড়িটি দিও! তোমরা স্বচ্ছন্দে পূজা কর!

পূজা কর, ক্ষতি নাই, কিন্তু আমাকে গোটাকত কথা বুঝাইয়া দাও। তোমার বাহ্য সম্পদে কয়জন অভদ্র ভদ্র হইয়াছে? কয়জন অশিষ্ট শিষ্ট হইয়াছে? কয়জন অধার্ম্মিক ধার্ম্মিক হইযাছে? কয়জন অপবিত্র পবিত্র হইয়াছে? একজনও না? যদি না হইয়া থাকে, তবে তোমার এই ছাই আমরা চাহি না—আমি হুকুম দিতেছি, এই ছাই ভারতবর্ষ হইতে উঠাইয়া দাও।

তোমাদের কথা আমি বুঝি। উদর নামে বৃহৎ গহ্বর, ইহা প্রত্যহ বুজান চাই; নহিলে নয়। তোমরা বল যে এই গর্ত্ত যাহাতে সকলেরই ভাল করিযা বুজে, আমরা সেই চেষ্টায আছি। আমি বলি, সে মঙ্গলের কথা বটে, কিন্তু উহার অত বাড়াবাড়িতে কাজ নাই। গর্ত্ত বুজাইতে তোমরা এমনই ব্যস্ত হইযা উঠিতেছ যে, আর সকলের কথা ভুলিযা গেলে। বরং গর্ত্তের এক কোণ খালি থাকে, সেও ভাল, তবু আর আর দিকে একটু মন দেওযা উচিত। গর্ত্ত বুজান হইতে মনের সুখ একটা স্বতন্ত্র সামগ্রী; তাহার বৃদ্ধির কি কোন উপায় হইতে পারে না? তোমরা এত কল করিতেছ, মনুষ্যে মনুষ্যে প্রণয় বৃদ্ধির জন্য কি একটা কিছু কল হয় না? একটু বুদ্ধি খাটাইয়া দেখ, নহিলে সকল বেকল হইযা যাইবে।

আমি কেবল চিরকাল গর্ত্ত বুজাইযা আসিয়াছি—কখন পরের জন্য ভাবি নাই। এই জন্য সকল হারাইয়া বসিয়াছি—সংসারে আমার সুখ নাই; পৃথিবীতে আমার থাকিবার আর প্রয়োজন দেখি না। পরের বোঝা কেন ঘাড়ে করিব, এই ভাবিযা সংসারী হই নাই। তাহার ফল এই যে, কিছুতেই আমার মন নাই। আমি সুখী নহি। কেন হইব? আমি পরের জন্য দায়ী হই নাই, সুখে আমার অধিকার কি?

সুখে আমার অধিকার নাই, কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিও না যে, তোমরা বিবাহ করিযাছ বলিয়া সুখী হইয়াছ। যদি পারিবারিক স্নেহের গুণে তোমাদের আত্মপ্রিয়তা লুপ্ত না হইয়া থাকে, যদি বিবাহনিবন্ধনে তোমাদের চিত্ত মার্জ্জিত না হইয়া থাকে, যদি আত্ম-পরিবারকে ভালবাসিয়া, তাবৎ মনুষ্যজাতিকে ভালবাসিতে না শিখিয়া থাক, তবে মিথ্যা বিবাহ করিয়াছ; কেবল ভূতের বোঝা বহিতেছ। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি বা পুত্রমুখ নিরীক্ষণের জন্য বিবাহ নহে। যদি বিবাহবন্ধে মনুষ্য চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন না হইল, তবে বিবাহের প্রয়োজন নাই। ইন্দ্রিয়াদি অভ্যাসের বশ; অভ্যাসে এ সকল একেবারে শান্ত থাকিতে পারে। বরং মনুষ্যজাতি ইন্দ্রিয়কে

বশীভূত করিয়া পৃথিবী হইতে লুপ্ত হউক, তথাপি যে বিবাহে প্রীতি শিক্ষা না হয়, সে বিবাহে প্রয়োজন নাই।

এক্ষণে কমলাকান্ত যুক্ত করে সকলের নিকট নিবেদন করিতেছে, তোমরা কেহ কমলাকান্তের একটি বিবাহ দিতে পার?

ষষ্ঠ সংখ্যা

চন্দ্রালোকে

এই তৃণ-শষ্প-শোভিত হরিৎক্ষেত্রে, এই কলবাহিনী ভাগীরথী তীরে, এই স্ফুটচন্দ্রালোকে, আজি দপ্তরের শ্রীবৃদ্ধি, কলেবর-বৃদ্ধি করিব। এইরূপ চন্দ্রালোকেই না ট্রৈলস্ শর্ম্মা ট্রয়ের উচ্চ প্রাচীরে আরোহণ করিয়া, ক্রিসীদাকে স্মরণ করিযা, উষ্ণ শ্বাস ত্যাগ করিতেন! এইরূপ চন্দ্রালোকেই না থিসবী সুন্দরী এইরূপ মৃদু শিশির-পাত-সিক্ত শষ্প মৃদু পদে দলিত করিযা পিরামসের সঙ্কেতস্থানাভিমুখে অভিসারিণী হইতেন? অভিসারিণী শব্দটিতে অভি একটি উপসর্গ আছে, সৃ একটি ধাতু আছে এবং স্ত্রীত্ববাচক একটি 'ইনী' আছে; এই জীবনে কমলাকান্ত শর্ম্মা কত উপসর্গ দেখিলেন, কত লোকের ধাতু ছাড়িল গঠিল দেখিলেন, কত ইনীও এলেন গেলেন, কিন্তু সোপসর্গ ধাতুবিশিষ্ট একটি ইনীও কখন দেখিলাম না। কমলাকান্ত উপসর্গে কোন ইনীর ধাতু বিগড়াইল না। কমলাভিসারিণী, এরূপ নায়িকা কখন হইল না। যাহারা দধি দুগ্ধ বিক্রয়ার্থ আগমন করে, তাহাদিগকে শ্রীমদ্ভাগবতে "পসারিণী" বলিযাছে, কখন অভিসারিণী বলিয়াছে, এরূপ স্মরণ হয় না, তাহা যদি বলিত, তাহা হইলে অনেক অভিসারিণী দেখিয়াছি বলিতে পারিতাম।

চন্দ্র, তুমি হাস্য করিতেছ? হেসে হেসে ভেসে উঠিতেছ? তোমার সাতাইশ ইনী শুদ্ধ আমাকে দেখিয়া, আমার প্রতি চক্ষু টিপিয়া উপহাস করিতেছ? দক্ষ রাজার যেমন কর্ম্ম—একেবারে সাতাইশটিকে এক চন্দ্রে সমর্পণ করিলেন, আর এখন কমলাকান্ত শর্ম্মা বিবাহের জন্য লালায়িত। অমল-ধবল-কিরণরাশি সুধাংশো! আর সকল তোমার থাক্, তুমি অন্ততঃ অশ্লেষা মঘাকে ছাড়িয়া দেও, আমি ওই দুইটিকে বড় ভালবাসি। আমার মত নিষ্কর্ম্মা লোক উহাদের কল্যাণে অন্ততঃ দুই দিন গৃহবাসসুখ উপলব্ধি করিতে পারে। আমি ঐ ভগিনীদ্বয়কে আমার ভবনে চিরকাল জন্য স্থান দান করিয়া, সুখে কাল কর্ত্তন করিব। ইহাদিগের আরও অনেক গুণ আছে—লোকে নিজে অক্ষমতানিবন্ধন কোন কর্ম্ম করিতে না পারিয়া,

স্বচ্ছন্দে ইহাদিগের দোহাই দিয়া, লোকের কাছে আস্ফালন করিতে পারে আমিও নসীবাবুর কাপড় কিনিতে যদি নির্বুদ্ধিতাবশতঃ প্রতারিত হইয়া আসি, আমার সহধর্ম্মিণীদ্বয়ের স্কন্ধে সমস্ত দোষ অর্পণ করিয়া সাফাই করিতে পারিব।

চন্দ্রদেব! তুমি আমার কথায় কর্ণপাত করিলে না? এখনও মন্দাকিনীর মন্দান্দোলিত বক্ষ-বসন করস্পর্শে প্রতিভাসিত করিতেছ? এখনও মন্দ সমীরণের সহ পরামর্শ করিয়া বৃক্ষের অগ্রভাগে পলকে পলকে ঝলক বর্ষণ করিবে? এখন তৃণক্ষেত্রে মণি মুক্তা মরকত অকাতরে ছড়াইয়া দিবে? উলুবনে মুক্তা, আর কেহ ছড়াক আর না ছড়াক, দেখিতেছি তুমি ছড়াইয়া থাক। আর আজ আমি ছড়াইব!

এই সংসারের লোক, এই বল্লালসেনের প্র-পরা-অপ-পৌত্রেরা এবং তাঁহার নির্-দুর্-বি-অধি-দৌহিত্রেরা আমাকে জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছে। আমার বক্ষের উপরি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বি. এ. না হলে বিয়ে হয় না। এইবার সংসার ডুবিল। উচ্চ শিক্ষার ফল কি? ছাপর খাট—রূপার কলসী, গরদের কাচা, এবং স্বর্ণালঙ্কার-ভূষিতা, পট্ট-বসনাবৃত', একটি বংশখণ্ডিকা! হরি হরি বল, ভাই! তৃণগ্রাহী পাণ্ডিত্যাভিমানী বি. এ. উপাধিধারী উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত নব বঙ্গবাসীর, কলসী বস্ত্র বংশখট্টাসমেত সজ্ঞানে গঙ্গালাভ হইল!!!* প্রথমে উপাধি পাইয়াছিলেন, এবার সমাধি পাইলেন। তিনি বিলাতী ব্রহ্মে লীন হইলেন। বঙ্গীয় যুবক সংসারী হইলেন। তাঁহার উচ্চশিক্ষা তাঁহাকে তাঁহার চরমধামে পৌছিয়া দিযাছে। তিনি সহস্র তোলক পরিমিত রজতপাত্র, শত তোলক পরিমিত স্বর্ণালঙ্কার এবং সংসার-কুটিরের একমাত্র দণ্ডিকা একটি বংশ-খণ্ডিকা পাইয়াছেন, তিনি তাঁহার চিরবাঞ্ছিত হেমকুট পর্ব্বত-নিকটস্থ কিষ্কিন্ধ্যাপুরীর সরকারি ওকালতী পাইয়াছেন, হরি হরি বল, ভাই! তাঁহার এত দিনে সমাধি হইল!!! তিনি উচ্চশিক্ষালাভার্থ বহু যত্নে কামস্কট্কা দেশের নদীসকলের নাম কণ্ঠাগ্রে করিয়াছিলেন! এই উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি নিশীথপ্রদীপে অনন্যমনে শাহারা মরুভূমির বালুকাপুঞ্জের সংখ্যা অবধারণ করিয়াছিলেন। এই উচ্চশিক্ষার জন্যই শার্লিমানের উর্দ্ধে বায়ান্ন পুরুষ, নিম্নে সাড়ে তিপ্পান্ন পুরুষের কুলজি মুখস্থ করিয়াছেন। এই উচ্চশিক্ষা-বলে তিনি শিখিয়াছেন যে, টাউনহলে বক্তৃতা করিতে পারিলেই পরম পুরুষার্থ, ইংরেজের নিন্দা যে কোন প্রকারে করিতে পারিলেই রাজনীতির একশেষ হইল। এবং বংশ-দণ্ডিকার স্থাপন

* বোধ হয়, এই রাত্রি হইতেই কমলাকান্তের বাতিকের বড় বাড়াবাড়ি হইয়াছিল।

—শ্রীভীষ্মদেব খোশনবীশ।

করিয়া উমেদার গোষ্ঠীর বৃদ্ধি করিয়া দেশ জঙ্গলময় করিতে পারিলেই কলির জীব-ধর্ম্মের চরিতার্থতা হইল।

এরূপ বংশ-দণ্ডিকা-প্রয়াসী আমি নহি; আমি উইল করিযা যাইব, সাত পুরুষ বিবাহ করিতে না হয়, তাও কর্ত্তব্য, তথাপি এরূপ বংশ-দণ্ডিকা আশ্রয়ে স্বর্গ-প্রাপ্তির বাঞ্ছাও কেহ না করে। যদি জীবপ্রবাহ বৃদ্ধি করাই বিবাহের উদ্দেশ্য হয়, তবে আমি মৎস্যাদি বিবাহ করিব, যদি টাকার জন্য বিবাহ করিতে হয়, তবে আমি টাকশালের অধ্যক্ষকে বিবাহ করিব; আর যদি সৌন্দর্য্যার্থে বিবাহ করিতে হয়, তবে—ঘোমটাটানা চাঁদবদনীদের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিযা, ঐ আকাশের চাঁদকে বিবাহ করিব।

ভাগীরথি! যদি তুমি শান্তনুবক্ষে অথবা তদপেক্ষা উচ্চতর হিমালয়-ভবনে, অথবা আরো উচ্চতর ধূর্জ্জটির জটা-কলাপে বিরাজ করিতে, তাহা হইলে কে আজ তোমায় উপাসনা করিত? তুমি নীচগা হইয়া, মর্ত্ত্যে অবতরণ করিযা সহস্রধা হইযা সাগরোদ্দেশে গমন করিয়াছিলে বলিয়াই সগর-বংশের উদ্ধার হইয়াছে! সমীরণ! তুমি যদি অঞ্জনার অঞ্চল লইযা চিরক্রীড়াশক্ত থাকিতে, অথবা মলয়াচলে স্বীয় প্রমোদভবনে চন্দন-শাখা নমিত করিয়া বা এলা-লতা কম্পিত করিয়া পরিভ্রমণ করিতে, তাহা হইলে কে তোমাকে "ত্বমেব জগজ্জীবনং পালনং" বলিয়া আর তোমার স্তব স্তুতি করিত? এই বাল-বসন্ত-বিহারী বিহঙ্গমকুলের কাকলি যদি কেবল নন্দন-কাননেই প্রতিধ্বনিত হইত, তাহা হইলে কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী তাহাদের নাম করিয়া এই রাত্রিকালে স্বীয় মসী লেখনীর অনর্থক ক্ষয় করিবে কেন? শুধাংশো! যদি তুমি ক্ষীরোদ-সাগরতলে, অমৃত-ভাণ্ডারে, প্রবালপালঙ্কে মৌক্তিক-শয্যায় শায়িত থাকিতে, তাহা হইলে কে তোমার সহিত রমণীমুখ-মণ্ডলের তুলনা করিত? অথবা তোমার ঐ সাতাইশটি ক্রমান্বয় ভর্ত্তৃকা লইয়া খলু সার শ্বশুর-মন্দির দক্ষালয়ে বাস করিতে, তাহা হইলে আজি কমল শর্ম্মা কি তোমার দর্শনাভিলাষী হইয়া—এই শ্মশাননিকট বটতলায় তীরস্থ হইয়া বাস করে?

শশী—যদি তোমার ব্যাকরণ পড়া থাকে, তবে আমাকে মাপ করিও, আমি প্রাণান্তেও শশিন্ বলিতে পারিব না—আমি এতক্ষণ তোমার গুণের অনুধ্যান করিতেছিলাম; শশী, তুমি অনাথার কুটীরদ্বারে প্রহরীরূপে অনিমেষনয়নে বসিয়া থাক, আধভাষী শিশু যখন নাচিতে নাচিতে তোমায় ধরিতে যায়, তুমি তাহার সঙ্গে নাচিতে নাচিতে খেলা কর, বালিকা যখন স্বচ্ছ সরোবরহৃদয়ে তোমায় একবার দেখিতে পাইয়া, একবার না পাইয়া, তোমার সন্দর্শন লাভার্থ, ইতস্ততঃ সরোবরকূলে দৌড়িতে

থাকে, তখন তুমি এক একবার ঈষৎ দেখা দিয়া তাহার সহিত কেবল লুকোচুরি খেলিতে থাক, নববধূ যখন মন্দ বাত সহিত প্রাসাদোপরি একাকিনী দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে থাকে, তখন তুমি নারিকেলকুঞ্জান্তরাল হইতে অতি ধীরে ধীরে তাহার হৃদয় ভরিয়া অমৃত বর্ষণ করিয়া তাহাকে ক্রমে শীতল কর; যখন তরঙ্গিণী আশা-তরঙ্গিত-হৃদয়ে ধীর প্রবাহে মন্দগতিতে সিন্ধু-অভিগামিনী হয়, তখন তুমিই তাহাকে স্বর্ণ-ভূষণে ভূষিত করিয়া পথ প্রদর্শন করিয়া থাক; গোলাপ যখন বসন্ত-রাগে এক বৃন্তে চারিদিক দেখিয়া হেলিতে দুলিতে থাকে, তখন তুমিই তাহাকে মালতী লতাকে চুম্বন করিতে কানে কানে পরামর্শ দেও। আবার সেই তুমিই অসদভিসন্ধিৎসু নর যখন কুলকামিনীর ধর্ম্মনাশে প্রবৃত্ত হয়, তখন তোমার কোমল মুখমণ্ডলে এমনি ভ্রূকুটি করিতে থাক যে, সে তোমার মুখপানে আর দৃষ্টিক্ষেপ করিতে সমর্থ হয না; তুমিই নরহত্যাকারীর তরবারিফলকে বিদ্যুৎ চমকাইয়া দেও, তাহার পাপ শোণিতবিন্দুতে চৌষট্টি রৌরব প্রতিফলিত করিয়া দেখাইয়া দেও।

তুমি ক্রীড়াশীল শিশুর চলৎ স্বর্ণস্থালী, তরুণের আশা-প্রদীপ; যুবক যুবতীর যামিনীযাপনের প্রধান সম্ভোগ-পদার্থ; এবং স্থবিরের স্মৃতি-দর্পণ। তুমি অনাথার প্রহরী, স্থির দীপধারী; তুমি পথিকের পথ-প্রদর্শক; গৃহীর নৈশ সূর্য্য; তুমি পাপীর পাপের সাক্ষী; পুণ্যাত্মার চক্ষে তাহার যশঃপতাকা। তুমি গগনের উজ্জ্বল মণি; জগতের শোভা। আর এই শ্মশানবিহারী শ্রীকমলাকান্তের একমাত্র সম্বল; তুমি ভালর ভাল, মন্দের মন্দ; রসে রস, বিরসে বিষ। তুমি কমলাকান্তের সহধর্ম্মিণী; শশী, আমি তোমায় বড় ভালবাসি, আমি তোমাকেই বিবাহ করিব। সকলে হরি হরি বল, ভাই! আজ এইখানে বাসর যাপন—সকলে একবার হরি হরি বল, ভাই!

বম্ ভোলানাথ! চন্দ্র যে পুরুষ! তবে ডবল মাত্রা চড়াইতে হইল!

চন্দ্র আমাদিগের আর্য্য মতে পুরুষ বটে, কিন্তু বিলাতীর শর্ম্মাদিগের মতে ইনি কোমলাঙ্গী। আমাদিগের মতে চন্দ্র হি,* ইংরাজি মতে চন্দ্র শী। এখন উপায়? হি কি শী, তাহা স্থির হইবে কি প্রকারে।

বাস্তবিক এই বিষয়ে সংসারের লোকের সঙ্গে আমার কখন মতের ঐক্য হইল না। আমার এ বিষয়ে নানা সন্দেহ হয়। যে ওয়াজিদালিশাহা লক্ষ্ণৌ নগরী হইতে

* হি শী কাহাকে বলে? শুনিয়াছি, দুইটি ইংরাজি সর্ব্বনাম—হি পুংলিঙ্গ—শী স্ত্রীলিঙ্গ।
—শ্রীভীষ্মদেব

স্বচ্ছন্দে চতুর্দ্দোলারোহণে মুচিখোলায় আগমন করিয়া, হংস-হংসী, কপোত-কপোতী লইয়া ক্রীড়া করেন, গোলাপ সহিত বারি-হ্রদে নিত্য স্নান করিয়া, স্বীয়ানুরূপী পিঞ্জরস্থ বুলবুলিকে সঘৃত পলান্ন প্রদান করেন, তিনি হি না শী ? এবং যে মহিষী দেশবাৎসল্যে ঐহিক সুখ সম্পত্তি বিসর্জ্জন করিয়া—রাজপুরুষগণের শরণাপন্ন হওয়াপেক্ষা ভিক্ষান্ন শ্রেয়ঃ বোধে, নেপালের পার্ব্বতীয় প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছেন, তিনি শী না হি ? তবে ত সাহসকে হি-শীর প্রভেদক করা যায় না। তবে যুদ্ধ-নৈপুণ্যে হি-শীর প্রভেদ হইবে ? যে জোয়ান ওর্লিয়ান্স দুর্গ আক্রমণ-কালে সর্ব্বপ্রথমে পদার্পণ করিয়াছিল, যে ফ্রান্সের পুনরুদ্ধার করিয়াছিল, তাহাকে শী বলিব, না হি বলিব ? আর যে বেড্‌ফোর্ড—তাহাকে পাক-চক্রে ফেলিবার জন্য সেই জোয়ানের কারাগারে পুরুষের বস্ত্র সংরক্ষণ করিয়াছিল, তাহাকেই বা হি বলিব না শী বলিব ? না, যুদ্ধ-কৌশলে বুঝিতে পারিলাম না। তবে শুনা যায়, যে বলীয়ান্, সেই পুরুষ, আর যে জাতি দুর্ব্বল, তাহারাই স্ত্রীলোক। ভাল—কোমৎ আপনাকে নীতিরাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা স্থির করিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট কর যাচ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই অতুল প্রতাপশালীকে যে মাদম ক্লোতিলড দেবো স্বীয় প্রতাপের আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাকে শী বলিব, না হি বলিব ? রোমক পত্তনের কৈসরগণ এক একজন পৃথিবীর রাজা, যে মৈসরী রাজ্ঞী ক্লিওপেটরা এরূপ তিনজন কৈসরের উপর রাজত্ব করিয়াছেন, তাঁহাকে শী বলিব, না হি বলিব ? বাস্তবিক জগতে কে হি, কে শী, তাহা স্থির করা যায় না। সেদিন কার্ত্তন হইতেছিল, যখন কীর্ত্তন-গায়িকা বলিল—“সিংহিনী হইয়া শিবাপদ সেবিব ?” এবং বঙ্গ নব্য-সম্প্রদায়েরা মন্ত্রস্তব্ধবৎ, চিত্তপুত্তলিকার ন্যায় তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, আমার বাস্তবিক সেই কীর্ত্তন-গায়িকাকে সিংহবৎ বোধ হইয়াছিল এবং সেই সমস্ত বাঙ্গালি যুবককেই আমি শিবাস্বরূপ মনে করিয়াছিলাম। তখন যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিত, এর কোন্‌গুলি হি, আর কোন্‌গুলিই বা শী ; তাহা হইলে আমি অবশ্য বলিতাম যে, সেই কীর্তনকারিণীই হি এবং তাঁহার জড়বৎ শ্রোতৃবর্গ ই শী। বাস্তবিক বঙ্গীয় যুবকেরা কোথাও হি, কোথাও শী, এবং সর্ব্বত্র বিকল্পে ইট্ হন। তাহার নিত্যবিধিও আছে। যথা ইয়ারকিতে হি, শয্যাগৃহে শী, এবং বিষয়কর্ম্মে ইট্। তাঁহারা বক্তৃতার সময হন হি, সাহেবের কাছে শী, মদ খাইলে হন ইট্। ফলে ইট্ যাহা হউক, হি, শীর বিষয়ে আমার আপনা আপনি অনেক সন্দেহ হয়। মধু চাটুয্যে আমার নাম সংযোগ করিয়া কি বিদ্রূপ করিয়াছিল বলিয়া, কে প্রসন্ন, স্বচ্ছন্দে পূর্ণদুগ্ধ-কুম্ভ তাহার মস্তকে নিক্ষেপ করিয়া,

চাটুয্যের বক্ষ-কবাটের বল পরীক্ষা করণার্থ কোনরূপ বিশেষ আয়ুধ প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, সে প্রসন্ন সংসারের মতে হইল শী—আর আমি—নসীবাবু কি না এক দিন বলিযাছিলেন যে—"চক্রবর্ত্তী ঝিমুতে ঝিমুতে আজ বিছানাটা পোড়ালে, একদিন একটা লঙ্কাকাণ্ড করিবে দেখ্‌ছি"—সেই ভয়ে আফিমের মাত্রা কমাইয়া দিলাম, সেই আমি হইলাম হি ? এইরূপ বিচারের জন্যই সংসারের সঙ্গে আমার বিবাদ বিসম্বাদ। ফল কথা যখন আমি নিজে হি, কি শী, তাহা নিশ্চয় করা দুষ্কর, তখন চন্দ্র হি, কিম্বা শী, তাহার স্থিরতা কি প্রকারে হইবে ? যদি চন্দ্র হি হয়েন, ত আমি শী—কেন না, আমার সহিত চন্দ্রের ভালবাসা জন্মিয়াছে। এবং আমার চন্দ্রকে বিবাহ করিতেই হইবে। আর আমি যদি প্রকৃত এক জন কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী হই, তাহা হইলে চন্দ্র শী। চন্দ্র বিলাতীয় মতে শী। আমি তাহা হইলে চন্দ্রকে বিলাতীয় মতে পাণিগ্রহণ করিব।

এখন নানা মতে নানা কার্য্য হইতেছে ; আমি বিজাতীয় মতে বিবাহ করিব। এখন দশাবতার দশকর্ম্মান্বিত হইয়াছেন। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ টেবিলের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছেন। নৃসিংহরাম কমলাকান্তরূপ দৈত্যকুলের প্রহ্লাদগণের আশ্রয়ীভূত হইয়াছেন। বামনাবতারে বঙ্গীয় যুবকগণ, আমার সোনারচাঁদ শশীকে স্পর্শ করিতে স্পর্দ্ধা করে। প্রথম রামের স্থানে ইঁহারা মাতৃ-সেবা, দ্বিতীয় রামের স্থানে পত্নী-সেবা, এবং শেষ রামের নিকটে বারুণী-সেবা শিক্ষা করিযাছেন। ইঁহারা বৌদ্ধ-মতে সংসারের অনিত্যতা স্থির করিয়া, কল্কিমতে সংহারমূর্তি ধারণ করিয়াছেন। এখনকার কালে শাক্ত-মতে ভোজ্য প্রস্তুত হইযা, তাহা শৈব-ত্রিশূলে বিদ্ধ করিয়া গলাধঃকরণ করিতে হয় ; তাহার পর সৌর পান সেবনীয়। আবার জিরুশালমের প্রথম গৌরাঙ্গের উপদেশ মত ভজনশালা করিতে হয়। মেজো গৌরাঙ্গ নবদ্বীপবাসীর মত হরিসংকীর্ত্তন করিতে হয়, রাধানগরের ছোট গৌরাঙ্গের মত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিতে হয়।

সুতরাং শশী, পূর্ণশশী, আজি আমি তোমাকে ইংরাজি মতে, শী স্থির করিয়া, হোস্ বাহালে সুস্থ শরীরে, খোস্ তবিয়তে ইচ্ছাপূর্ব্বক বিবাহ করিলাম। আমি পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে অন্যের বিনা সরিকতে তোমাতে ভোগ দখল করিতে থাকিব। ইহাতে তুমি কিম্বা তোমার স্থলাভিষিক্ত কেহ কখন কোন আপত্তি কর বা করে, তাহা নামঞ্জুর হইবে। তোমার সাতাইশটিতে আজ হইতে আমার সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকার হইল।

আর অমন করিয়া, পা টিপিয়া, পা টিপিয়া, ঢলে পড়িয়া রোহিণীর সঙ্গে কথা কহিলে কি হইবে ? আর অমন করে মুচ্‌কে হেসে পাতলা মেঘের ঘোমটা টেনে তর্ তর্ করিয়া কত দূর চলিয়া যাইবে ? ইতি কোর্টশিপ সমাপ্ত :—

এক্ষণে গান্ধর্ব্ব বিবাহ। আমি বরমাল্য প্রদান করিলাম, তুমি করমাল্য প্রদান কর।

কন্যাকর্ত্তা হৈল কন্যা, বরকর্ত্তা বর।
নিজ মন পুরোহিত, শ্মশানে বাসর ॥

এক বার হরি বল, ভাই! হরি হরি বোল।

আজ অবধি আর চন্দ্রকে দেখিয়া কমল মুদিত হইবে না। কমল ফুল্ল হইতে দেখিলে আর চন্দ্র ম্লান হইবে না। এই বার ভারতবর্ষীয় কবিগণের কবিত্ব লোপ হইল—পূর্ব্বে

কমল মুদিত আঁখি চন্দ্রেরে হেরিলে,
এখন
চন্দ্রেরে দেখিতে দেখ কমল আঁখি মিলে।
চন্দ্রের হৃদয়ে কালি কলঙ্ক কেবল,
কিন্তু
কমল হৃদয়ে চন্দ্র কেবল উজ্জ্বল।

আহা! আমি আমার চন্দ্রকে হারাইয়া দিয়াছি। বর বড়, না ক'নে বড়, এই দেখ, বর বড়—

চন্দ্রে সবে ষোল কলা হ্রাস বৃদ্ধি তায়,
চক্রবর্ত্তী পরিপূর্ণ এক কাঁদি কলায়।
সেই কলা কভু লুপ্ত কভু বর্ত্তমান।
কমলের বাগানের সব মর্ত্তমান।

দেখ শশী, এখন নির্জ্জন হইল। তোমাকে গোটাকত কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

তুমি তোমার রূপ-গৌরবে গর্ব্বিতা হইয়া যেখানে সেখানে ও রূপের ছড়াছড়ি করিও না। যখন পুত্র-শোকাতুরা মাতা বক্ষে করাঘাত করিয়া তোমার দিকে লক্ষ্য করিয়া ক্রন্দন করিতে থাকে, তখন তুমি তাহার কাছে রূপ দেখাইয়া কি করিবে? তখন কলঙ্কিনি! তোমার রূপরাশি গাঢ় মেঘান্তরালে লুক্কায়িত করিয়া রাখিও। যখন সংসারজ্বালাজালে লোকে দগ্ধ হইয়া তোমার দরবারে আসিয়া অভিযোগ করিবে, তখন তোমার সৌন্দর্য্য-বিকাশ তাহার কাছে করিও না; যে সংসারদগ্ধ, তাহার পক্ষে সে সৌন্দর্য্য তীব্র বিষক্ষেপরূপ হইবে। বরং রক্ত রাগে তাহার সহিত আলাপ করিও। যে সকলকে ঘৃণা করিয়াছে, কাহারও প্রীতি সে সহ্য করিতে পারে না। আর যে ঐহিক চরম সুখের সীমা উপলব্ধি করিয়া আত্মবিসর্জ্জনে প্রস্তুত

হইযাছে, তাহাকে আর বৃথা আশা দিয়া সান্ত্বনা করিও না। তুমি এক্ষণে আমার এক-ভোগ্যা, তুমি আর কি দেখাইয়া অপরকে সান্ত্বনা করিবে? কিন্তু কমলাকান্তের সময় অসময় নাই, ঘটন বিঘটন নাই, সুখ দুঃখ নাই। তুমি সর্ব্বদাই আমার নিকট আসিবে; তোমার নিজকথা আমাকে বলিবে, আমার কথা শুনিয়া যাইযা, আপনার অন্তরে আপনার অস্থি-মজ্জার সহিত সেই কথা মিশাইযা, রাখিয়া দিবে। তুমি জ্যোৎস্না রাত্রিতে আমার সহিত দেখা করিতে আসিও, ও কোমল কান্তি লইয়া অন্ধকারে বিচরণ করিও না। অদ্য আমাদের যে সুখের দিন, তাহা তুমি আমি ব্যতীত কে বুঝিতে পারিবে? অদ্য হইতে মাস গণনা করিযা, প্রতি মাসের শেষে আমরা এই গঙ্গাতীরে শষ্প-বাসর সমাপন করিব। সকল পূর্ণ মাসেই তুমি হঠাৎ আমার কাছে আগমন করিও না; পঞ্জিকাকারগণের সহিত দিন ক্ষণের পরামর্শ করিযা কমলাভিসারিণী হইও, নচেৎ একদিন রাহু তোমাকে পথিমধ্যে হঠাৎ মসীময়ী করিযা ক্লিষ্ট করিবে। আর এই বিবাহ-রাত্রিতে নব বধূকে অধিক উপদেশ প্রদান করিতে গেলে ধর্ম্ম-যাজকতার ভাণ হয। সুতরাং অলমতিবিস্তরেণ।

এখন একবার,

কমল শশীর বাসর ঘরে,
ডাক রে কোকিল পঞ্চম স্বরে।

এখন শশী, একবার এই মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইযা তরঙ্গের উপর অপ্সরা-ছাঁদে নৃত্য কর দেখি। একবার কাল মেঘের ভিতর বেগে দৌড়াইযা গিযা, একবার অনন্ত গগনের অনন্ত পথে উল্টাইয়া পড় দেখি! একবার গভীর মেঘে ক্ষুদ্র ছিদ্র করিযা রন্ধ্রপথে একচক্ষু দিযা আমার দিকে মধুর দৃষ্টিপাত কর দেখি! একবার নক্ষত্রে নক্ষত্রে কলহ বাধাইযা দিযা, তাহারা যেমন পরস্পর সংগ্রাম করিতে আসিবে, অমনি তাহাদের উভয দলের ব্যূহ বিদীর্ণ করিযা বেগে ধাবিত হও দেখি! একবার দ্রুত সঞ্চালনে শ্রান্তি বোধ করিয়া মুক্তাবিনিন্দিত স্বেদাবিন্দুসিক্ত কপালে ঘোমটা তুলিয়া দিযা গগনগবাক্ষে স্থির দৃষ্টিতে বসিযা বায়ু সেবন কর দেখি! একবার অজস্র সুধাবর্ষণ করিয়া চকোরচক্রের অপরিতৃপ্ত রসনার তৃপ্তি সাধন কর দেখি; একবার শুভক্ষণে কমলাকান্তের হৃদযে আবির্ভূত হও, কমলাকান্ত শযন করিল।

শশী, তুমি ক্ষীরোদ-সাগরজা ত্রিভুবন-বিহারিণী হইযাও বালিকা-স্বভাব-সুলভ অভিমানের ভজনা করিলে? কমলাকান্ত কোন্ দোষে দোষী বলিতে পারি না— কখন একবার স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ-জটিলতা-জাল-চ্ছেদনার্থ উদাহরণচ্ছলে প্রসন্নর নাম করিয়াছিলাম বলিয়া এত অভিমান আজিকার রজনীতে ভাল দেখায় না। দেখ

তুমি কলঙ্কিনী, তবু আমি তোমাকে গ্রহণ করিলাম। তোমাকে বিবাহ করিয়াছি বলিয়া অদ্যাবধি Lunatic* নাম ধরিলাম। জ্যোতির্ব্বিদেরা বলিয়া থাকেন, তুমি পাষাণী—তবু আমি তোমাকে বিবাহ করিলাম। তাঁহারা বলেন, তোমাতে মনুষ্যত্ব নাই, তবু আমি তোমাকে বিবাহ করিলাম। তবু রাগ?—তবে এই সংসার-গরল-খণ্ডন, এই গিরি-তরু-শিরসি-মণ্ডন, ঐ কর-লেখা আমার মাথায় তুলিয়া দাও। পার যদি, ঐ অনন্তনীল বৃন্দাবনে, মেঘের ঘোমটা একবার টানিয়া, একবার রাই মানিনী হইয়া বসো। আমি একবার স্ত্রীলোকের পায়ে ধরিয়া এ জড়জীবন সার্থক করিয়া লই।† আজি আমি শত দোষে দোষী হইলেও তোমা হইতেই আমার সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। তুমি আমার চান্দ্রায়ণের চন্দ্র-ফলক! আমার বৈতরণীর নবীন বৎস।

অমন করিলে আমি শত সহস্র বিবাহ করিব। এখন কমলাকান্ত নূতন বিবাহের রীতিপদ্ধতি শিক্ষা করিয়াছে। কমল এখন স্বয়ং বর, কর্ত্তা, পুরোহিত, ঘটক হইতে শিখিয়াছে। কমল এখন যেখানে সেখানে বিবাহ করিতে পারে। যখন দেখিব, নব পল্লবিকা শাখা-স্কন্ধ হইতে মুখ বাড়াইয়া করপত্র সঞ্চালনে আহ্বান করিতেছে, তখনই আমি তাহাকে বিবাহ করিব। যখন দেখিব, পদ্মমুখী স্বচ্ছ সরসী-দর্পণে আপনার মুখ বঙ্কিম গ্রীবায় নিরীক্ষণ করিয়া হাসিতেছে, তখনই আমি স্থলকমলে, জলকমলে মিশাইয়া দিব। যখন দেখিব, নির্ঝরিণী রামধনুক ধরিয়া আনিয়া তাহাই লোফালুফি করিয়া খেলা করিতেছে, তখনই তাহাকে সেই ধনুঃ স্পর্শ করাইয়া শপথ দিয়া আমার সঙ্গিনী করিয়া লইব। যখন দেখিব, অনন্ত শয্যায় স্বর্ণাদি মণিভূষায় শ্বেতাম্বরে ভূষিত হইয়া উত্তর দক্ষিণ শয়নে নিদ্রা যাইতেছে, তখনই তাহাকে পাণিগ্রহণে ধীরে ধীরে জাগরিত করিয়া অর্দ্ধাঙ্গের ভাগিনী করিব। যখন দেখিব, কুঞ্জলতা কানে ঝুমকা দোলাইয়া শ্যাম চিকুররাশি চারিদিকে ছড়াইয়া নিস্তব্ধভাবে মৃদু সৌর কিরণে ঈষত্তপ্ত হইতেছে, তখনই তাহার কেশগুচ্ছমধ্যে মস্তক সন্নিবেশিত করিয়া তাহার ঝুম্‌কা সরাইয়া দিয়া তাহার বরকে চিনাইয়া দিব। কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী এখন বিবাহ করিতে শিখিল, ঘটকালী শিখিল, আর কাহারও উপাসনা করিবে না। যদি তোমরা আমার পরামর্শে শ্রদ্ধা কর, ত আমার মত বিবাহ কর—আমি বেশ ঘটকালী জানি, তোমাদের মনের মত সামগ্রী মিলাইয়া দিব।

*চন্দ্রগ্রস্ত চাঁদে পাওয়া বা পাগল।

†আমি জানি, কমলাকান্ত একদিন প্রসন্ন গোয়ালার পায়ে ধরিয়াছেন। কিন্তু সে দুধের জন্য।

—শ্রীভীষ্মদেব।

সপ্তম সংখ্যা

বসন্তের কোকিল

তুমি বসন্তের কোকিল, বেশ লোক। যখন ফুল ফুটে, দক্ষিণ বাতাস বহে, এ সংসার সুখের স্পর্শে শিহরিয়া উঠে, তখন তুমি আসিয়া রসিকতা আরম্ভ কর। আর যখন দারুণ শীতে জীবলোকে থরহরি কম্প লাগে, তখন কোথায় থাক, বাপু? যখন শ্রাবণের ধারায় আমার চালাঘরে নদী বহে, যখন বৃষ্টির চোটে কাক চিল ভিজিয়া গোময় হয়, তখন তোমার মাজা মাজা কালো কালো দুলালী ধরণের শরীরখানি কোথায় থাকে? তুমি বসন্তের কোকিল, শীত বর্ষার কেহ নও।

রাগ করিও না—তোমার মত আমাদের মাঝখানে অনেকে আছেন। যখন নশীবাবুর তালুকের খাজনা আসে, তখন মানুষ-কোকিলে তাঁহার গৃহকুঞ্জ পুরিয়া যায়—কত টিকি, ফোঁটা, তেড়ি চসমার হাট লাগিয়া যায়, কত কবিতা, শ্লোক, গীত, হেটো ইংরেজি, মেটো ইংরেজি, চোরা ইংরেজি, ছেঁড়া ইংরেজিতে নশীবাবুর বৈঠকখানা পারাবত-কাকলি-সঙ্কুল গৃহসৌধবৎ বিকৃত হইয়া উঠে। যখন তাঁহার বাড়ীতে নাচ, গান, যাত্রা, পর্ব্ব উপস্থিত হয়, তখন দলে দলে মানুষ-কোকিল আসিয়া তাঁহার ঘর-বাড়ী আঁধার করিয়া তুলে—কেহ খায়, কেহ গায়, কেহ হাসে, কেহ কাশে, কেহ তামাক পোড়ায, কেহ হাসিয়া বেড়ায, কেহ মাত্রা চড়ায, কেহ টেবিলের নীচে গড়ায। যখন নশীবাবু বাগানে যান, তখন মানুষ-কোকিল, তাঁহার সঙ্গে পিপীড়ার সারি দেয়। আর যে রাত্রে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছিল, আর নশীবাবুর পুত্রটির অকালে মৃত্যু হইল, তখন তিনি একটি লোক পাইলেন না। কাহারও "অসুখ", এজন্য আসিতে পারিলেন না; কাহারও বড় সুখ—একটি নাতি হইয়াছে, এজন্য আসিতে পারিলেন না; কাহারও সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই, এজন্য আসিতে পারিলেন না; কেহ সমস্ত রাত্রি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, এজন্য আসিতে পারিলেন না। আসল কথা, সেদিন বর্ষা, বসন্ত নহে, বসন্তের কোকিল সেদিন আসিবে কেন?

তা ভাই বসন্তের কোকিল, তোমার দোষ নাই, তুমি ডাক। ঐ অশোকের ডালে বসিয়া রাঙ্গা ফুলের রাশির মধ্যে কালো শরীর, জলন্ত আগুনের মধ্যগত কালো বেগুনের মত, লুকাইয়া রাখিয়া, একবার তোমার ঐ পঞ্চম স্বরে, কু—উ বলিয়া ডাক। তোমার ঐ কু—উ রবটি আমি বড় ভালবাসি। তুমি নিজে কালো—পরান্নপ্রতিপালিত, তোমার চক্ষে সকলই "কু"—তবে যত পার, ঐ পঞ্চম স্বরে

ডাকিয়া বল, "কু—উ।" যখন এ পৃথিবীতে এমন কিছু সুন্দর সামগ্রী দেখিবে যে, তাহাতে আমার দ্বেষ, হিংসা, ঈর্ষ্যার উদয় হয়, তখনই উচ্চ ডালে বসিয়া ডাকিয়া বলিও, "কু—উ"—কেন না, তুমি সৌন্দর্য্যশূন্য, পরান্নপ্রতিপালিত। যখনই দেখিবে, লতা সন্ধ্যার বাতাস পাইয়া, উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত পুষ্প-স্তবক লইয়া দুলিয়া উঠিল, অমনি সুগন্ধের তরঙ্গ ছুটিল—তখনই ডাকিয়া বলিও, "কু—উঃ।" যখনই দেখিবে, অসংখ্য গন্ধরাজ এককালে ফুটিয়া আপনাদিগের গন্ধে আপনারা বিভোর হইয়া, এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে, তখনই তোমার সেই ডাল হইতে ডাকিয়া বলিও, "কু—উঃ।" যখন দেখিবে, বকুলের অতি ঘন-বিন্যস্ত মধুরশ্যামল স্নিগ্ধোজ্জ্বল পত্ররাশির শোভা আর গাছে ধরে না—পূর্ণযৌবনা সুন্দরীর লাবণ্যের ন্যায় হাসিয়া হাসিয়া, ভাসিয়া ভাসিয়া, হেলিয়া দুলিয়া, ভাঙ্গিয়া গলিয়া, উছলিয়া উঠিতেছে, তাহার অসংখ্য প্রস্ফুট কুসুমের গন্ধে আকাশ মাতিয়া উঠিতেছে—তখন তাহারই আশ্রয়ে বসিয়া, সেই পাতার স্পর্শে অঙ্গ শীতল করিয়া, সেই গন্ধে দেহ পবিত্র করিয়া, সেই বকুলকুঞ্জ হইতে ডাকিও, এ "কু—উঃ।" যখন দেখিবে, শুভ্র-মুখী, শুদ্ধশরীরা, সুন্দরী নব-মল্লিকা-সন্ধ্যা-শিশিরে সিক্ত হইয়া, আলোক-প্রাখর্য্যের হ্রাস দেখিয়া, ধীরে ধীরে মুখখানি খুলিতে সাহস করিতেছে—স্তরে স্তরে অসংখ্য অকলঙ্ক দল-রাজি বিকসিত করিবার উপক্রম করিতেছে,—যখন দেখিবে যে, ভ্রমর সে রূপ দেখিয়া—"আদরেতে আগুসারি"—কণ্ঠভরা গুন্‌গুন্ মধু ঢালিয়া দিতেছে—তখন, হে কালামুখ! আবার "কু—উঃ" বলিয়া ডাকিয়া মনের জ্বালা নিবাইও! আর যখনই গৃহস্থের গৃহপ্রাঙ্গণস্থ দাড়িম্বশাখায় বসিয়া দেখিবে, সেই গৃহপুষ্পরূপিণী কন্যাগণে সেই লতার দোলনি, সেই গন্ধরাজের প্রস্ফুটতা, সেই বকুলের রূপোচ্ছ্বাস, সেই মল্লিকার অমলতা, একাধারে মিলিত করিয়াছে, তখনই তাহাদের মুখের উপর, ঐ পঞ্চম-স্বরে, গৃহপ্রাচীর প্রতিধ্বনিত করিয়া, সবাইকে ডাকিয়া বলিও, এত রূপ, এত সুখ, এত পবিত্রতা—এ "কু—উঃ!" ঐটি তোমার জিত—ঐ পঞ্চম-স্বর! নহিলে তোমার ও কু—উ কেহ শুনিত না। এ পৃথিবীতে গ্লাডষ্টোন, ডিস্রেলি প্রভৃতির ন্যায়,—তুমি কেবল গলাবাজিতে জিতিয়া গেলে—নহিলে অত কালো চলিত না; তোমার চেয়ে হাঁড়িচাচা ভাল। গলাবাজির এত গুণ না থাকিলে, যিনি বাজে নবেল লিখিয়াছেন, তিনি রাজমন্ত্রী হইবেন কেন? আর জন ষ্টুয়ার্ট মিল পার্লিয়ামেণ্টে স্থান পাইলেন না কেন?

তবে, কোকিল, তুমি প্রকৃতির মহা-পার্লিয়ামেণ্টে দাঁড়াইয়া নক্ষত্রময় নীল-চন্দ্রাতপমণ্ডিত, গিরিনদীনগরকুঞ্জাদি বেঞ্চে সুসজ্জিত, ঐ মহাসভা-গৃহে, তোমার এ মধুর পঞ্চম-স্বরে—কু—উঃ বলিয়া ডাক—সিংহাসন হইতে হষ্টিংস পর্য্যন্ত সকলেই

কাঁপিয়া উঠুক। "কু—উঃ!". ভাল, তাই; ও কলকণ্ঠে কু বলিলে কু মানিব, সু বলিলে সু মানিব। কু বৈ কি? সব কু। লতায় কণ্টক আছে; কুসুমে কীট আছে; গন্ধে বিষ আছে; পত্র শুষ্ক হয়, রূপ বিকৃত হয়, স্ত্রীজাতি বঞ্চনা জানে। কু—উঃ বটে—তুমি গাও। কিন্তু তুমি ঐ পঞ্চম-সুরে কু বলিলেই কু মানিব—নচেৎ কুঁকড়ো বাবাজি "কু কু কু কু" বলিয়া আমার সুখের প্রভাত নিদ্রাকে কু বলিলে আমি মানিব না। তার গলা নাই। গলাবাজিতে সংসার শাসিত হয় বটে, কিন্তু কেবল চেঁচাইলে হয় না; যদি শব্দ-মন্ত্রে সংসার জয় করিবে, তবে তোমার স্বরে পঞ্চম লাগে—বে-পর্দা বা কড়িমধ্যমের কাজ নয়। সর্ জেমস্ মাকিণ্টশ্, তাঁহার বক্তৃতায় ফিলজফির* কড়িমধ্যম মিশাইয়া হারিয়া গেলেন—আর মেকলে রেটরিকের† পঞ্চম লাগাইয়া জিতিয়া গেলেন। ভারতচন্দ্র আদিরস পঞ্চমে ধরিয়া জিতিয়া গিয়াছেন—কবিকঙ্কণের ঋষভ-স্বর কে শুনে? দেখ, লোকের বৃদ্ধ পিতা মাতার বেসুরো বক-বকিতে কোন্ ফল দর্শে? আর যখন বাবুর গৃহিণী বাবুর সুর বাঁধিয়া দিবার জন্য বাবুর কান টিপিয়া ধরিয়া পঞ্চমে গলার আওয়াজ দেন, তখন বাবু পিড়িং পিড়িং বলেন, কি না?

তবে তোমার স্বরকে পঞ্চম-স্বর কেন বলে, তাহা বুঝি না। যাহা মিষ্ট, তাহাই পঞ্চম? দুইটি পঞ্চম মিষ্ট বটে,—সুরের পঞ্চম, আলতাপরা ছোট পায়ের গুজ্‌রী পঞ্চম। তবে, সুর, পঞ্চমে উঠিলেই মিষ্ট; পায়ের পঞ্চম, পা হইতে নামাইলেই মিষ্ট।

কোন্ স্বর পঞ্চম, কোন্ স্বর সপ্তম, কে মধ্যম, কে গান্ধার, আমাকে কে বুঝাইয়া দিবে? এটি হাতীর ডাক, ওটি ঘোড়ার ডাক, সেটি ময়ূরের কেকা, ওটি বানরের কিচিমিচি, এ বলিলে ত কিছু বুঝিতে পারি না। আমি আফিংখোর—বেসুরো শুনি, বেসুরো বুঝি, বেসুরো লিখি—ধৈবত গান্ধার নিষাদ পঞ্চমের কি ধার ধারি? যদি কেহ পাখোয়াজ তানপুরা দাড়ী দাঁত লইয়া আমাকে সপ্ত সুর বুঝাইতে আসে, তবে তাহার গর্জ্জন শুনিয়া, মঙ্গলা গাইয়ের সন্তঃপ্রসূত বৎসের ধ্বনি আমার মনে পড়ে—তাহার পীতাবশিষ্ট নির্জ্জল দুগ্ধের অনুধ্যানে মন ব্যস্ত হয়—সুর বুঝা হয় না। আমি গায়কের নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি, যেন তিনি জন্মান্তরে মঙ্গলার বৎস হন।

এখন আয়, পাখী! তোতে আমাতে একবার পঞ্চম গাই। তুইও যে, আমিও সে—সমান দুঃখের দুঃখী, সমান সুখের সুখী। তুই এই পুষ্পকাননে, বৃক্ষে বৃক্ষে

* দর্শন

† অলঙ্কার।

আপনার আনন্দে গাইয়া বেড়াস—আমিও এই সংসার-কাননে, গৃহে গৃহে, আপনার আনন্দে এই দপ্তর লিখিয়া বেড়াই—আয়, ভাই, তোতে আমাতে মিলেমিশে পঞ্চম গাই। তোরও কেহ নাই—আনন্দ আছে, আমারও কেহ নাই—আনন্দ আছে। তোর পুঁজিপাটা ঐ গলা; আমারও পুঁজিপাটা এই আফিঙ্গের ডেলা; তুই এ সংসারে পঞ্চম-স্বর ভালবাসিস—আমিও তাই; তুই পঞ্চম-স্বরে কারে ডাকিস্? আমিই বা কারে? বল্ দেখি, পাখী, কারে?

যে সুন্দর, তাকেই ডাকি; যে ভাল, তাকেই ডাকি। যে আমার ডাক শুনে, তাকেই ডাকি। এই যে আশ্চর্য্য ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইয়া আছি, ইহাকেই ডাকি। এই অনন্ত সুন্দর জগৎ-শরীরে যিনি আত্মা, তাঁহাকে ডাকি। আমিও ডাকি, তুইও ডাকিস। জানিয়া ডাকি, না জানিয়া ডাকি, সমান কথা; তুইও কিছু জানিস না, আমিও জানি না; তোরও ডাক পৌঁছিবে, আমারও ডাক পৌঁছিবে। যদি সর্ব্বশব্দগ্রাহী কোন কর্ণ থাকে, তবে তোর আমার ডাক পৌঁছিবে না কেন? আয়, ভাই, একবার মিলেমিশে দুইজনে পঞ্চম-স্বরে ডাকি।

তবে, কুহুরবে সাধা গলায়, কোকিল একবার ডাক্ দেখি রে! কণ্ঠ নাই বলিয়া আমার মনের কথা কখন বলিতে পাইলাম না। যদি তোর ও ভুবন-ভুলান স্বর পাইতাম, ত বলিতাম। তুই আমার সেই মনের কথা প্রকাশ করিয়া দিয়া এই পুষ্পময় কুঞ্জবনে একবার ডাক দেখি রে! কি কথাটি বলিব বলিব মনে করি, বলিতে জানি না, সেই কথাটি তুই বল্ দেখি রে। কমলাকান্তের মনের কথা, এজন্মে বলা হইল না—যদি কোকিলের কণ্ঠ পাই—অমানুষী ভাষা পাই, আর নক্ষত্রদিগকে শ্রোতা পাই, তবে মনের কথা বলি। ঐ নীলাম্বরমধ্যে প্রবেশ করিয়া, ঐ নক্ষত্রমণ্ডলীমধ্যে উড়িয়া, কখন কি কুহু বলিয়া ডাকিতে পাইব না? আমি না পাই, তুই কোকিল আমার হয়ে এক বার ডাক্ দেখি রে?

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী

অষ্টম সংখ্যা

স্ত্রীলোকের রূপ

অনেক ভামিনী রূপের গৌরবে পা মাটিতে দেন না। ভাবেন, যে দিক্ দিয়া অঙ্গ দোলাইয়া চলিয়া যান, লাবণ্যের তরঙ্গে সে দিকের সংজ্ঞা ডুবিয়া যায়; নূতন জগতের সৃষ্টি হয়। তাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের রূপের ঝড় যে দিকে বয়,

সেদিকে সকলের ধৈর্য্য-চালা উড়িয়া যায়, ধর্ম্ম-কোটা ভাঙ্গিয়া পড়ে; যখন পুরুষের মন-চড়ায় তাঁহাদের রূপের বান ডাকে, তখন তাঁহাদের কর্ম্ম-জাহাজ, ধর্ম্ম-পান্সী, বুদ্ধি-ডিঙ্গি, সব ভাসিয়া যায়। কেবল সৌন্দর্য্যাভিমানিনী কামিনীকুলেরই এইরূপ প্রতীতি নহে; পুরুষেরাও যখন মহিলাগণের মোহিনী শক্তির বশীভূত হইয়া তাঁহাদিগের রূপের মহিমা বর্ণনারম্ভ করেন, তখন যে তাঁহারাও কি বলেন, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তখন গগনের জ্যোতিষ্ক, পৃথিবীর পর্ব্বত, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, লতা, গুল্মাদি সকলকেই লইয়া উপমার জন্য টানাটানি পাড়ান—আবার অনেককেই অপমানিত করিয়া পাঠান। রূপসীর মুখমণ্ডলের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহারা পূর্ণশশীকে নিমন্ত্রণ করিয়া আবার মসীবৎ ম্লান বলিয়া ফেরত পাঠান; গরিব চাঁদ, আপনার কলঙ্ক আপনি বুকে করিয়া রাতারাতি আকাশের কাজ সারিয়া পলায়ন করে। সুন্দরীর ললাটের সিন্দূরবিন্দু দেখিয়া তাঁহারা উষার সীমন্ত-শোভা তরুণ তপনের নিন্দা করেন; রাগে সূর্য্যদেব, পৃথিবী দগ্ধ করিয়া চলিয়া যান। রসময়ীর আস্যের হাস্যরাশি অবলোকন কয়িয়া প্রফুল্ল কমলে সৌর-রাশ্মির লাস্য বা বিকসিত কুমুদে কৌমুদীর নৃত্য তাঁহারা আর ভালবাসেন না; সেই অবধি কমল কুমুদে কীট পতঙ্গের অধিকার। কামিনীর কণ্ঠহার নিরীক্ষণ করিয়া তাহারা নিশার তারকামালার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন; বোধ করি, ভবিষ্যতে জ্যোতিষের অনুশীলন ত্যাগ করিয়া, তাঁহারা স্বর্ণকারের বিদ্যায় মন দিবেন। রঙ্গিণীর শরীর-সঞ্চালনে তাঁহারা এত লাবণ্যলীলা বিলোকন করেন যে, জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে মন্দ মন্দ আন্দোলিত বৃক্ষপত্রে বা নিয়ত কম্পিত সিন্ধু-হিল্লোলে চন্দ্রিকার খেলায় তাঁহাদিগের আর মন উঠে না। এইজন্যই বা, রাত্রে নিদ্রা যান, এবং নদীকে কলসী কলসী করিয়া শুষিতে থাকেন। আবার যখন রমণীর নয়ন বর্ণন করেন, তখন সরোবরের মলয়-মারুতে দোদুল্যমান নীলোৎপল দূরে থাকুক, বিশ্বমণ্ডলের কিছুই তাঁহাদিগের ভাল লাগে না।

এই নারীমূর্ত্তির স্তাবককুলের উপমানুভবশক্তির কিছু প্রশংসা করিতে হয়। এক চক্ষু, তাঁহাদিগের কল্পনাপ্রভাবে কখন পক্ষী, যথা খঞ্জন, চকোর; কখন মৎস্য, যথা সফরী; কখন উদ্ভিদ্, যথা পদ্ম, পদ্মপলাশ, ইন্দীবর; কখন জড় পদার্থ, যথা আকাশের তারা। এক চন্দ্র, কখনও রমণীর মুখমণ্ডল, কখনও তাহার পায়ের নখর।*

---

* আমার বিবেচনায় চন্দ্রের সহিত নখরের তুলনা অতি সুন্দর—কেন না, উত্তম পদবিন্যাস হইতে পারে—যথা, নখর-নিকর হিমকর-করম্বিত কোকিল-কূজিত কুঞ্জকুটীরে।—এটি আমার নিজের রচনা।

—শ্রীভীষ্মদেব।

উচ্চ কৈলাস-শিখর, এবং ক্ষুদ্র কোমল কোরক, একেরই উপমাস্থল ; কিন্তু ইহাতেও কুলায় না বলিয়া দাড়িম্ব, কদম্ব, করিকুম্ভ এই বিষম উপমাশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছে। জলচর ক্ষুদ্র পক্ষী হংস, এবং স্থলচর প্রকাণ্ড চতুষ্পদ হস্তী, ইহাদিগের গমনে বৈষম্য থাকাই স্বাভাবিক উপলব্ধি ; কিন্তু কবিদিগের চক্ষে উভয়েই রমণী-কুল-চরণ-বিন্যাসের অনুকারী। আবার যে সে হাতীর গমনের সহিত, এই হংসগামিনীদিগের গমনসাদৃশ্য নির্দ্দেশ করা বিধেয় নহে, যে হাতী হাতীর রাজা, সেই হাতীর সঙ্গেই গজেন্দ্র-গামিনীগণের গতি তুলনীয়। শুনিয়াছি হাতী একদিনে অনেক দূর যাইতে পারে ; অশ্বাদি কোন পশু তত পারে না। যাঁহাদিগকে দূরে যাইতে হয়, তাঁহারা এই গজেন্দ্রগামিনীদিগের পিঠে চড়িয়া যান কেন? যেদিকে রেলওয়ে হয় নাই, সে দিকে বাছিয়া বাছিয়া গজগামিনী মেয়ের ডাক বসাইলে কেমন হয়?

আমিও এককালে কামিনীভক্ত কবিদলভুক্ত ছিলাম। আমি তখন এই অখিল সংসারে রমণীর ন্যায় সুন্দর বস্তু আর দেখিতে পাইতাম না। চম্পক, কমল, কুন্দ, বন্ধুজীব, শিরীষ, কদম্ব, গোলাপ প্রভৃতি পুষ্পচয় তখন কামিনী-কান্তি-গ্রথিত কুসুম-মালিকার ন্যায় মনোহর বোধ হইত না। বলিতে কি, বসন্তের কুসুমবতী বসুমতী অপেক্ষাও আমি কুসুমময়ী মহিলাকে ভালবাসিতাম ; বর্ষার উচ্ছ্বসিত-সলিলা চিররঙ্গিণী তরঙ্গিণী অপেক্ষাও রসবতী যুবতীর পক্ষপাতী ছিলাম। কিন্তু এক্ষণে আর আমার সে ভাব নাই। আমার দিব্যজ্ঞান হইয়াছে। আমি মায়াময়ী মানবীমণ্ডলের কুহক-জাল ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া পলায়ন করিয়াছি। জালিয়ার পচা জালে রাঘব বোয়াল পড়িলে, যেমন জাল ছিঁড়িয়া পলায়ন করে, আমি তেমনি পলায়ন করিয়াছি ; ক্ষুদ্র মাকড়সার জালে যেমন গুব্‌রে পোকা পড়িলে জাল ছিঁড়িয়া পলায়ন করে, আমি তেমনি পলায়ন করিয়াছি ; দুরন্ত গোরু একবার দড়ি ছিঁড়িতে পারিলে যেমন উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে, আমি তেমনি দৌড় মারিয়া পলায়ন করিয়াছি। সকলই আফিমের প্রসাদে! হে মাতঃ আফিম দেবি! তোমার কৌটা অক্ষয় হউক ; তুমি বৎসর বৎসর সোণার জাহাজে চড়িয়া চীনদেশে পূজা খাইতে যাও! জাপান, সাইবিরিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা সকলই তোমার অধিকারভুক্ত হউক ; তোমার নামে দেশে দেশে দুর্গোৎসব হউক। কমলাকান্তকে পায়ে রাখিও। আমি তোমার কৃপায় সাধারণের উপকারার্থে নিজের মন খুলিয়া দুই চারিটি কথা বলিব।

কথা শুনিয়া কেবল স্ত্রীলোক কেন, অনেক পুরুষেও আমাকে পাগল বলিবেন। বলুন, ক্ষতি নাই। নূতন কথা যে বলে, সেই পাগল বলিয়া গণ্য হয়।

গ্যালিলিও* বলিলেন, পৃথিবী ঘুরিতেছে। ইতালীয় ভদ্র সমাজ, ধার্ম্মিক সমাজ, বিদ্বান্ সমাজ শুনিয়া হাসিলেন; শুনিয়া স্থির করিলেন, গ্যালিলিওর মতিভ্রম হইয়াছে। কালের স্রোত বহিয়া গেল। ইতালীয় ভদ্র সমাজ, ধার্ম্মিক সমাজ, বিদ্বান্ সমাজ আর পৃথিবী ঘুরিতেছে শুনিলে হাসেন না; গ্যালিলিওকে আর মতিভ্রান্ত জ্ঞান করেন না।

সকলে সৌন্দর্য্য বিষয়ে স্ত্রীলোকের প্রাধান্য স্বীকার করেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, বলে পুরুষের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার পাইয়াও, রূপের টীকা স্ত্রীলোকের মস্তকে দেন। আমার বিবেচনায় এটি মস্ত ভুল। আমি দিব্য চক্ষে দেখিয়াছি যে, পুরুষের রূপ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের রূপ অনেক দূর নিকৃষ্ট। হে মানময়ী মোহিনীগণ! কুটিল কটাক্ষে কালকূট বর্ষণ করিয়া আমাকে এই দোষে দগ্ধ করিও না; কালসর্পী-বিনিন্দিত বেণীদ্বারা আমাকে বন্ধন করিও না, ভ্রূ-ধনুতে কোপে তীক্ষ্ণ শর যোজনা করিয়া আমাকে বিদ্ধ করিও না। বলিতে কি, তোমাদের নিন্দা করিতে ভয় করে। পথ বুঝিয়া যদি তোমরা নথ-ফাঁদ পাতিয়া রাখ, তবে কত হস্তী বদ্ধচরণ হইয়া, তোমাদের নাকে ঝুলিতে পারে—কমলাকান্ত কোন্ ছার! তোমাদের নথের নোলক খসিয়া পড়িলে, মানুষ খুন হইবার অনেক সম্ভাবনা; চন্দ্রহারের একখানি চাঁদ যদি স্থানচ্যুত হইয়া কাহারও গায়ে লাগে, তবে তাহার হাত-পা ভাঙ্গা বিচিত্র নহে। অতএব তোমরা রাগ করিও না। আর হে রমণীপ্রিয়, কল্পনাপ্রিয়, উপমাপ্রিষ কবিগণ, তোমাদিগের স্ত্রীদেবীর সুখময়ী সুবর্ণময়ী প্রতিমা ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া, তোমরা আমাকে মারিতে উদ্যত হইও না। আমি সপ্রমাণ করিয়া দিব যে, তোমরা কুসংস্কারাবিষ্ট পৌত্তলিক। তোমার উপাস্য দেবতার প্রকৃত মূর্ত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রতিমূর্ত্তির পূজা করিতেছ।

যাহার সুন্দর কেশপাশ আছে, সে আর পরচুলা ব্যবহার করে না। যাহার উজ্জ্বল ভাল দাঁত আছে, তাহার কৃত্রিম দন্তের প্রয়োজন হয় না। যাহার বর্ণে লোকের মন হরণ করে, তাহার আর রং মাখিয়া লাবণ্য বৃদ্ধি করিতে হয় না। যাহার নয়ন আছে, তাহার আর কাচের চক্ষুর আশ্রয় লইতে হয় না। যাহার চরণ আছে, তাহাকে আর কাষ্ঠপদ অবলম্বন করিতে হয় না। এইরূপ যাহার যে বস্তু আছে সে তাহার জন্য লালায়িত হয় না। যে বুঝিতে পারে যে, প্রকৃতি কোন পদার্থে তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন, সেই তদ্বিষয়ে আপনার অভাব মোচনার্থে যত্ন করিয়া থাকে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমি স্থির করিয়াছি যে, স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সৌন্দর্য্যের অত্যন্ত অভাব। তাহারা সর্ব্বদা আপন আপন রূপ বাড়াইতে ব্যস্ত; কি

* কোপর্নিকস্ P. D.

উপায়ে আপনাকে সুন্দরী দেখাইবে, ইহা লইয়াই উন্মাদিনী ; ভাল ভাল অলঙ্কার কিসে পাইবে, নিয়ত ইহাই তাহাদিগের ভাবনা, ইহাই তাহাদিগের চেষ্টা ; এমন কি বলা যাইতে পারে যে, অলঙ্কারই তাহাদিগের জপ, অলঙ্কারই তাহাদিগের তপ, অলঙ্কারই তাহাদিগের ধ্যান, অলঙ্কারই তাহাদিগের জ্ঞান। স্বীয় দেহ সজ্জিত করিতে এত যাহাদিগের যত্ন, তাহাদিগের প্রকৃত সৌন্দর্য্য যে অধিক আছে এরূপ বোধ হয় না। যাহার নাক সুন্দর নহে, সেই নাকে নথরূপ রজ্জুতে নোলক জগন্নাথকে দোলায় ; যাহার কান সুন্দর নহে, সেই ঢাকাই-কানরূপ নানা ফলফুল পশুপক্ষীবিশিষ্ট বাগানের যোড়া কানে ঝুলাইয়া দেয়। যাহার হৃদয় ভাল নহে, সেই সেখানে সাতনর ফাঁসির দড়ি টাঙ্গাইয়া পুরুষজাতির, বিশেষতঃ স্তন্যপায়ী বালকদিগের ভীতি বিধান করে। যে অলঙ্কার বিনাও আপনাকে সুন্দরী বলিয়া জানে, সে কখন অলঙ্কারের বোঝা বহিতে এত ব্যগ্র হয় না। পুরুষে ভূষণ বিনা সন্তুষ্ট থাকে ; স্ত্রীলোক ভূষণ বিনা মনুষ্যসমাজে মুখ দেখাইতে লজ্জা পায়। অতএব স্ত্রীলোকদিগের নিজের ব্যবহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীজাতি সৌন্দর্য্য বিষয়ে নিকৃষ্ট।

স্ত্রীজাতি অপেক্ষা যে পুরুষজাতির সৌন্দর্য্য অধিক, প্রকৃতির সৃষ্টি-পদ্ধতি সমালোচনা করিয়া দেখিলে আরও স্পষ্ট প্রতীতি হইবে। যে বিস্তীর্ণ চন্দ্রককলাপ দেখিয়া জলদমুকুট ইন্দ্রধনু হারি মানে, সে চন্দ্রককলাপ ময়ূরের আছে ; ময়ূরীর নাই। যে কেশরে সিংহের এত শোভা, তাহা সিংহীর নাই। যে ঝুটিতে বৃষভের কান্তি বৃদ্ধি করে, গাভীর তাহা নাই। কুক্কুটের যেমন সুন্দর তাম্রচূড়া ও পক্ষ সকল আছে, কুক্কুটীর তেমন নাই। এইরূপ দেখিতে পাইবে যে, উচ্চ শ্রেণীর জীবদিগের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ সুশ্রী। মনুষ্য সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তা যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছেন, এমন বোধ হয় না। হে মূল "বিদ্যাসুন্দর"-কার! তোমার মনে কি এই তত্ত্বটি উদিত হইয়াছিল? এইজন্যই কি তুমি নায়কের নাম সুন্দর রাখিয়াছিলে? তুমি কি বুঝিয়াছিলে যে, স্ত্রীলোক যত কেন বিদ্যাবতী হউক না পুরুষের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও বুদ্ধির নিকটে তাহাকে পরাভব স্বীকার করিতে হইবে।

সৌন্দর্য্যের বাহার যৌবনকালে। কিন্তু, রূপান্ধ ভামিনীগণ! তোমাদিগের যৌবন কতক্ষণ থাকে? জোয়ারের জলের মত আসিতে আসিতেই যায়। কুড়ি হইলেই তোমরা বুড়ী হইলে। অল্পদিনের মধ্যেই তোমাদিগের সকল অঙ্গ শিথিল হইয়া পড়ে। বয়স আসিয়া শীঘ্রই তোমাদিগের গলার লাবণ্য-মালা ছিঁড়িয়া লয়। চল্লিশ পঁয়তাল্লিশে পুরুষের যে শ্রী থাকে, বিশ পঁচিশের ঊর্দ্ধে তোমাদিগের তাহা

থাকে না। তোমাদিগের রূপের স্থিতি সৌদামিনীর ন্যায়, ইন্দ্রধনুর ন্যায়, মুহূর্ত্তের জন্য না হউক, অত্যল্পকালের জন্য সন্দেহ নাই। যাহারা রূপোপভোগে উন্মত্ত, আমি আহারে বসিলেই তাহাদের যন্ত্রণা অনুভূত করিতে পারি; আমার জীবনে ঘোর দুঃখ এই যে, অন্নব্যঞ্জন পাতে দিতে দিতেই ঠাণ্ডা হইয়া যায়। তেমনি, স্ত্রীলোকের সৌন্দর্যরূপ বুকৃড়ি চালের ভাত, প্রণয়-কলাপাতে ঢালিতে ঢালিতে ঠাণ্ডা হইযা যায়—আর কাহার সাধ্য খায়? শেষে বেশভূষারূপ তেঁতুল মাখিয়া, একটু আদর-লবণের ছিটা দিয়া, কোনরূপে গলাধঃকরণ করিতে হয়।

হে সৌন্দর্য্যগর্ব্বিত কামিনীকুল! সত্য করিয়া বল দেখি, এইরূপ ক্ষণস্থায়ী বলিয়াই কি তোমাদিগের রূপের এত আদর? ভাল করিয়া দেখিতে না দেখিতে, ভাল করিয়া উপভোগ করিতে না করিতে অন্তর্হিত হইযা যায় বলিয়া তোমাদিগের রূপের জন্য কি পুরুষেরা পিপাসিত চাতকের ন্যায় উন্মত্ত? অপরিজ্ঞাত হারাধন বলিয়াই কি তোমরা উহার প্রকৃত মূল্য নির্ণযে অশক্ত? কেবল ক্ষণস্থায়ী পদার্থ বলিয়া নয়, অপর কারণেও স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করে! যে সকল গ্রন্থকারদিগের মত ভূমণ্ডলে গ্রাহ্য হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই পুরুষ, এ কারণে আমার বিবেচনায় অনুরাগনেত্রে কামিনীকুলের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কথাই আছে, "যার যাতে মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোব।" যে রমণীগণ প্রণয়ের পদার্থ, তাহাদিগকে কে সহজ চক্ষুতে দেখিবে? সুন্দর মুকুরের প্রভাবে দৃষ্ট বস্তু কুৎসিত হইলেও সুন্দর দেখাইবে। মনোমোহিনীর রূপ নিরীক্ষণকালে তাহাকে প্রীতির অঞ্জনে মাখাইয়া দেখিব। পুরুষাপেক্ষা তাহার মাধুর্য্য কেন না অধিক বোধ হইবে?

হে প্রণয়দেব, পাশ্চাত্ত্য কবিরা তোমাকে অন্ধ বলিয়াছেন। কথাটা মিথ্যা নয়। তোমার প্রভাবে লোকে প্রিয়বস্তুর দোষ দেখিতে পায় না। তোমার অঞ্জনে যাহার নেত্র রঞ্জিত হইয়াছে, সে বিশ্ববিমোহন পদার্থ-পরম্পরায় পরিবৃত থাকে। বিকট মূর্ত্তিকে সে মনোহর দেখে। কর্কশ স্বরকে সে মধুময় ভাবে। প্রেতিনীর অঙ্গ-ভঙ্গীতে মৃদু-মন্দ মলয়-মারুতে দোদুল্যমানা ললিতলবঙ্গলতার লাবণ্যলীলা অপেক্ষাও সুখকরী জ্ঞান করে। এইজন্যই চীনদেশে খাঁদা নাকের আদর। এইজন্যই বিলাতী বিবিদের রাঙ্গা চুল ও বিড়াল চোখের আদর। এইজন্যই কাফ্রিদেশে স্থূল ওষ্ঠাধরের আদর। এজন্যই বাঙ্গলাদেশের উল্কি-চিত্রিত মিশি-কলঙ্কিত চাঁদবদনের আদর। এজন্যই মানবসমাজে স্ত্রীরূপের আদর। আর যদি স্ত্রীলোকেরা পুরুষের ন্যায় মনের কথা মুখে আনিতেন, তাহা হইলে হে প্রণয়দেব,

নিজের গুণে হউক না হউক, অন্ততঃ তোমার গুণেও আমরা শুনিতে পাইতাম যে, পুরুষের সৌন্দর্য্যের কাছে স্ত্রীলোকের রূপ কিছুই নয়। যদিও অন্তরের গুপ্ত ভাব বাক্যদ্বারা ব্যক্ত করিতে মহিলাগণ অত্যন্ত সঙ্কুচিতা তথাপি কার্য্যদ্বারা তাহাদিগের আন্তরিক গূঢ় তত্ত্বগুলি কিয়ৎপরিমাণে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কে না দেখিয়াছে যে, সুন্দরীরা পরস্পরের সৌন্দর্য্য স্বীকার করিতে চাহেন না, অথচ পুরুষের ভক্ত হইয়া বসেন? ইহাতে কি বুঝাইতেছে না যে, মনে মনে তাঁহারা স্ত্রীলোকের রূপাপেক্ষা পুরুষের রূপের পক্ষপাতিনী?

রূপ, রূপ করিয়া স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। সকলেই ভাবে রূপই কামিনীকুলের মহামূল্য ধন, রূপই কামিনীকুলের সর্ব্বস্ব। সুতরাং মহিলাগণ যাহা কিছু কাম্য বস্তুর প্রার্থনা করেন, লোকে কেবল রূপের বিনিময়েই দিতে চায়। ইহাতেই মনুষ্যসমাজের কলঙ্ক বারাঙ্গনা-বর্গের সৃষ্টি। ইহাতেই পরিবারমধ্যে স্ত্রীলোকের দাসীত্ব।

অস্থায়ী সৌন্দর্য্যই যোষিদ্‌মণ্ডলীর একমাত্র সম্বল, সংসার সাগর পার হইবার একমাত্র কাণ্ডারী, একথা আর আমি শুনিতে চাহি না। অনেকদিন শুনিয়াছি। শুনিয়া কান ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে। শুনিতে আর পারি না। আমি শুনিতে চাই যে, নারীজাতির রূপাপেক্ষা শত গুণে, সহস্র গুণে, লক্ষ গুণে, কোটি গুণে মহত্ত্বের গুণ আছে। আমি শুনিতে চাই যে, তাঁহারা মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতা, ও ভক্তি ও প্রীতি। যাঁহারা দেখিয়াছেন যে, কত কষ্ট সহ্য করিয়া জননী সন্তানের লালন পালন করেন, যাঁহারা দেখিয়াছেন যে, কত যত্নে মহিলাগণ পীড়িত আত্মীয়বর্গের সেবা শুশ্রূষা করেন, তাঁহারা কামিনীকুলের সহিষ্ণুতার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছেন। যাঁহারা কখন কোন সুন্দরীকে পতি পুত্রের জন্য জীবন বিসর্জ্জন, ধর্ম্মের জন্য বাহ্য সুখ বিসর্জ্জন করিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা কিয়দ্দূর বুঝিয়াছেন যে, কিরূপ প্রীতি ও ভক্তি স্ত্রীহৃদয়ে বসতি করে।

যখন আমি উৎকৃষ্টা যোষিদ্বর্গের বিষয়ে চিন্তা করিতে যাই, তখনই আমার মানস-পটে, সহমরণপ্রবৃত্তা সতীর মূর্ত্তি জাগিয়া উঠে। আমি দেখিতে পাই যে, চিতা জ্বলিতেছে, পতির পদ সাদরে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনমধ্যে সাধ্বী বসিয়া আছেন। আস্তে আস্তে বহ্নি বিস্তৃতি হইতেছে, এক অঙ্গ দগ্ধ করিয়া অপর অঙ্গে প্রবেশ করিতেছে? অগ্নিদগ্ধ স্বামিচরণ ধ্যান করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে হরিবোল বলিতে বলিতেছেন বা সঙ্কেত করিতেছেন। দৈহিক ক্লেশ পরিচায়ক

লক্ষণ নাই। আনন প্রফুল্ল। ক্রমে পাবকশিখা বাড়িল, জীবন ছাড়িল, কায়া ভস্মীভূত হইল। ধন্য সহিষ্ণুতা! ধন্য প্রীতি! ধন্য ভক্তি!

যখন আমি ভাবি যে, কিছুদিন হইল, আমাদিগের দেশীয়া অবলা অঙ্গনাগণ কোমলাঙ্গী হইয়াও এইরূপে মরিতে পারিত, তখন আমার মনে নূতন আশার সঞ্চার হয়, তখন আমার বিশ্বাস হয় যে, মহত্ত্বের বীজ আমাদিগের অন্তরেও নিহিত আছে। কালেও কি আমরা মহত্ত্ব দেখাইতে পারিব না? হে বঙ্গপৌরাঙ্গনাগণ—তোমরা এ বঙ্গদেশের সার রত্ন। তোমাদের মিছা রূপের বড়াইয়ে কাজ কি?

নবম সংখ্যা

ফুলের বিবাহ

বৈশাখ মাস বিবাহের মাস। আমি ১লা বৈশাখে নসীবাবুর ফুলবাগানে বসিয়া একটি বিবাহ দেখিলাম। ভবিষ্যৎ বরকন্যাদিগের শিক্ষার্থ লিখিয়া রাখিতেছি।

মল্লিকা ফুলের বিবাহ। বৈকাল-শৈশব অবসানপ্রায়, কলিকা-কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়া আসিল। কন্যার পিতা বড় লোক নহে, ক্ষুদ্র বৃক্ষ, তাহাতে আবার অনেকগুলি কন্যাভারগ্রস্ত। সম্বন্ধের অনেক কথা হইতেছিল, কিন্তু কোনটা স্থির হয় নাই। উদ্যানের রাজা স্থলপদ্ম নির্দোষ পাত্র বটে, ঘড় বড়, উঁচু স্থলপদ্ম অত দূর নামিল না। জবা এ বিবাহে অসম্মত ছিল না, কিন্তু জবা বড় রাগী, কন্যাকর্তা পিছাইলেন। গন্ধরাজ পাত্র ভাল, কিন্তু বড় দেমাগ, প্রায় তাঁহার বার পাওয়া যায় না। এইরূপ অব্যবস্থার সময়ে ভ্রমররাজ ঘটক হইয়া মল্লিকা-বৃক্ষসদনে উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া বলিলেন, "গুণ্! গুণ্! গুণ্! মেয়ে আছে?"

মল্লিকাবৃক্ষ পাতা নাড়িয়া সায় দিলেন, "আছে।" ভ্রমর পত্রাসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "গুণ্ গুণ্ গুণ্। গুণ্ গুণাগুণ্! মেয়ে দেখিব।"

বৃক্ষ, শাখা নত করিয়া, মুদিতনয়না অবগুণ্ঠনবতী কন্যা দেখাইলেন।

ভ্রমর একবার বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া বলিলেন, "গুণ্। গুণ্! গুণ! গুণ দেখিতে চাই। ঘোমটা খোল্।"

লজ্জাশীলা কন্যা কিছুতেই ঘোম্‌টা খুলে না। বৃক্ষ বলিলেন, "আমার মেয়েগুলি বড় লাজুক। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি মুখ দেখাইতেছি।"

ভ্রমর ভোঁ করিয়া স্থলপদ্মের বৈঠকখানায় গিয়া রাজপুত্রের সঙ্গে ইয়ারকি করিতে বসিলেন। এদিকে মল্লিকার সন্ধ্যাঠাকুরাণী-দিদি আসিয়া তাহাকে কত বুঝাইতে লাগিল—বলিল, "দিদি, একবার ঘোমটা খোল—নইলে, বর আসিবে না—লক্ষ্মী আমার, চাঁদ আমার, সোণা আমার" ইত্যাদি। কলিকা কত বার ঘাড নাড়িল, কত বার রাগ করিয়া মুখ ঘুরাইল, কত বার বলিল, "ঠান্‌দিদি, তুই যা!" কিন্তু শেষে সন্ধ্যার স্নিগ্ধ স্বভাবে মুগ্ধ হইয়া মুখ খুলিল। তখন ঘটক মহাশয় ভোঁ করিয়া রাজবাড়ী হইতে নামিয়া আসিয়া ঘটকালীতে মন দিলেন। কন্যার পরিমলে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, "গুণ্ গুণ্ গুণ্, গুণ্ গুণাগুণ! কন্যা গুণবতী বটে। ঘরে মধু কত?"

কন্যাকর্ত্তা বৃক্ষ বলিলেন, "ফর্দ্দ দিবেন, কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিব।" ভ্রমর বলিলেন, "গুণ্ গুণ্, আপনার অনেক গুণ—ঘটকালীটা?"

কন্যাকর্ত্তা শাখা নাড়িয়া সায় দিল, "তাও হবে।"

ভ্রমর—"বলি ঘটকালীর কিছু আগাম দিলে হয় না? নগদ দান বড় গুণ—গুণ গুণ্ গুণ্।"

ক্ষুদ্র বৃক্ষটি তখন বিরক্ত হইয়া, সকল শাখা নাড়িয়া বলিল, "আগে বরের কথা বল—বর কে?"

ভ্রমর—"বর অতি সুপাত্র।—তাঁর অনেক গুণ্-ন্ ন্।"

"কে তিনি?"

"গোলাবলাল গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর অনেক—গুণ্-ন্—ন্।"

এ সকল কথোপকথন মনুষ্যে শুনিতে পায় না, আমি কেবল আফিমপ্রসাদাৎ দিব্য কর্ণ পাইয়াই এ সকল শুনিতেছিলাম। আমি শুনিতে লাগিলাম, কুলাচার্য্য মহাশয়, পাখা ঝাড়িয়া ছয় পা ছড়াইয়া গোলাবের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছিলেন। বলিতেছিলেন যে, গোলাব বংশ বড় কুলীন; কেন না, ইহারা "ফুলে" মেল। যদি বল, সকল ফুলই ফুলে, তথাপি গোলাবের গৌরব অধিক; কেন না, ইহারা সাক্ষাৎ বাঞ্ছামালীর সন্তান; তাহার স্বহস্তরোপিত। যদি বল, এ ফুলে কাঁটা আছে, কোন্ কুলে বা কোন্ ফুলে নাই?

যাহা হউক, ঘটকরাজ কোনরূপে সম্বন্ধ স্থির করিয়া, বোঁ করিয়া উড়িয়া গিয়া, গোলাব বাবুর বাড়ীতে খবর দিলেন। গোলাব, তখন বাতাসের সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া, হাসিয়া হাসিয়া, লাফাইয়া লাফাইয়া খেলা করিতেছিল, বিবাহের নাম

শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়া কন্যার বয়স জিজ্ঞাসা করিল। ভ্রমর বলিল, “আজি কালি ফুটিবে।”

গোধূলি লগ্ন উপস্থিত, গোলাব বিবাহে যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। উচ্চিঙ্গড়া নহবৎ বাজাইতে আরম্ভ করিল; মৌমাছি সানাইয়ের বায়না লইয়াছিল, কিন্তু রাতকানা বলিয়া সঙ্গে যাইতে পারিল না। খদ্যোতেরা ঝাড় ধরিল; আকাশে তারাবাজি হইতে লাগিল। কোকিল আগে আগে ফুকরাইতে লাগিল। অনেক বরাযাত্র চলিল; স্বয়ং রাজকুমার স্থলপদ্ম দিবাবসানে অস্বাস্থ্যকর বলিয়া আসিতে পারিলেন না, কিন্তু জবাগোষ্ঠী—শ্বেত জবা, রক্ত জবা, জরদ জবা প্রভৃতি সবংশে আসিয়াছিল। করবীদের দল, সেকেলে রাজাদিগের মত বড় উচ্চ ডালে চড়িয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। সেঁউতি নীতবর হইবে বলিয়া, সাজিয়া আসিয়া দুলিতে লাগিল। গরদের জোড় পরিয়া চাঁপা আসিয়া দাঁড়াইল—বেটা ব্রাণ্ডি টানিয়া আসিয়াছিল, উগ্র গন্ধ ছুটিতে লাগিল। গন্ধরাজেরা বড় বাহার দিয়া দলে দলে আসিয়া, গন্ধ বিলাইয়া দেশ মাতাইতে লাগিল। অশোক নেশায় লাল হইয়া আসিয়া উপস্থিত; সঙ্গে এক পাল পিপ্‌ড়া মোসায়েব হইয়া আসিয়াছে; তাহাদের গুণের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, কিন্তু দাঁতের জ্বালা বড়—কোন্ বিবাহে না এরূপ বরযাত্র জোটে, আর কোন্ বিবাহে না তাহারা হুল ফুটাইয়া বিবাদ বাধায়? কুরুবক, কুটজ প্রভৃতি আরও অনেক বরযাত্র আসিয়াছিলেন, ঘটক মহাশয়ের কাছে তাঁহাদের পরিচয় শুনিবেন। সর্ব্বত্রই তিনি যাতায়াত করেন এবং কিছু কিছু মধু পাইয়া থাকেন।

আমারও নিমন্ত্রণ ছিল, আমিও গেলাম। দেখি, বরপক্ষের বড় বিপদ্। বাতাস বাহকের বায়না লইয়াছিলেন; তখন হুঁ—হুম্ করিয়া অনেক মর্দ্দানি করিয়াছিলেন কিন্তু কাজের সময় কোথায় লুকাইলেন, কেহ খুঁজিয়া পায় না। দেখিলাম, বর, বরযাত্র, সকলে অবাক্ হইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। মল্লিকাদিগের কুল যায় দেখিয়া আমিই বাহকের কার্য্য স্বীকার করিলাম। বর, বরযাত্র সকলকে তুলিয়া লইয়া মল্লিকাপুরে গেলাম।

সেখানে দেখিলাম, কন্যাকুল, সকল ভগিনী, আহ্লাদে ঘোমটা খুলিয়া, মুখ ফুটাইয়া, পরিমল ছুটাইয়া, সুখের হাসি হাসিতেছে। দেখিলাম, পাতায় পাতায় জড়াজড়ি; গন্ধের ভাণ্ডারে ছড়াছড়ি পড়িয়া গিয়াছে—রূপের ভরে সকলে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। যূথি, মালতী, বকুল, রজনীগন্ধ প্রভৃতি এয়োগণ স্ত্রী-আচার করিয়া বরণ করিল। দেখিলাম, পুরোহিত উপস্থিত; নসীবাবুর নবমবর্ষীয়া কন্যা (জীবন্ত

কুসুমরূপিণী) কুসুমলতা সুচ সুতা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে ; কন্যাকর্ত্তা কন্যা সম্প্রদান করিলেন ; পুরোহিত মহাশয় দুই জনকে এক সুতায় গাঁথিয়া গাঁটছড়া বাঁধিয়া দিলেন।

তখন বরকে বাসর-ঘরে লইয়া গেল। কত যে রসময়ী মধুময়ী সুন্দরী সেখানে বরকে ঘেরিয়া বসিল, তাহা কি বলিব। প্রাচীনা ঠাকুরাণীদিদি টগর সাদা প্রাণে বাঁধা রসিকতা করিতে করিতে শুকাইয়া উঠিলেন। রঙ্গণের রাঙ্গামুখে হাসি ধরে না। যুই, কন্যের সই, কন্যের কাছে গিয়া শুইল ; রজনীগন্ধাকে বর তাড়কা রাক্ষসী বলিয়া কত তামাসা করিল ; বকুল একে বালিকা, তাতে যত গুণ, তত রূপ নহে ; এক কোণে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল ; আর ঝুম্‌কা ফুল বড় মানুষের গৃহিণীর মত মোটা মাগী নীল শাড়ী ছড়াইয়া জমকাইয়া বসিল। তখন—

"কমলকাকা—ওঠ বাড়ী যাই—রাত হয়েছে, ও কি ঢুলে পড়্‌বে যে ?"

কুসুমলতা এই কথা বলিয়া আমার গা ঠেলিতেছিল ; চমক হইলে দেখিলাম, কিছুই নাই। সেই পুষ্পবাসর কোথায় মিশিল ?—মনে করিলাম, সংসার অনিত্যই বটে—এই আছে, এই নাই। সে রম্য বাসর কোথায় গেল,—সেই হাস্যমুখী শুভ্রস্মিতসুধাময়ী পুষ্পসুন্দরীসকল কোথায় গেল ? যেখানে সব যাইবে, সেইখানে—স্মৃতির দর্পণতলে, ভূতসাগরগর্ভে। যেখানে রাজা প্রজা, পর্ব্বত সমুদ্র, গ্রহ নক্ষত্রাদি গিয়াছে বা যাইবে, সেইখানে—ধ্বংসপুরে ! এই বিবাহের ন্যায় সব শূন্যে মিশাইবে, সব বাতাসে গলিয়া যাইবে—কেবল থাকিবে—কি ? ভোগ ? না, ভোগ্য না থাকিলে ভোগ থাকিতে পারে না। তবে কি ? স্মৃতি ?

কুসুম বলিল, "ওঠ না—কি কচ্চো ?"

আমি বলিলাম, "দূর পাগলি, আমি বিয়ে দিচ্ছিলাম।"

কুসুম ঘেঁষে এসে, হেসে হেসে কাছে দাঁড়াইয়া আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার বিয়ে, কাকা ?"

আমি বলিলাম, "ফুলের বিয়ে।"

"ওঃ পোড়া কপাল, ফুলের ? আমি বলি কি ! আমিও যে এই ফুলের বিয়ে দিয়েছি।"

"কই ?"

"এই যে মালা গাঁথিয়াছি।" দেখিলাম, সেই মালায় আমার বর কন্যা রহিয়াছে।

দশম সংখ্যা

বড় বাজার

প্রসন্ন গোয়ালিনীর সঙ্গে আমার চিরবিচ্ছেদের সম্ভাবনা দেখিতেছি। আমি নসীরাম বাবুর গৃহে আসিয়া অবধি তাহার নিকট ক্ষীর, সর, দধি, দুগ্ধ এবং নবনীত খাইতেছি। আহারকালে মনে করিতাম, প্রসন্ন কেবল পরলোকে সদ্গতির কামনায় অনন্ত পুণ্য সঞ্চয় করিতেছে;—জানিতাম, সংসারারণ্যে যাহারা পুণ্যরূপ মৃগ ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়া বেড়ায়, প্রসন্ন তন্মধ্যে সুচতুরা; ভোজনান্তে নিত্যই প্রসন্নের পরকালে অক্ষয় স্বর্গ, এবং ইহকালে মৌতাত বৃদ্ধির জন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা করিতাম। কিন্তু এক্ষণে হায়! মানব-চরিত্র কি ভীষণ স্বার্থপরতায় কলঙ্কিত! এক্ষণে সে মূল্য চাহিতেছে।

সুতরাং তাহার সঙ্গে চিরবিচ্ছেদের সম্ভাবনা। প্রথম দিন সে যখন মূল্য চাহিল, রসিকতা করিয়া উড়াইয়া দিলাম—দ্বিতীয় দিনে বিস্মিত হইলাম—তৃতীয় দিনে গালি দিযাছি। এক্ষণে সে দুধ দই বন্ধ করিযাছে। কি ভয়ানক! এত দিনে জানিলাম, মনুষ্যজাতি নিতান্ত স্বার্থপর; এত দিনে জানিয়াছি যে, যে সকল আশা ভরসা সযত্নে হৃদয়ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া বিশ্বাস-জলে পুষ্ট কর, সকলই বৃথা। এক্ষণে জানিয়াছি যে, ভক্তি প্রীতি স্নেহ প্রণয়াদি সকলই বৃথা গল্প—আকাশ-কুসুম! ছায়াবাজি! হায়! মনুষ্যজাতির কি হইবে! হায়, অর্থলুব্ধ গোয়ালা জাতিকে কে নিস্তার করিবে! হায়! প্রসন্ন নামে গোয়ালার কবে গোরু চুরি যাবে!

প্রসন্নের দুগ্ধ দধি আছে, সে দিবে, আমার উদর আছে, খাইব, তাহার সঙ্গে এই সম্বন্ধ, ইহাতে সে মূল্য চাহে কোন্ অধিকারে, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। প্রসন্ন বলে, আমি অধিকার অনধিকার বুঝি না; আমার গোরু, আমার দুধ, আমি মূল্য লইব। সে বুঝে না যে, গোরু কাহারও নহে; গোরু গোরুর নিজের; দুধ, যে খায় তারই।

তবে এ সংসারে মূল্য লওয়া একটা রীতি আছে, স্বীকার করি। কেবল খাদ্য সামগ্রী কেন, সকল সামগ্রীই মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয়। দুধ দই, চাল দাল, খাদ্য পেয়, পরিধেয় প্রভৃতি পণ্য দ্রব্য দূরে থাকুক, বিদ্যা-বুদ্ধিও মূল্য দিয়া কিনিতে হয়। কালেজে মূল্য দিয়া বিদ্যা কিনিতে হয়। অনেকে ভাল কথা মূল্য দিয়া কিনিয়া থাকেন। হিন্দুরা সচরাচর মূল্য দিয়া ধর্ম্ম কিনিয়া থাকেন। যশঃ, মান অতি অল্প

মূল্যেই ক্রীত হইয়া থাকে। ভাল সামগ্রী মূল্য দিয়া কিনিতে হইবে, ইহাও কতক বুঝিতে পারি, কিন্তু মনুষ্য এমনই মূল্যপ্রিয় যে, বিনামূল্যে মন্দ সামগ্রীও কেহ কাহাকে দেয় না। যে বিষ খাইয়া মরিবার বাসনা কর, তাহাও তোমাকে বাজার হইতে মূল্য দিয়া কিনিয়া খাইতে হইবে।

অতএব এই বিশ্বসংসার একটি বৃহৎ বাজার—সকলেই সেখানে আপনাপন দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছে। সকলেরই উদ্দেশ্য মূল্যপ্রাপ্তি। সকলেই অনবরত ডাকিতেছে, "আমার দোকানে ভাল জিনিষ—খরিদ্দার চলে আয়"—সকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য, খরিদ্দারের চোকে ধূলা দিয়া রদি মাল পাচার করিবে। দোকানদার খরিদ্দারে কেবল যুদ্ধ, কে কাকে ফাঁকি দিতে পারে। সস্তা খরিদের অবিরত চেষ্টাকে মনুষ্যজীবন বলে।

ভাবিয়া চিন্তিয়া, মনের দুঃখে আফিমের মাত্রা চড়াইলাম। তখন জ্ঞাননেত্র ফুটিল। সম্মুখে ভাবের বাজার সুবিস্তৃত দেখিলাম। দেখিলাম, অসংখ্য দোকানদার দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছে—অসংখ্য খরিদ্দারে খরিদ করিতেছে—দেখিলাম, সেই অসংখ্য দোকানদারে অসংখ্য খরিদ্দারে পরস্পরকে অসংখ্য অঙ্গুষ্ঠ দেখাইতেছে। আমি গামছা কাঁধে করিয়া, বাজার করিতে বাহির হইলাম। প্রথমেই রূপের দোকানে গেলাম। যে জিনিষ ঘরে নাই, সেই দোকানে আগে যাইতে হয়।—দেখিলাম যে, সংসারে সেই মেছো হাটা। পৃথিবীর রূপসিগণ মাছ হইয়া ঝুড়ি চুপড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়াছেন। দেখিলাম, ছোট বড় রুই, কাতলা, মৃগেল, ইলিস, চুনো পুঁটি, মাগুর খরিদ্দারের জন্য লেজ আছড়াইয়া ধড়ফড় করিতেছে; যত বেলা বাড়িতেছে, তত বিক্রয়ের জন্য খাবি খাইতেছে।—মেছুনীরা ডাকিতেছে, "মাছ নেবে গো! কুল পুকুরের সস্তা মাছ, অমনি ছাড়্‌বো—বোঝা বিক্রি হলেই বাঁচি।" কেহ ডাকিতেছে, "মাছ নেবে গো—ধন সাগরের মিঠা মাছ—যে কেনে, তার পুনর্জ্জন্ম হয় না—ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বিবির মুণ্ডে পরিণত হইয়া তার ঘর দ্বারে ছড়াছড়ি যায়, যার সাধ্য থাকে কিনিবে। সোনার হাঁড়িতে চোখের জলে সিদ্ধ করিয়া, হৃদয়-আগুনে কড়া জ্বাল দিয়া রাঁধিতে হয়—কে খরিদ্দার সাহস করিস্—আয়। সাবধান! হীরার কাঁটা—নাতি ঝাঁটা—গলায় বাঁধ্‌লে শাশুড়ীরূপী বিড়ালের পায়ে পড়িতে হয়—কাঁটার জ্বালায়, খরিদ্দার হলে কি পলায়!" কেহ ডাকিতেছে, "ওরে আমার সরম পুঁটি, বিক্রি হলেই উঠি। ঝোলে ঝালে অম্বলে, তেলে ঘিয়ে জলে, যাতে দিবে ফেলে, রান্না যাবে চলে,—সংসারের দিন সুখে কাটাবে, আমার এই সরম পুঁটির বলে।" কেহ বলিতেছে,

"কাদা ছেঁদে চাঁদা এনেছি—দেখে খরিদ্দার পাগল হয়! কিনে নিয়ে ঘর আলো কর।"

এইরূপ দেখিয়া শুনিয়া মাছ কিনিতে প্রবৃত্ত হইলাম—কেন না, আমার নিরামিষ ঘরকন্না। দেখিলাম, মাছের দালাল আছে; নাম পুরোহিত। দালাল খাড়া হইলে দর জিজ্ঞাসা করিলাম—শুনিলাম, দর "জীবন সর্ব্বস্ব।" যে মাছ ইচ্ছা, সেই মাছ কেন, একই দর, "জীবন সর্ব্বস্ব।" জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাল, এ মাছ কত দিন খাইব?" দালাল বলিল, "দু দিন চারি দিন, তারপর পচিয়া গন্ধ হইবে।" তখন "এত চড়া দরে, এমন নশ্বর সামগ্রী কেন কিনিব?" ভাবিয়া আমি মেছো হাটা হইতে পলায়ন করিলাম। দেখিয়া মেছনারা গামছা কাঁধে মিন্‌সেকে গালি পাড়িতে লাগিল।

রূপের বাজার ছাড়িয়া বিদ্যার বাজারে গেলাম। দেখিলাম, এখানে ফলমূল বিক্রয় হয়। এক স্থানে দেখিলাম, কতকগুলি ফোঁটা-কাটা টিকিওয়ালা ব্রাহ্মণ তসর গরদ পরিয়া, নামাবলী গায়ে, ঝুনা নারিকেলের দোকান খুলিয়া বসিয়া খরিদ্দার ডাকিতেছেন—"বেচি আমরা ঘটত্ব পটত্ব ষত্ব ণত্ব—ঘরে চাল থাকিলেই স্ব-ত, নইলে ন-ত্ব। দ্রব্যত্ব জাতিত্ব গুণত্ব পদার্থ—বাপের শ্রাদ্ধে বিদায় না দিলেই তুমি বেটা অপদার্থ। পদার্থতত্ত্ব নামে ঝুনা নারিকেল—খাইতে বড় কঠিন—তাহার প্রথম ছোবড়ায় লেখে যে, ব্রাহ্মণীই পরম পদার্থ! অভাব নামে নারিকেল চতুর্ব্বিধ*—তোমার ঘরে ধন আছে, আমার ঘরে নাই, ইহা অন্যোন্যাভাব। যতক্ষণ না পাই, ততক্ষণ প্রাগভাব; খরচ হইয়া গেলেই ধ্বংসাভাব; আর আমাদের ঘরে সর্ব্বদাই অত্যন্ত অভাব। অভাব নিত্য কি অনিত্য, যদি সংশয় থাকে তবে আমাদের ভাণ্ডারে উঁকি মার—দেখিবে, নিত্যই অভাব। অতএব আমাদের ঝুনা নারিকেল কেন। ব্যাপ্য, ব্যাপক, ব্যাপ্তি, এ নারিকেলের শাঁস, ব্রাহ্মণের হস্ত হইল ব্যাপ্য, রজত হইল ব্যাপক; আর তুমি দিলেই ঘটিল ব্যাপ্তি; এই ঝুনা নারিকেল কেন, এখনই বুঝিবে। দেখ বাপু, কার্য্য কারণ সম্বন্ধ বড় গুরুতর কথা; টাকা দাও, এখনই একটা কার্য্য হইবে, কম দিলেই অকার্য্য। আর কারণ বুঝাইব কি, এই যে দুই প্রহর রৌদ্রে ঝুনা নারিকেল বেচিতে আসিয়াছি, ব্রাহ্মণীই তাহার কারণ—কিছু যদি না কেন, তবে নারিকেল বহা,—অকারণ। অতএব নারিকেল কেন, নহিলে এই ঝুনা নারিকেল মাথায় ঠুকিয়া মারিব।"

* নৈয়ায়িকেরা বলেন, অভাব চতুর্ব্বিধ; অন্যোন্যাভাব, প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব আর অত্যন্তাভাব।

শ্রীকমলাকান্ত।

ব্রাহ্মণদিগের সেই প্রখর তপনতপ্ত ঘর্ম্মাক্ত ললাট এবং বাগ্‌বিতণ্ডাজনিত অধরসুধাবৃষ্টি দেখিয়া দয়া হইল—জিজ্ঞাসা করিলাম, "হ্যাঁ ভট্টাচার্য্য মহাশয়! ঝুনা নারিকেল কিনিতে আপত্তি নাই, কিন্তু দোকানে দা আছে? ছুলিবে কি প্রকারে?"

"না বাপু, দা রাখি না।"

"তবে নারিকেল ছোল কিসে?"

"আমরা ছুলি না আমরা কামড়াইয়া ছোবড়া খাই।"

শুনিয়া, আমি ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করিয়া পাশের দোকানে গেলাম।

দেখিলাম, ইহাদিগের সম্মুখেই এক্সপেরিমেণ্টাল সায়েন্সের দোকান। কতকগুলি সাহেব দোকানদার, ঝুনা নারিকেল, বাদাম, পেস্তা, সুপারি প্রভৃতি ফল বিক্রয় করিতেছেন। ঘরের উপরে বড় বড় পিতলের অক্ষরে লেখা আছে।

MESSERS BROWN JONES AND
ROBINSON
NUT SUPPLIERS
ESTABLISHED 1757
ON THE FIELD OF PLASSEY
MESSERS BROWN JONES AND ROBINSON
offer to the Indian Public
A Large Assortment of
NUTS
PHYSICAL, METAPHYSICAL,
LOGICAL, ILLOGICAL,
AND
SUFFICIENT TO BREAK THE JAWS
AND
DISLOCATE THE TEETH OF
ALL INDIAN YOUTHS
WHO STAND IN NEED OF HAVING THEIR
DENTAL SUPERFLUITIES CURTAILED

দোকানদার ডাকিতেছেন—"আয় কালা বালক, Experimental Science

খাবি আয। দেখ, ১ নম্বর এক্সপেরিমেণ্ট—ঘুসি ; ইহাতে দাঁত উপড়ে, মাথা ফাটে এবং হাড় ভাঙ্গে। আমরা এ সকল এক্সপেরিমেণ্ট বিনামূল্যে দেখাইযা থাকি—পবেব মাথা বা নবম হাড় পাইলেই হইল। আমরা স্থূল পদার্থের সংযোগ বিযোগ সাধনে পটু—রাসাযনিক বলে বা বৈদ্যুতীয় বলে বা চৌম্বক বলে, জড়পদার্থের বিশ্লেষণেই সুদক্ষ—কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মুষ্ট্যাঘাতের বলে মস্তকাদির বিশ্লেষণেই আমরা কৃতকার্য্য। মাধ্যাকর্ষণ, যৌগিকাকর্ষণ, চৌম্বকাকর্ষণ প্রভৃতি নানাবিধ আকর্ষণেব কথা আমবা অবগত আছি, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা কেশাকর্ষণেই আমরা কৃতবিদ্য। এই সংসারে জড়পদার্থের নানাবিধ যোগ দেখা যায ; যথা বাযুতে অম্লজান ও যবক্ষারজানের সামান্য যোগ, জলে জলজান ও অম্লযানের রাসাযনিক যোগ, আর তোমাদিগের পৃষ্ঠে, আমাদের হস্তে, মুষ্টিযোগ। অতএব এই সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিবে যদি, মাথা বাড়াইযা দাও ; এক্সপেরিমেণ্ট করিব। দেখিবে, গ্র্যাবিটেশ্যনের বলে এই সকল নারিকেলাদি তোমাদের মস্তকে পড়িবে ; পর্কশন্ নামক অদ্ভুত শাব্দিক রহস্যেরও পরিচয় পাইবে, এবং দেখিবে, তোমার মস্তিষ্কস্থিত স্নাযব পদার্থের গুণে তুমি বেদনা অনুভূত করিবে।

অগ্রিম মূল্য দিও ; তাহা হইলে চ্যারিটিতে এক্সপেরিমেণ্ট খাইতে পারিবে।"

আমি এই সকল দেখিতে শুনিতেছিলাম, এমত সমযে সহসা দেখিলাম যে, ইংরেজ দোকানদারেরা, লাঠি হাতে, দ্রুতবেগে ব্রাহ্মণদিগের ঝুনা নারিকেলেব গাদার উপর গিয়া পড়িলেন, দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা নারিকেল ছাড়িযা দিয়া নামাবলি ফেলিয়া, মুক্তকচ্ছ হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলাযন করিতে লাগিলেন। তখন সাহেবেরা সেই সকল পরিত্যক্ত নারিকেল দোকানে উঠাইযা লইযা আসিয়া, বিলাতী অস্ত্রে ছেদন করিয়া, সুখে আহার করিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "এ কি হইল?" সাহেবেরা বলিলেন, "ইহাকে বলে, Asiatic Researches." আমি তখন ভীত হইয়া, আত্মশরীরে কোন প্রকার Anatomical Researches আশঙ্কা করিযা, সেখান হইতে পলাযন করিলাম।

সাহিত্যের বাজার দেখিলাম। দেখিলাম, বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষিগণ অমৃত ফল বেচিতেছেন ; বুঝিলাম, ইহা সংস্কৃত সাহিত্য। দেখিলাম আর কতকগুলি মনুষ্য নিচু পীচ পেয়ারা আনারস আঙ্গুর প্রভৃতি সুস্বাদু ফল বিক্রয় করিতেছেন—বুঝিলাম এ পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য। আরও একখানি দোকান দেখিলাম—অসংখ্য শিশুগণ এবং অবলাগণ তাহাতে ক্রয বিক্রয করিতেছে—ভিড়ের জন্য তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলাম না—জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কিসের দোকান?"

বালকেরা বলিল, "বাঙ্গালা সাহিত্য।"

"বেচিতেছে কে?"

"আমরাই বেচি। দুই একজন বড মহাজনও আছেন। তদ্ভিন্ন বাজে দোকান-দারের পরিচয় পত্মাবলী নামক গ্রন্থে পাইবেন।"

"কিনিতেছে কে?"

"আমরাই।"

বিক্রেয় পদার্থ দেখিবার বাসনা হইল। দেখিলাম—খবরের কাগজ জড়ান কতকগুলি অপক্ক কদলী।

তাহার পর কলু পটিতে গেলাম; দেখিলাম, যত উমেদার, মোসাহেব সকলে কলু সাজিয়া তেলের ভাঁড় লইযা সারি সারি বসিযা গিয়াছে। তোমার ট্যাকে চাকরি আছে, শুনিতে পাইলেই পা টানিযা লইযা, ভাঁড বাহির করিযা, তেল মাখাইতে বসে। চাকরি না থাকিলেও—যদি থাকে এই ভরসায়, পা টানিযা লইয়া তেল লেপিতে বসে। তোমার কাছে চাকরি নাই—নাই নাই—নগদ টাকা আছে ত—আচ্ছা, তাই দাও—তেল দিতেছি। কাহারও প্রার্থনা, তোমার বাগানে বসিয়া তুমি যখন ব্রাণ্ডি খাইবে, আমি তোমার চরণে তৈল মাখাইব—আমার কন্যার বিবাহটি যেন হয। কাহারও আদ্দাশ, তোমার কানে অবিরত খোসামোদের গন্ধ তৈল ঢালিব—বাড়ীর প্রাচীরটি যেন দিতে পারি। কাহারও কামনা, তোমার তোষাখানার বাতি জ্বালিযা দিব—আমার খবরের কাগজখানি যেন চলে। শুনিয়াছি, কলুদিগের টানাটানিতে অনেকের পা খোঁড়া হইযা গিযাছে। আমার শঙ্কা হইল, পাছে কোন কলু আফিঙ্গের প্রার্থনায আমার পায়ে তেল দিতে আরম্ভ করে। আমি পলায়ন করিলাম।

তারপরে যশের ময়রাপটী। সম্বাদপত্রলেখক নামে ময়রাগণ, গুড়ে সন্দেশের দোকান পাতিযা, নগদ মূল্যে বিক্রয করিতেছে—রাস্তার লোক ধরিয়া সন্দেশ গতাইয়া দিযা, হাত পাতিতেছে—মূল্য না পাইলেই কাপড় কাড়িয়া লইতেছে। এদিকে তাঁহাদের বিক্রেয যশের দুর্গন্ধে পথিক নাসিকা আবৃত করিয়া পলায়ন করিতেছে। দোকানদারগণ বিনা ছানায শুধু গুড়ে, আশ্চর্য্য সন্দেশ করিয়া, সস্তা দরে বিক্রয় করিতেছেন। কেহ টাকাটা সিকেটায়, আনা দু আনায়, কেহ কেবল খাতিরে—কেহ বা এক সাজ ফলাহার পেলেই ছাড়েন—কেহ বা বাবুর গাড়িতে চড়িতে পেলেই যশোবিক্রয় করেন। অন্যত্র রাজপুরুষগণ মিঠাইওয়ালা সাজিয়া, রায়বাহাদুর, রাজাবাহাদুর খেতাব, খেলাত, নিমন্ত্রণ, ধন্যবাদ প্রভৃতি মিঠাই লইয়া

দোকান পাতিয়া বসিয়া আছেন,—চাঁদা, সেলাম, খোসামোদ, ডাক্তারখানা, রাস্তাঘাট, মূল্য লইয়া মিঠাই বেচিতেছেন। বিক্রয়ের বড় বেবন্দোবস্ত—কেহ সর্ব্বস্ব দিয়া এক ঠোঙ্গা পাইতেছে না—কেহ শুধু সেলামে দেড় মণ লইয়া যাইতেছে। এইরূপ অনেক দোকান দেখিলাম—কিন্তু সর্ব্বত্রই পচা মাল আধা দরে বিক্রয় হইতেছে—খাঁটি দোকান দেখিলাম না। কেবল একখানি দোকান দেখিলাম—তাহা অতি চমৎকার।

দেখিলাম, দোকানের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার—কিছু দেখা যায় না। ডাকিয়া দোকানদারের উত্তর পাইলাম না—কেবল এক সর্ব্বপ্রাণিভীতিসাধক অনন্ত গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম—অল্পালোকে দ্বারে ফলক-লিপি পড়িলাম।

যশের পণ্যশালা।

বিক্রেয়—অনন্ত যশ।

বিক্রেতা—কাল।

মূল্য—জীবন।

জীয়ন্তে কেহ এখানে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

আর কোথাও সুযশ বিক্রয় হয় না।

পড়িয়া ভাবিলাম—আমার যশে কাজ নাই—কমলাকান্তের প্রাণ বাঁচিলে অনেক যশ হইবে।

বিচারের বাজারে গেলাম—দেখিলাম, সেটা কসাইখানা। টুপি মাথায়, শামলা মাথায়—ছোট বড় কসাইসকল, ছুরি হাতে গোরু কাটিতেছে। মহিষাদি বড় বড় পশুসকল শৃঙ্গ নাড়িয়া ছুটিয়া পলাইতেছে;—ছাগ, মেষ এবং গোরু প্রভৃতি ক্ষুদ্র পশুসকল ধরা পড়িতেছে। আমাকে দেখিয়া গোরু বলিয়া এক জন কসাই বলিল, "এও গোরু, কাটিতে হইবে।" আমি সেলাম করিয়া পলাইলাম।

আর বড় বাজার বেড়াইবার সাধ রহিল না—তবে প্রসন্নের উপর রাগ ছিল বলিয়া একবার দইয়েহাটা দেখিতে লাগিলাম—গিয়া প্রথমেই দেখিলাম যে, সেখানে খোদ কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী নামে গোয়ালা—দপ্তররূপ পচা ঘোলের হাঁড়ি লইয়া বসিয়া আছে—আপনি ঘোল খাইতেছে, এবং পরকে খাওয়াইতেছে।

তখন চমক হইল—চক্ষু চাহিলাম—নসীবাবুর বাড়ীতেই আছি। ঘোলের হাঁড়ি কাছে আছে বটে। প্রসন্ন এক হাঁড়ি ঘোল আনিয়া আমাকে সাধিতেছে—"চক্রবর্ত্তী মশাই—রাগ করিও না। আজ আর দুধ দই নাই—এই ঘোলটুকু আনিয়াছি—ইহার দাম দিতে হইবে না।"

একাদশ সংখ্যা

আমার দুর্গোৎসব

সপ্তমীপূজার দিন কে আমাকে অত আফিঙ্গ চড়াইতে বলিল! আমি কেন আফিঙ্গ খাইলাম! আমি কেন প্রতিমা দেখিতে গেলাম! যাহা কখন দেখিব না, তাহা কেন দেখিলাম! এ কুহক কে দেখাইল!

দেখিলাম—অকস্মাৎ কালের স্রোত, দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবলবেগে ছুটিতেছে—আমি ভেলায চড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছি। দেখিলাম—অনন্ত, অকূল, অন্ধকারে, বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল সেই স্রোত—মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ উদয় হইতেছে—নিবিতেছে আবার উঠিতেছে। আমি নিতান্ত একা—একা বলিয়া ভয করিতে লাগিল—নিতান্ত একা—মাতৃহীন—মা! মা! করিযা ডাকিতেছি! আমি এই কাল-সমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিযাছি। কোথা মা! কই আমার মা? কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি! এ ঘোর কাল-সমুদ্রে কোথায় তুমি? সহসা স্বর্গীয বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—দিঙ্মণ্ডলে প্রভাতারুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল—সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে, দূরপ্রান্তে দেখিলাম—সুবর্ণমণ্ডিতা, এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা! জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে! এই কি মা? হাঁ, এই মা। চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্নভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশ ভুজ—দশ দিক্—দশ দিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আযুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরজন কেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত! এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না, কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা, নানা প্রহরণপ্রহারিণী, শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্র পৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা!

কোথায় ফুল পাইলাম, বলিতে পারি না—কিন্তু সেই প্রতিমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম—ডাকিলাম, "সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে, শিবে, আমার সর্ব্বার্থসাধিকে! অসংখ্যসন্তানকুলপালিকে! ধর্ম্ম, অর্থ, সুখ, দুঃখদায়িকে! আমার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ কর। এই ভক্তি প্রীতি বৃত্তি শক্তি করে লইয়া তোমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছি,

তুমি এই অনন্তজনমণ্ডল ত্যাগ করিয়া এই বিশ্ববিমোহিনী মূর্ত্তি একবার জগৎসমীপে প্রকাশ কর। এসো মা! নবরাগরঙ্গিণি নববলধারিণি, নবদর্পে দর্পিণি, নবস্বপ্নদর্শিনি! —এসো মা, গৃহে এসো—ছয় কোটি সন্তানে একত্রে, এক কালে, দ্বাদশ কোটি কর যোড় করিয়া, তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব। ছয় কোটি মুখে ডাকিব, মা প্রসূতি অম্বিকে! ধাত্রি ধরিত্রি ধনধান্যদায়িকে! নগাঙ্কশোভিনি নগেন্দ্রবালিকে! শরৎ-সুন্দরি চারুপূর্ণচন্দ্রভালিকে! ডাকিব,—সিন্ধুসেবিতে সিন্ধু-পূজিতে সিন্ধুমথনকারিণি! শত্রুবধে দশভুজে দশপ্রহরণধারিণি! অনন্তশ্রী অনন্তকালস্থায়িনি! শক্তি দাও সন্তানে, অনন্তশক্তিপ্রদায়িনি! তোমাকে কি বলিয়া ডাকিব মা? ঐ ছয় কোটি মুণ্ড ঐ পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত করিব—এই ছয় কোটি কণ্ঠে ঐ নাম করিয়া হুঙ্কার করিব,—এই ছয় কোটি দেহ তোমার জন্য পতন করিব—না পারি, এই দ্বাদশ কোটি চক্ষে তোমার জন্য কাঁদিব। এসো মা, গৃহে এসো—যাঁহার ছয় কোটি সন্তান—তাঁহার ভাবনা কি?

দেখিতে দেখিতে আর দেখিলাম না—সেই অনন্ত কাল-সমুদ্রে এই প্রতিমা ডুবিল! অন্ধকারে সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশি ব্যাপিল, জলকল্লোলে বিশ্বসংসার পূরিল! তখন যুক্ত করে, সজল নয়নে, ডাকিতে লাগিলাম, উঠ মা হিরণ্ময়ি বঙ্গভূমি! উঠ মা! এবারে সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা, দেবি, দেবানু-গৃহীতে—এবার আপনা ভুলিব—ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব—অধর্ম্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব—উঠ মা—একা রোদন করিতেছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা! উঠ উঠ, উঠ মা বঙ্গজননি!

মা উঠিলেন না। উঠিবেন না কি?

এস, ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই। এস, আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া, ছয় কোটি মাথায় বহিয়া, ঘরে আনি। এস, অন্ধকারে ভয় কি? ঐ যে নক্ষত্রসকল মধ্যে উঠিতেছে, নিবিতেছে, উহারা পথ দেখাইবে—চল! চল! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে, এই কাল-সমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া, আমরা সন্তরণ করি—সেই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি? না হয় ডুবিব; মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি? আইস, প্রতিমা তুলিয়া আনি, বড় পূজার ধূম বাধিবে। দ্বেষক ছাগকে হাড়িকাটে ফেলিয়া সৎকীর্ত্তি খড়্গে মায়ের কাছে বলি দিব—কত পুরাবৃত্তাকার ঢাকী, ঢাক ঘাড়ে করিয়া, বঙ্গের বাজনা বাজাইয়া আকাশ ফাটাইবে—কত ঢোল, কাঁসি, কাড়া, নাগরায় বঙ্গের জয় বাদিত হইবে। কত সানাই পোঁ ধরিয়া গাইবে "কত নাচ গো—" বড় পূজার ধূম বাধিবে। কত ব্রাহ্মণপণ্ডিত লুচি মণ্ডার লোভে বঙ্গপূজায় আসিয়া পাতড়া মারিবে—

কত দেশী বিদেশী ভদ্রাভদ্র আসিয়া মায়ের চরণে প্রণামী দিবে—কত দীনঃদুঃখী প্রসাদ খাইয়া উদর পূরিবে। কত নর্ত্তকী নাচিবে, কত গায়কে মঙ্গল গায়িবে, কত কোটি ভক্তে ডাকিবে, মা! মা! মা!—

জয় জয় জয় জয়া জয়দাত্রি।
জয় জয় জয় বঙ্গজগদ্ধাত্রি॥
জয় জয় জয় সুখদে অন্নদে।
জয় জয় জয় বরদে শর্ম্মদে॥
জয় জয় জয় শুভে শুভঙ্করি।
জয় জয় জয় শান্তি ক্ষেমঙ্করি॥
দ্বেষকদলনি, সন্তানপালিনি।
জয় জয় দুর্গে দুর্গতিনাশিনি॥
জয় জয় লক্ষ্মি বারীন্দ্রবালিকে।
জয় জয় কমলাকান্তপালিকে॥
জয় জয় ভক্তিশক্তিদায়িকে।
পাপতাপভয়শোকনাশিকে॥
মৃদুল গম্ভীর ধীর ভাষিকে।
জয় মা কালি করালি অম্বিকে॥
জয় হিমালয়নগবালিকে।
অতুলিত পূর্ণচন্দ্রভালিকে॥
শুভে শোভনে সর্ব্বার্থসাধিকে।
জয় জয় শান্তি শক্তি কালিকে॥
জয় মা কমলাকান্তপালিকে॥
নমোঽস্তু তে দেবি বরপ্রদে শুভে।
নমোঽস্তু তে কামচরে সদা ধ্রুবে॥
ব্রহ্মাণীন্দ্রাণি রুদ্রানি ভূতভব্যে যশস্বিনি।
ত্রাহি মাং সর্ব্বদুঃখেভ্যো দানবানাং ভয়ঙ্করি॥
নমোঽস্তু তে জগন্নাথে জনার্দ্দনি নমোঽস্তু তে।
প্রিয়দাস্তে জগন্মাতঃ শৈলপুত্রি বসুন্ধরে॥
ত্রায়স্ব মাং বিশালাক্ষি ভক্তানামার্ত্তিনাশিনি।
নমামি শিরসা দেবীং বন্ধনোঽস্তু বিমোচিতঃ॥*

* আর্য্যাস্তোত্র দেখ।

দ্বাদশ সংখ্যা

একটি গীত

"শোন্ প্রসন্ন, তোকে একটি গীত শুনাইব।"

প্রসন্ন গোয়ালিনী বলিল, "আমার এখন গান শুনিবার সময় নয়—দুধ যোগাবার বেলা হলো।"

কমলাকান্ত। "এসো এসো বঁধু এসো।"

প্রসন্ন। "ছি ছি ছি! আমি কি তোমার বঁধু?"

কমলাকান্ত। "বালাই। ষাট, তুমি কেন বঁধু হইতে যাইবে? আমার গীতে আছে"—

এসো এসো বঁধু এসো আধ আঁচরে বসো—

সুর করিয়া আমি কীর্তন ধরাতে প্রসন্ন দুধের কেঁড়ে রাখিয়া বসিল, আমি গীতটি আদ্যপান্ত গায়িলাম। .

"এসো এসো, বঁধু এসো আধ আঁচরে বসো,
নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি।
অনেক দিবসে মনের মানসে,
তোমা ধনে মিলাইল বিধি।
মণি নও মাণিক নও যে হার ক'রে গলে পরি
ফুল নও যে কেশের করি বেশ।
নারী না করিত বিধি, তোমা হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ॥
বঁধু তোমায় যখন পড়ে মনে,
আমি চাই বৃন্দাবন পানে,
আলুইলে কেশ নাহি বাঁধি।
রন্ধনশালাতে যাই, তুয়া বঁধু গুণ গাই,
ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি।"

মিল ত চমৎকার, "দেখি" আর "বিধি" মিলিল? কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায়, এইরূপ মোহ মন্ত্র আর একটি শুনিব, মনে বড় সাধ রহিয়াছে। যখনই এই গান প্রথম কর্ণ ভরিয়া শুনিয়াছিলাম, মনে হইয়াছিল, নীলাকাশতলে ক্ষুদ্র পক্ষী হইয়া এই গীত গাই—মনে হইয়াছিল, সেই বিচিত্র সৃষ্টিকুশলী কবির সৃষ্টি দৈববংশী লইয়া, মেঘের

উপর যে বায়ুস্তর—শব্দশূন্য, দৃশ্যশূন্য, পৃথিবী যেখান হইতে দেখা যায় না, সেইখানে বসিয়া, সেই মুরলীতে, একা এই গীত গাই—এ গীত কখন ভুলিতে পারিলাম না; কখন ভুলিতে পারিব না।

"এসো এসো বঁধু এসো" *

লোকের মনে কি আছে বলিতে পারি না, কিন্তু আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী, বুঝিতে পারি না যে, ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিতে কিছু সুখ আছে। যে পশু ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির জন্য পরনন্দর্শনের আকাঙ্ক্ষী, সে যেন কখন কমলাকান্ত শর্ম্মার দপ্তর-মুক্তাবলী পড়িতে বসে না। আমি বিলাসপ্রিয়ের মুখে "এসো এসো বঁধু এসো" বুঝিতে পারি না। কিন্তু ইহা বুঝিতে পারি যে, মনুষ্য মনুষ্যের জন্য হইয়াছিল—এক হৃদয় অন্য হৃদয়ের জন্য হইয়াছিল—সেই হৃদয়ে হৃদয়ে সংঘাত, হৃদয়ে হৃদযে মিলন, ইহা মনুষ্য-জীবনের সুখ। ইহজন্মে মনুষ্যহৃদয়ে একমাত্র তৃষা, অন্যহৃদযকামনা। মনুষ্য-হৃদয় অনবরত হৃদয়ান্তরকে ডাকিতেছে, "এসো এসো বঁধু এসো।" ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবৃত্তিসকল শরীর রক্ষার্থ—মহতী প্রবৃত্তিসকলের উদ্দেশ্য, "এসো এসো বঁধু এসো।" তুমি চাকরি কর, খাইবার জন্য—কিন্তু যশের আকাঙ্ক্ষা কর, পরের অনুরাগ লাভ করিবার জন্য, জনসমাজের হৃদয়কে তোমার হৃদয়ের সঙ্গে মিলিত করিবার জন্য। তুমি যে পরোপকার কর, সে পরের হৃদযের ক্লেশ আপন হৃদয়ে অনুভব কর বলিয়া। তুমি যে রাগ কর, সে তোমার মনোমত কার্য্য হইল না বলিয়া; হৃদয় হৃদয়ে আসিল না বলিয়া। সর্ব্বত্র এই রব—"এসো এসো বঁধু এসো।" সর্ব্বকর্ম্মের এই মন্ত্র, "এসো এসো বঁধু এসো।" জড়জগতের নিয়ম আকর্ষণ। বৃহৎ গ্রহ উপগ্রহকে ডাকিতেছে, "এসো এসো বঁধু এসো।" সৌর পিণ্ড বৃহৎ গ্রহকে ডাকিতেছে, "এসো এসো বঁধু এসো।" জগৎ জগদন্তরকে ডাকিতেছে, "এসো এসো বঁধু এসো।" পরমাণু পরমাণুকে অবিরত ডাকিতেছে, "এসো এসো বঁধু এসো।" জড়পিণ্ডসকল গ্রহ উপগ্রহ ধূমকেতু—সকলেই এই মোহমন্ত্রে বাঁধা পড়িয়া ঘুরিতেছে। প্রকৃতি পুরুষকে ডাকিতেছে, "এসো এসো বঁধু এসো।" জগতের এই গম্ভীর অবিশ্রান্ত ধ্বনি—"এসো এসো বঁধু এসো।" কমলাকান্তের বঁধু কি আসিবে?

"আঁধ আঁচরে বসো।"

এই তৃণশষ্পসমাচ্ছন্ন, কণ্টকাদিতে কর্কশ সংসারারণ্যে, হে বাঞ্ছিত! তোমাকে আর কি আসন দিব, আমার এই হৃদয়াবরণের অর্দ্ধেকে উপবেশন কর। কুশকণ্টকাদি হইতে তোমার আচ্ছাদন জন্য, আমি এই আপন অঙ্গ অনাবৃত করিতেছি—আমার

* পাঠককে গীতের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে হইবে।

আঁচরে বসো। যাহাতে আমাব লজ্জারক্ষা, মানরক্ষা যাহাতে আমার শোভা, হে মিলিত। তুমিও তাহার অর্দ্ধেক গ্রহণ কর—আধ আঁচরে বসো। হে পরের হৃদয়, হে সুন্দর, হে মনোরঞ্জন, হে সুখদ! কাছে এসো, আমাকে স্পর্শ কর, আমি তোমাতে সংলগ্ন হইব,—দূরে আসনগ্রহণ করিও না—এই আমার শরীরলগ্ন অঞ্চলার্দ্ধে বসো। হে কমলাকান্ত। হে দুর্বিনীত! হে আজন্মবিবাহশূন্য! তুমি এতদর্থে শান্তিপুরে কন্যাদার আঁচলের আধখানা বুঝিও না। তুমি যে অঞ্চলার্দ্ধে বসিবে, তাহার তাঁতি আজও জন্মে নাই, মনের নগ্নত্ব জ্ঞান-বস্ত্রে আবৃত; অর্দ্ধেকে তোমার হৃদয় আবৃত রাখ, অর্দ্ধেকে বাঞ্ছিতকে বসাও। তুমি মূর্খ—তথাপি তোমার অপেক্ষা মূর্খ যদি কেহ থাকে, তাহাকে ডাক—"এসো এসো বঁধু এসো—আধ আঁচরে বসো।"

"নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।"

কেহ কখন দেখিয়াছে? তুমি অনেক ধন উপার্জ্জন করিয়াছ—কখন নয়ন ভরিয়া আত্মধন দেখিতে পাইয়াছ? তুমি যশস্বী হইবার জন্য প্রাণপাত করিয়াছ—কিন্তু আত্মযশোরাশি দেখিয়া কবে তোমার নয়ন ভরিয়াছে? রূপতৃষ্ণায় তুমি ইহজীবন অতিবাহিত করিলে—যেখানে ফুলটি ফুটে, ফলটি দোলে, যেখানে পাখীটি উড়ে, যেখানে মেঘ ছুটে, গিরিশৃঙ্গ উঠে, নদী বহে, জল ঝরে, তুমি সেইখানে রূপের অনুসন্ধানে ফিরিয়াছ—যেখানে বালক, প্রফুল্ল মুখমণ্ডল আন্দোলিত করিয়া হাসে, যেখানে যুবতী ব্রীড়াভাবে ভাঙ্গা ভাঙ্গা হইয়া শঙ্কিতগমনে যায়, যেখানে প্রৌঢ়া নিতান্তস্ফুটিতা মধ্যাহ্নপদ্মিনীবৎ অকাতরে রূপের বিকাশ করে, তুমি সেইখানেই রূপের সন্ধানে ফিরিয়াছ, কখন নয়ন ভরিয়া রূপ দেখিয়াছ? দেখ নাই কি যে, কুসুম দেখিতে দেখিতে শুকায়, ফল দেখিতে দেখিতে পাকে, পড়ে, পচে, গলে; পাখী উড়িয়া যায়, মেঘ চলিয়া যায়, গিরি ধূমে লুকায়, নদী শুকায়, চাঁদ ডুবে, নক্ষত্র নিবিয়া যায়। শিশুর হাসি রোগে হরণ করে, যুবতীর ব্রীড়া—কিসে না যায়? প্রৌঢ়া বয়সে শুকাইয়া যায়। ইহা সংসারের দুরদৃষ্ট—কেহ কিছু নয়ন ভরিয়া দেখিতে পায় না। অথবা এই সংসারের শুভাদৃষ্ট—কেহ কিছু নয়ন ভরিয়া দেখিতে পায় না। গতিই সংসারে সুখ—চাঞ্চল্যই সংসারের সৌন্দর্য্য। নয়ন ভরে না। সে নয়ন আমরা পাই নাই। পাইলেই সংসার দুঃখময় হইত; পরিতৃপ্তি-রাক্ষসী আমাদের সকল সুখকে গ্রাস করিত। যে কারিগর এই পরিবর্ত্তনশীল সংসার, আর এই অতৃপ্য নয়ন সৃজন করিয়াছেন, তাঁহার কারিগরির উপর কারিগরি এই বাসনা, নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি। জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, নয়নও অতৃপ্য, অথচ বাসনা—নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।

হে রূপ! হে বাহ্য সৌন্দর্য্য! হে অন্তঃপ্রকৃতির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট! কাছে আইস, নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি। দূরে বসিলে দেখা হইবে না; কেন না, দেখা কেবল নয়নে নহে। সংস্পর্শে বা নৈকট্য ব্যতীত মনের বৈদ্যুতী বহে না—আমরা সর্ব্ব শরীরে দেখিযা থাকি! মন হইতে মনে বৈদ্যুতী চলিলে তবে নয়ন 'ভরিবে। হায়! কিসেই বা নযন ভরিবে! নয়নে যে পলক আছে!

"অনেক দিবসে, মনের মানসে
তোমা ধনে মিলাইল বিধি হে!"

আমি কখন কখন মনে করিয়া থাকি, কেবল দুঃখের পরিমাণ জন্যই দয়া করিযা বিধাতা দিবসের সৃষ্টি করিযাছিলেন। নহিলে কাল অপরিমেয়, মনুষ্য-দুঃখ অপরিমিত হইত। আমরা এখন বলিতে পারি যে, আমি দুই দিন, দুই মাস বা দুই বৎসর দুঃখভোগ করিতেছি; কিন্তু দিন রাত্রির পরিবর্ত্তন না থাকিলে, কালের পথ চিহ্নশূন্য হইলে, কে না বুঝিত যে, আমি অনন্ত কাল দুঃখভোগ করিতেছি? আশা তাহা হইলে দাঁড়াইবার স্থান পাইত না—এত দিন পরে আবার দুঃখান্ত হইবে, এ কথা কেহ ভাবিতে পারিত না—বৃক্ষাদিশূন্য অনন্ত প্রান্তরবৎ জীবনের পথ অনুত্তীর্য্য হইত—জীবনযাত্রা দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণাস্বরূপ হইত। অতএব এই বৃহৎ জগৎকেন্দ্র সূর্য্যের পথ আমাদের সুখ দুঃখের মানদণ্ড। দিবস-গণনায় সুখ আছে। সুখ আছে বলিয়াই দুঃখী জন দিবস গণিযা থাকে। দিবস-গণনা দুঃখবিনোদ। কিন্তু এমন দুঃখাও আছে যে, সে দিবস গণে না; দিবস-গণনা তাহার পক্ষে চিত্তবিনোদন নহে। আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী—পৃথিবীতে ভুলিয়া মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়াছি—সুখহীন, আশাহীন, উদ্দেশ্যশূন্য, আকাঙ্ক্ষাশূন্য আমি কি জন্য দিবস গণিব? এই সংসার-সমুদ্রে আমি ভাসমান তৃণ, সংসার-বাত্যায় আমি ঘূর্ণ্যমান ধূলিকণা, সংসারারণ্যে আমি নিষ্ফল বৃক্ষ—সংসারাকাশে আমি বারিশূন্য মেঘ—আমি কেন দিবস গণিব?

গণিব। আমার এক দুঃখ, এক সন্তাপ, এক ভরসা আছে। ১২০৩ সাল হইতে দিবস গণি। যে দিন বঙ্গে হিন্দুনাম লোপ পাইয়াছে, সেই দিন হইতে দিন গণি। যে দিন সপ্তদশ আশ্বারোহী বঙ্গজয় করিয়াছিল, সেই দিন হইতে দিন গণি। হায়! কত গণিব! দিন গণিতে গণিতে মাস হয়, মাস গণিত গণিতে বৎসর হয়, বৎসর গণিতে গণিতে শতাব্দী হয়, শতাব্দীও ফিরিয়া ফিরিয়া সাত বার গণি। কই, অনেক দিবসে মনের মানসে বিধি মিলাইল, কই? যাহা চাই, তাহা মিলাইল কই? মনুষ্যত্ব মিলিল কই? একজাতীয়ত্ব মিলিল কই? ঐক্য কই? বিদ্যা কই?

গৌরব কই? শ্রীহর্ষ কই? ভট্টনারায়ণ কই? হলায়ুধ কই? লক্ষ্মণসেন কই? আর কি মিলিবে না? হায়! সবারই ইপ্সিত মিলে, কমলাকান্তের মিলিবে না?

"মণি নও মাণিক নও, যে হার ক'রে গলে পরি—"

বিধাতা জগৎ জড়ময় করিয়াছেন কেন? রূপ জড়পদার্থ কেন? সকলই অশরীরী হইল না কেন? হইলে হৃদয়ে হৃদয়ে কেমন মিলিত। যদি রূপের শরীরে প্রয়োজন ছিল, তবে তোমায় আমার বিধাতা এক শরীর করেন নাই কেন? তাহা হইলে আর ত বিচ্ছেদ হইত না। এখন কি এক শরীর হয় না? আমার শরীরে এত স্থান আছে—তোমাকে তাহাতে কোথাও কি রাখিতে পারি না? তোমাকে কণ্ঠলগ্ন করিয়া হৃদয়ে বিলম্বিত করিয়া রাখিতে পারি না? হায়! তুমি মণি নও, মাণিক নও যে, হার করিয়া গলে পরি।

আর বঙ্গভূমি! তুমিই বা কেন মণি মাণিক্য হইলে না, তোমায় কেন আমি হার করিয়া, কণ্ঠে পরিতে পারিলাম না। তোমায় যদি কণ্ঠে পারিতাম, মুসলমান আমার হৃদয়ে পদাঘাত না করিলে তাহার পদরেণু তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। তোমায় সুবর্ণের আসনে বসাইয়া, হৃদয়ে দোলাইয়া দেশে দেশে দেখাইতাম। ইওরোপে, আমেরিকে, মিসরে, চীনে, দেখিত, তুমি আমার কি উজ্জ্বল মণি।

"আমায় নারী না করিত বিধি,
তোমা হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ!"

প্রথমে আহ্বান, "এসো এসো বঁধু এসো," পরে আদর, "আধ আঁচরে বসো," পরে ভোগ, "নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।" তখন সুখভোগকালীন পূর্ব্বদুঃখস্মৃতি— "অনেক দিবসে, মনের মানসে, তোমা ধনে মিলাইল বিধি।" সুখ দ্বিবিধ, সম্পূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ। অসম্পূর্ণ সুখ যথা,

"মণি নও মাণিক নও, যে হার ক'রে গলে পরি।"

পরে সম্পূর্ণ সুখ,

"আমায় নারী না করিত বিধি,
তোমা হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ।"

সম্পূর্ণ অসহ্য সুখের লক্ষণ, শারীরিক চাঞ্চল্য, মানসিক অস্থৈর্য্য। এ সুখ কোথায় রাখিব, লইয়া কি করিব, আমি কোথায় যাইব, এ সুখের ভার লইয়া কোথায় ফেলিব? এ সুখের ভার লইয়া আমি দেশে দেশে ফিরিব; এ সুখ এক

স্থানে ধরে না ; যেখানে যেখানে পৃথিবীতে স্থান আছে, সেইখানে সেইখানে এ সুখ লইয়া যাইব, এ জগৎ সংসার এই সুখে পূরাইব। সংসার এ সুখের সাগরে ভাসাইব ; মেরু হইতে মেরু পর্য্যন্ত সুখের তরঙ্গ নাচাইব, আপনি ডুবিয়া, উঠিয়া, ভাসিয়া, হেলিয়া ছুটিয়া বেড়াইব। এ সুখে কমলাকান্তের অধিকার নাই—এ সুখে বাঙ্গালির অধিকার নাই। সুখের কথাতেই বাঙ্গালির অধিকার নাই। গোপীর দুঃখ, বিধাতা গোপীকে নারী করিয়াছেন কেন—আমাদের দুঃখ, বিধাতা আমাদের নারী করেন নাই কেন—তাহা হইলে এ মুখ দেখাইতে হইত না।

সুখের কথায় বাঙ্গালির অধিকার নাই—কিন্তু দুঃখের কথায় আছে। কাতরোক্তি যত গভীর, যতই হৃদয়বিদারক হউক না কেন, তাহা বাঙ্গালির মর্ম্মোক্তি।—আর কাতরোক্তি, কোথায় বা নাই? নবপ্রসূত পক্ষিশাবক হইতে মহাদেবের শৃঙ্গধ্বনি পর্য্যন্ত সকলই কাতরোক্তি। সম্পূর্ণসুখে সুখীও সুখকালে পূর্ব্বদুঃখ স্মরণ করিয়া কাতরোক্তি করে। নহিলে সুখের সম্পূর্ণতা কি? দুঃখস্মৃতি ব্যতীত সুখের সম্পূর্ণতা কোথায়? সুখও দুঃখময়—

"তোমায় যখন পড়ে মনে,
আমি চাই বৃন্দাবন পানে,
আলুইলে কেশ নাহি বাঁধি।"

এই কথা সুখ দুঃখের সীমারেখা! যাহার নষ্ট সুখের স্মৃতি জাগরিত হইলে সুখের নিদর্শন এখনও দেখিতে পায়, সে এখনও সুখী—তাহার সুখ একেবারে লুপ্ত হয় নাই। তাহার বন্ধু, তাহার প্রিয়, বাঞ্ছিত—গিয়াছে, কিন্তু তাহার বৃন্দাবন আছে—মনে করিলে, সে সেই সুখভূমি পানে চাহিতে পারে। যাহার সুখ গিযাছে—সুখের নিদর্শন গিয়াছে—বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে, এখন আর চাহিবার স্থান নাই—সেই দুঃখী, অনন্ত দুঃখে দুঃখী। বিধবা যুবতী, মৃত পতির যত্নরক্ষিত পাদুকা হারাইলে, যেমন দুঃখে দুঃখী হয়, তেমনই দুঃখে দুঃখী।

আমার এই বঙ্গদেশের সুখের স্মৃতি আছে—নিদর্শন কই? দেবপালদেব, লক্ষ্মণসেন, জয়দেব, শ্রীহর্ষ,—প্রয়াগ পর্য্যন্ত রাজ্য, ভারতের অধীশ্বর নাম, গৌড়ী রীতি, এ সকলের স্মৃতি আছে, কিন্তু নিদর্শন কই? সুখ মনে পড়িল, কিন্তু চাহিব কোন্ দিকে? সে গৌড় কই? সে যে কেবল যবনলাঞ্ছিত ভগ্নাবশেষ! আর্য্য রাজধানীর চিহ্ন কই? আর্য্যের ইতিহাস কই? জীবনচরিত কই? কীর্ত্তি কই? কীর্ত্তিস্তম্ভ কই? সমরক্ষেত্র কই? সুখ গিয়াছে—সুখ-চিহ্নও গিয়াছে, বঁধু গিযাছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে—চাহিব কোন্ দিকে?

চাহিবার এক শ্মশান-ভূমি আছে,—নবদ্বীপ। সেইখানে সপ্তদশ যবনে বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল। বঙ্গমাতাকে মনে পড়িলে, আমি সেই শ্মশান-ভূমি প্রতি চাই। যখন দেখি, সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম বেড়িয়া অদ্যাপি সেই কলধৌতবাহিনী গঙ্গা তর তর রব করিতেছেন, তখন গঙ্গাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি—তুমি আছ, সে রাজলক্ষ্মী কোথায়? তুমি যাঁহার পা ধুযাইতে, সে মাতা কোথায়? তুমি যাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে, সেই আনন্দরূপিণী কোথায়? তুমি যাঁহার জন্য সিংহল, বালী, আরব, সুমাত্রা হইতে বুকে করিয়া ধন বহন করিয়া আনিতে, সে ধনেশ্বরী কোথায়? তুমি যাঁহার রূপের ছায়া ধরিয়া রূপসী সাজিতে, সে অনন্তসৌন্দর্য্যশালিনী কোথায়? তুমি যাঁহার প্রসাদি ফুল লইয়া ঐ স্বচ্ছ হৃদয়ে মালা পরিতে, সে পুষ্পভরণা কোথায়? সে রূপ সে ঐশ্বর্য্য কোথায় ধুইয়া লইয়া গিয়াছ? বিশ্বাসঘাতিনি, তুমি কেন আবার শ্রবণমধুর কল কল তর তর রবে মন ভুলাইতেছ? বুঝি তোমারই অতল গর্ভমধ্যে, যবনভয়ে ভীতা সেই লক্ষ্মী ডুবিয়াছেন, বুঝি কুপুত্রগণের আর মুখ দেখিবেন না বলিয়া ডুবিয়া আছেন। মনে মনে আমি সেই দিন কল্পনা করিয়া কাঁদি। মনে মনে দেখিতে পাই, মার্জ্জিত বর্শাফলক উন্নত করিয়া, অশ্বপদশব্দমাত্রে নৈশ নীরবতা বিঘ্নিত করিয়া, যবনসেনা নবদ্বীপে আসিতেছে। কাল পূর্ণ দেখিয়া নবদ্বীপ হইতে বাঙ্গালার লক্ষ্মী অন্তর্হিত হইতেছেন। সহসা আকাশ অন্ধকারে ব্যাপিল; রাজপ্রাসাদের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। পথিক ভীত হইয়া পথ ছাড়িল; নগরীর অলঙ্কার খসিয়া পড়িল; কুঞ্জবনে পক্ষিগণ নীরব হইল; গৃহময়ূরকণ্ঠে অর্দ্ধব্যক্ত কেকার অপরার্দ্ধ আর ফুটিল না। দিবসে নিশীথ উপস্থিত হইল, পণ্যবীথিকার দীপমালা নিবিয়া গেল, পূজাগৃহে বাজাইবার সময়ে শঙ্খ বাজিল না; পণ্ডিতে অশুদ্ধ মন্ত্র পড়িল; সিংহাসন হইতে শালগ্রামশিলা গড়াইয়া পড়িল। যুবার সহসা বলক্ষয় হইল, যুবতী সহসা বৈধব্য আশঙ্কা করিয়া কাঁদিল; শিশু বিনারোগে মাতার ক্রোড়ে শুইয়া মরিল। গাঢ়তর, গাঢ়তর, গাঢ়তর অন্ধকারে দিক্ ব্যাপিল; আকাশ, অট্টালিকা, রাজধানী, রাজবর্ত্ম, দেবমন্দির, পণ্যবীথিকা, সেই অন্ধকারে ঢাকিল—কুঞ্জতীরভূমি, নদীসৈকত, নদীতরঙ্গ সেই অন্ধকারে—আঁধার, আঁধার, আঁধার হইয়া লুকাইল। আমি চক্ষে সব দেখিতেছি—আকাশ মেঘে ঢাকিতেছে—ঐ সোপানাবলী অবতরণ করিয়া রাজলক্ষ্মী জলে নামিতেছেন। অন্ধকারে নির্ব্বাণোন্মুখ আলোকবিন্দুবৎ, জলে ক্রমে ক্রমে সেই তেজোরাশি বিলীন হইতেছে। যদি গঙ্গার অতল-জলে না ডুবিলেন, তবে আমার সেই দেশলক্ষ্মী কোথায় গেলেন?

ত্রয়োদশ সংখ্যা

বিড়াল

আমি শয়নগৃহে, চারপায়ীর উপর বসিয়া, হুঁকা হাতে, ঝিমাইতেছিলাম। একটু মিট্ মিট্ করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে—দেওয়ালের উপর চঞ্চল ছায়া, প্রেতবৎ নাচিতেছে। আহার প্রস্তুত হয় নাই—এজন্য হুঁকা হাতে, নিমীলিতলোচনে আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ন্ হইতাম, তবে ওয়াটার্লু জিতিতে পারিতাম কি না। এমত সময়ে একটি ক্ষুদ্র শব্দ হইল, "মেও!"

চাহিয়া দেখিলাম—হঠাৎ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমে মনে হইল, ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া, আমার নিকট আফিঙ্গ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। প্রথম উদ্যমে, পাষাণবৎ কঠিন হইয়া, বলিব মনে করিলাম যে, ডিউক মহাশয়কে ইতিপূর্ব্বে যথোচিত পুরস্কার দেওয়া গিয়াছে, এক্ষণে আর অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে না। বিশেষ অপরিমিত লোভ ভাল নহে। ডিউক বলিল, "মেও!"

তখন চক্ষু চাহিয়া ভাল করিয়া দেখিলাম যে, ওয়েলিংটন নহে। একটি ক্ষুদ্র মার্জ্জার; প্রসন্ন আমার জন্য যে দুগ্ধ রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা নিঃশেষ করিয়া উদরসাৎ করিয়াছে, আমি তখন ওয়াটার্লুর মাঠে ব্যূহ-রচনায় ব্যস্ত, অত দেখি নাই। এক্ষণে মার্জ্জারসুন্দরী, নির্জ্জল দুগ্ধপানে পরিতৃপ্ত হইয়া আপন মনের সুখ এ জগতে প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়ে, অতি মধুর স্বরে বলিতেছেন, "মেও।" বলিতে পারি না, বুঝি, তাহার ভিতর একটু ব্যঙ্গ ছিল; বুঝি, মার্জ্জার মনে মনে হাসিয়া আমার পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, "কেহ মরে বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই।" শব্দে একটু মন বুঝিবার অভিপ্রায় ছিল। বুঝি, বিড়ালের মনের ভাব—"তোমার দুধ ত খাইয়া বসিয়া আছি—এখন বল কি?"

বলি কি? আমি ত ঠিক করিতে পারিলাম না। দুধ আমার বাপেরও নয়। দুধ মঙ্গলার, দুহিয়াছে প্রসন্ন। অতএব সে দুগ্ধে আমারও যে অধিকার, বিড়ালেরও তাই; সুতরাং রাগ করিতে পারি না। তবে চিরাগত একটি প্রথা আছে যে, বিড়ালে দুধ খাইয়া গেলে, তাহাকে তাড়াইয়া মারিতে যাইতে হয়। আমি যে সেই চিরাগত প্রথার অবমাননা করিয়া মনুষ্যকুলে কুলাঙ্গারস্বরূপ পরিচিত হইব, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। কি জানি, এই মার্জ্জারী যদি স্বজাতিমণ্ডলে কমলাকান্তকে কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করে? অতএব পুরুষের ন্যায় আচরণ করাই বিধেয়।

ইহা স্থির করিয়া সকাতরচিত্তে, হস্ত হইতে হুঁকা নামাইয়া, অনেক অনুসন্ধানে এক ভগ্ন যষ্টি আবিষ্কৃত করিয়া সগর্ব্বে মার্জ্জারী প্রতি ধাবমান হইলাম।

মার্জ্জারী কমলাকান্তকে চিনিত ; সে যষ্টি দেখিয়া বিশেষ ভীত হওয়ার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না। কেবল আমার মুখপানে চাহিয়া হাই তুলিয়া, একটু সরিয়া বসিল। বলিল, "মেও!" প্রশ্ন বুঝিতে পারিয়া যষ্টি ত্যাগ করিয়া পুনরপি শয্যায় আসিয়া হুঁকা লইলাম। তখন দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইয়া, মার্জ্জারের বক্তব্যসকল বুঝিতে পারিলাম।

বুঝিলাম যে, বিড়াল বলিতেছে, "মারপিট কেন? স্থির হইয়া, হুঁকা হাতে করিয়া, একটু বিচার করিয়া দেখ দেখি? এ সংসারের ক্ষীর, সর, দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, মাংস, সকলই তোমরা খাইবে, আমরা কিছু পাইব না কেন? তোমরা মনুষ্য, আমরা বিড়াল, প্রভেদ কি? তোমাদের ক্ষুৎপিপাসা আছে—আমাদের কি নাই? তোমরা খাও, আমাদের আপত্তি নাই ; কিন্তু আমরা খাইলেই তোমরা কোন্ শাস্ত্রানুসারে ঠেঙ্গা লাঠি লইয়া মারিতে আইস, তাহা আমি বহু অনুসন্ধানে পাইলাম না। তোমরা আমার কাছে কিছু উপদেশ গ্রহণ কর। বিজ্ঞ চতুষ্পদের কাছে শিক্ষালাভ ব্যতীত তোমাদের জ্ঞানোন্নতির উপায়ান্তর দেখি না। তোমাদের বিদ্যালয়সকল দেখিয়া আমার বোধ হয়, তোমরা এত দিনে এ কথাটি বুঝিতে পারিয়াছ।

"দেখ, শয্যাশায়ী মনুষ্য। ধর্ম্ম কি? পরোপকারই পরম ধর্ম্ম। এই দুগ্ধটুকু পান করিয়া আমার পরম উপকার হইয়াছে। তোমার আহরিত দুগ্ধে এই পরোপকার সিদ্ধ হইল—অতএব তুমি সেই পরম ধর্ম্মের ফলভাগী—আমি চুরিই করি, আর যাই করি, আমি তোমার ধর্ম্মসঞ্চয়ের মূলীভূত কারণ। অতএব আমাকে প্রহার না কবিয়া, আমার প্রশংসা কর। আমি তোমার ধর্ম্মের সহায়।

"দেখ, আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি? খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখ, যাঁহারা বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা অনেকে চোর অপেক্ষাও অধার্ম্মিক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি যে মুখ তুলিয়া চাহেন না, ইহাতেই চোরে চুরি করে। অধর্ম্ম চোরের নহে—চোরে যে চুরি করে, সে অধর্ম্ম কৃপণ ধনীর। চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শত গুণে দোষী। চোরের দণ্ড হয় ; চুরির মূল যে কৃপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন?

"দেখ, আমি প্রাচীরে প্রাচীরে মেও মেও করিয়া বেড়াই, কেহ আমাকে মাছের কাঁটাখানাও ফেলিয়া দেয় না। মাছের কাঁটা, পাতের ভাত, নর্দ্দামায় ফেলিয়া দেয়, জলে ফেলিয়া দেয়, তথাপি আমাকে ডাকিয়া দেয় না। তোমাদের পেট ভরা, আমার পেটের ক্ষুধা কি প্রকারে জানিবে! হায়! দরিদ্রের জন্য ব্যথিত হইলে তোমাদের কি কিছু অগৌরব আছে? আমার মত দরিদ্রের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া, লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। যে কখন অন্ধকে মুষ্টি-ভিক্ষা দেয় না, সেও একটা বড় রাজা ফাঁপরে পড়িলে রাত্রে ঘুমায় না—সকলেই পরের ব্যথায় ব্যথিত হইতে রাজি। তবে ছোটলোকের দুঃখে কাতর! ছি! কে হইবে?

"দেখ, যদি অমুক শিরোমণি, কি অমুক ন্যায়ালঙ্কার, আসিয়া তোমার দুধটুকু খাইয়া যাইতেন, তবে তুমি কি তাঁহাকে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আসিতে? বরং যোড়হাত করিয়া বলিতে, আর একটু কি আনিয়া দিব? তবে আমার বেলা লাঠি কেন? তুমি বলিবে, তাঁহারা অতি পণ্ডিত, বড় মান্য লোক। পণ্ডিত বা মান্য বলিয়া কি আমার অপেক্ষা তাঁহাদের ক্ষুধা বেশী? তা ত নয়—তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্যজাতির রোগ—দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না। যে খাইতে বলিলে বিরক্ত হয়, তাহার জন্য ভোজের আয়োজন কর—আর যে ক্ষুধার জ্বালায় বিনা আহ্বানেই তোমার অন্ন খাইয়া ফেলে, চোর বলিয়া তাহার দণ্ড কর—ছি! ছি!

"দেখ, আমাদিগের দশা দেখ, প্রাচীরে প্রাচীরে, প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে, প্রাসাদে প্রাসাদে, মেও মেও করিয়া আমরা চারি দিক্ দৃষ্টি করিতেছি—কেহ আমাদিগকে মাছের কাঁটাখানা ফেলিয়া দেয় না! যদি কেহ তোমাদের সোহাগের বিড়াল হইতে পারিল—গৃহমার্জ্জার হইয়া, বৃদ্ধের নিকট যুবতী ভার্য্যার সহোদর বা মূর্খ ধনীর কাছে সতরঞ্চ খেলওয়ারের স্থানীয় হইয়া থাকিতে পারিল—তবেই তাহার পুষ্টি। তাহার লেজ ফুলে, গায়ে লোম হয়, এবং তাহাদের রূপের ছটা দেখিয়া, অনেক মার্জ্জার কবি হইয়া পড়ে।

"আর আমাদিগের দশা দেখ—আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গুল বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে—জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে—অবিরত আহারাভাবে ডাকিতেছি, "মেও! মেও! খাইতে পাই না!—" আমাদের কালো চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না! এ পৃথিবীর মৎস্য মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও—নহিলে চুরি করিব। আমাদের কৃষ্ণ চর্ম্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণ সকরুণ মেও মেও শুনিয়া তোমাদিগের কি দুঃখ হয় না? চোরের দণ্ড আছে, নির্দ্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই

কেন ? তুমি কমলাকান্ত, দূরদর্শী ; কেন না, আফিংখোর ; তুমিও কি দেখিতে পাও না যে, ধনীর দোষেই দরিদ্রে চোর হয় ? পাঁচ শত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া এক জনে পাঁচ শত লোকের আহার্য্য সংগ্রহ করিবে কেন ? যদি করিল, তবে সে খাইযা তাহার যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন ? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে ; কেন না, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।"

আমি আর সহ্য করিতে না পারিযা বলিলাম, "থাম ! থাম মার্জ্জারপণ্ডিতে ! তোমার কথাগুলি ভারি সোশিযালিষ্টিক ! সমাজবিশৃঙ্খলার মূল ! যদি যাহার যত ক্ষমতা, সে তত ধনসঞ্চয় করিতে না পায়, অথবা সঞ্চয় করিয়া চোরের জ্বালায় নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিতে না পায়, তবে কেহ আর ধনসঞ্চযে যত্ন করিবে না। তাহাতে সমাজের ধনবৃদ্ধি হইবে না।"

মার্জ্জার বলিল, "না হইল ত আমার কি ? সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের কি ক্ষতি ?"

আমি বুঝাইয়া বলিলাম যে, "সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই।" বিড়াল রাগ করিযা বলিল যে, "আমি যদি খাইতে না পাইলাম, তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কি করিব ?"

বিড়ালকে বুঝান দায় হইল ! যে বিচারক বা নৈযাযিক, কস্মিন্ কালে কেহ তাহাকে কিছু বুঝাইতে পারে না। এ মার্জ্জার সুবিচারক, এবং সুতার্কিকও বটে, সুতরাং না বুঝিবার পক্ষে ইহার অধিকার আছে। অতএব ইহার উপর রাগ না করিয়া বলিলাম, "সমাজের উন্নতিতে দরিদ্রের প্রয়োজন না থাকিলে না থাকিতে পারে, কিন্তু ধনীদিগের বিশেষ প্রয়োজন, অতএব চোরের দণ্ডবিধান কর্ত্তব্য।"

মার্জ্জারী মহাশযা বলিলেন, "চোরকে ফাঁসি দাও, তাহাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটি নিযম কর। যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন, তিনি আগে তিন দিবস উপবাস করিবেন। তাহাতে যদি তাঁহার চুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা না করে, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে চোরকে ফাঁসি দিবেন। তুমি আমাকে মারিতে লাঠি তুলিয়াছিলে, তুমি অদ্য হইতে তিন দিবস উপবাস করিয়া দেখ। তুমি যদি ইতিমধ্যে নসীরামবাবুর ভাণ্ডারঘরে ধরা না পড়, তবে আমাকে ঠেঙ্গাইযা মারিও, আমি আপত্তি করিব না।"

বিজ্ঞ লোকের মত এই যে, যখন বিচারে পরাস্ত হইবে, তখন গম্ভীরভাবে উপদেশ প্রদান করিবে। আমি সেই প্রথানুসারে মার্জ্জারকে বলিলাম যে, "এ সকল

অতি নীতিবিরুদ্ধ কথা, ইহার আন্দোলনেও পাপ আছে। তুমি এ সকল দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মাচরণে মন দাও। তুমি যদি চাহ, তবে পাঠার্থে তোমাকে আমি নিউমান ও পার্করের গ্রন্থ দিতে পারি। আর কমলাকান্তের দপ্তর পড়িলেও কিছু উপকার হইতে পারে—আর কিছু হউক বা না হউক, আফিঙ্গের অসীম মহিমা বুঝিতে পারিবে। এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর, প্রসন্ন কাল কিছু ছানা দিবে বলিয়াছে, জলযোগের সময় আসিও, উভয়ে ভাগ করিয়া খাইব। অদ্য আর কাহারও হাঁড়ি খাইও না; বরং ক্ষুধায় যদি নিতান্ত অধীরা হও, তবে পুনর্ব্বার আসিও, এক সরিষাভোর আফিঙ্গ দিব।"

মার্জ্জার বলিল, "আফিঙ্গের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তবে হাঁড়ি খাওয়ার কথা, ক্ষুধানুসারে বিবেচনা করা যাইবে।"

মার্জ্জার বিদায় হইল। একটি পতিত আত্মাকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিয়াছি, ভাবিয়া কমলাকান্তের বড় আনন্দ হইল।

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

চতুর্দ্দশ সংখ্যা

ঢেঁকি

আমি ভাবি কি, যদি পৃথিবীতে ঢেঁকি না থাকিত, তবে খাইতাম কি? পাখীর মত দাঁড়ে বসিয়া ধান খাইতাম? না, লাঙ্গুলকর্ণদুল্যমানা গজেন্দ্রগামিনী গাভীর মত মরাইয়ে মুখ দিতাম? নিশ্চয় তাহা আমি পারিতাম না—নবযুবা কৃষ্ণকায় বস্ত্রশূন্য কৃষাণ আসিয়া আমার পঞ্জরে যষ্টিপাত করিত, আর আমি ফোঁস্ করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া শৃঙ্গ লাঙ্গুল লইয়া পলাইতাম। আর্য্যসভ্যতার অনন্ত মহিমায় সে ভয় নাই—ঢেঁকি আছে—ধান চাল হয়। আমি এই পরোপকার-নিরত ঢেঁকিকে আর্য্যসভ্যতার এক বিশেষ ফল মনে করি—আর্য্যসাহিত্য, আর্য্যদর্শন আমার মনে ইহার কাছে লাগে না—রামায়ণ, কুমারসম্ভব, পাণিনি, পতঞ্জলি, কেহ ধানকে চাল করিতে পারে না। ঢেঁকিই আর্য্যসভ্যতার মুখোজ্জ্বলকারী পুত্র,—শ্রাদ্ধাধিকারী,—নিত্য পিণ্ডদান করিতেছে। শুধু কি ঢেঁকিশালে? সমাজে, সাহিত্যে, ধর্ম্মসংস্কারে, রাজসভায়,—কোথায় না ঢেঁকি আর্যসভ্যতার মুখোজ্জ্বলকারী পুত্র,—শ্রাদ্ধাধিকারী, নিত্য পিণ্ডদান করিতেছে। দুঃখের মধ্যে ইহাতেও

আর্য্যসভ্যতা মুক্তিলাভ করিল না, আজিও ভূত হইয়া রহিয়াছে। ভরসা আছে, কোন ঢেঁকি অচিরাৎ তাহার গয়া করিবে।

ঢেঁকির এই অপরিমেয় মাহাত্ম্যের কারণানুসন্ধানে আমি বড় সমুৎসুক হইলাম। এ ঊনবিংশ শতাব্দী, বৈজ্ঞানিক সময—অবশ্য কারণ অনুসন্ধান করিতে হয। কোথা হইতে ঢেঁকির এই কার্য্যদক্ষতা! এই পরোপকারে মতি। এই Public spirit? নাবস্তুনা বস্তুসিদ্ধিঃ?—বিনা কারণে কি ইহা জন্মে? অনুসন্ধানার্থ আমি ঢেঁকিশালে গেলাম।

দেখিলাম, ঢেঁকি খানায পড়িতেছে। বিন্দুমাত্র মদ্যপান কবে নাই, তথাপি পুনঃ পুনঃ খানায় পড়িতেছে, উঠিতেছে, বিরতি নাই। ভাবিলাম, মুহুর্মুহুঃ খানায পডাই কি এত মাহাত্ম্যের কারণ? ঢেঁকি খানায পড়ে বলিয়াই কি এত পরোপকারে মতি? এতটা Public sprit? ভাবিলাম—না, কখনই হইতে পারে না। কেন না, আমার বামচন্দ্র ভাযাও দুই বেলা খানায পডিযা থাকেন—কিন্তু কই, তাঁহার ত কিছু মাত্র Public spirit নাই। শৌণ্ডিকালয়ের বাহিরে ত তাঁহার পরোপকার কিছু দেখি না। আরও—মনের কথা লুকাইলে কি হইবে? আমিও—আমি শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী স্বযং, এক দিন খানায পড়েছিলাম। দ্রাক্ষাবসেব বিকারবিশেষের সেবনে আমার সেই গর্ত্তলোক প্রাপ্তি ঘটে নাই—কারণান্তরে। প্রসন্ন গোয়ালিনী—গোপাঙ্গনাকুল-কলঙ্কিনী,—এক দিন তাহার মঙ্গলা গাইকে ছাড়িয়া দিয়াছিল। ছাড়িবামাত্র মঙ্গলা, ঊর্দ্ধপুচ্ছে, প্রণতশৃঙ্গে ধাবমানা। কি ভাবিযা মঙ্গলা ছুটিল, তা বলিতে পারি না,—স্ত্রীজাতি ও গোজাতির মনের কথা কি প্রকারে বলিব? কিন্তু আমি ভাবিলাম, আমিই তাহার উভয শৃঙ্গের একমাত্র লক্ষ্য। তখন আমি কটিদেশ দৃঢ়তর বদ্ধ করিযা, সদর্পে বদ্ধপরিকর হইযা, ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়মান। পশ্চাতে সেই ভীষণা ঘটোঘ্নী রাক্ষসী। আমিও যত দৌড়াই, সেও তত দৌড়ায়। কাজেই, দৌড়ের চোটে ওচট খাইয়া, গড়াইতে গডাইতে গড়াইতে, চন্দ্রসূর্য্য গ্রহনক্ষত্রের ন্যায় গড়াইতে গড়াইতে গড়াইতে—বিবরলোক প্রাপ্তি। "আলু থালু কেশ পাশ, মুখে না বহিছে শ্বাস"—হায! তখন কি আমার হৃদয়-আকাশ মধ্যে Public spirit রূপ পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছিল? না হইয়াছিল, এমত নহে। তখন আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে, বসুন্ধরা যদি গোশূন্যা হযেন, আব নাবিকেল, তাল, খর্জ্জুর প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে দুগ্ধনিঃসরণ হয়, তবে এই দুগ্ধপোষ্য বাঙ্গালিজাতির বিশেষ উপকার হয। তাহারা শৃঙ্গভীতিশূন্য হইয়া দুগ্ধ পান করিতে থাকে। সে দিন সেই বিবরপ্রাপ্তি হেতু আমার পরহিতকামনা এত দূর প্রবল

হইয়াছিল যে, আমি প্রসন্নকে সময়ান্তরে বলিয়াছিলাম, "অয়ি দধিদুগ্ধক্ষীরনবনীত-পরিবেষ্টিতা গোপকন্যে! তুমি গোরুগুলি বিক্রয় করিয়া স্বয়ং লাউ ভুসি খাইতে থাক, তুমি স্বয়ং ঘটোঘ্নী হইয়া বহুতর দুগ্ধপোষ্য প্রতিপালন করিতে পারিবে,—কাহাকেও শুঁতাইও না।" প্রত্যুত্তরে প্রসন্ন হঠাৎ সম্মার্জ্জনী হস্তে গ্রহণ করায় সে দিন আমাকে পরহিতব্রত পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

অতএব পরহিতেচ্ছা, দেশবাৎসল্য 'সাধারণ আত্মা' অর্থাৎ Public spirit, বিশেষতঃ কার্য্যদক্ষতা, এ সকল খানায পড়িলে হয় কি না? যদি না হয, তবে ঢেঁকির এ কার্য্যদক্ষতা, এ মহাবল কোথা হইতে আসিল? আমি এই কূটতর্কের মীমাংসার জন্য সন্দিহানচিত্তে ভাবিতেছিলাম, এমত সমযে মধুরকণ্ঠে কে বলিল, "চক্রবর্ত্তী মহাশয়! হাঁ করিয়া কি ভাবিতেছ? ঢেঁকি কখনও দেখ নাই?"

চাহিয়া দেখিলাম, তরঙ্গিণী মাতঙ্গিণী দুই ভগিনী ঢেঁকিতে পাড় দিতেছে। সে দিকে এতক্ষণ চাহিযা দেখি নাই। হাতী দেখিতে গিযা অন্ধ কেবল শুণ্ড দেখিযাছিল, আমিও ঢেঁকি দেখিতে গিয়া কেবল ঢেঁকির শুঁড় দেখিতেছিলাম। পিছনে যে দুই জনের দুইখানি রাঙ্গা পা ঢেঁকির পিঠে পড়িতেছে, তাহা দেখিয়াও দেখি নাই। দেখিবামাত্র যেন কে আমার চোখের ঠুলি খুলিয়া লইল।

আমার দিব্য জ্ঞানের উদয় হইল—কার্য্যকারণসম্বন্ধপরম্পরা আমার চক্ষে প্রখর সূর্য্যকিরণে প্রভাসিত হইল—ঐ ত ঢেঁকির বল। ঐ ত ঢেঁকির মাহাত্ম্যের মূল কারণ!—ঐ রমণীপাদপদ্ম! ধপাধপ পাদপদ্ম পিঠে পড়িতেছে, আর ঢেঁকি ধান ভানিয়া চাল করিতেছে। উঠিয়া পড়িয়া—ঢক ঢক কচ কচ! কত পরোপকারই করিতেছে! হায় ঢেঁকি! ও পাযের কি এত গুণ! পিঠে পাইয়া তুমি এই সাত কোটি বাঙ্গালিকে অন্ন দিতেছ—তার উপর আবার দেবতার ভোগ দিতেছ! এস, মেয়ে মানুষের শ্রীচরণ! তুমি ভাল করিয়া ঢেঁকির পিঠে পড়, আমি কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়া তোমায়—হায়! কি করিব?—কাঁসার মল পরাই!

আর ভাই, ঢেঁকির দল! তোমাদের বিদ্যাবুদ্ধি বুঝিয়াছি। যখনই পিঠে রমণী-পাদপদ্ম ওরফে মেয়ে লাথি পড়ে, তখনই তোমরা ধান ভান—নহিলে কেবল কাঠ—দারুময়—গর্ত্তে শুঁড় লুকাইয়া, লেজ উঁচ করিয়া, ঢেঁকিশালে পড়িয়া থাক। বিদ্যার মধ্যে খানায় পড়া, আনন্দের মধ্যে "ধান্য"; পুরস্কারের মধ্যে সেই রাঙ্গা পা। আবার শুনিতে পাই তোমাদের একটি বিশেষ গুণ আছে নাকি?—ঘরে থাকিয়া নাকি মধ্যে মধ্যে কুমীর হও? আর ভাই ঢেঁকি, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—মধ্যে মধ্যে স্বর্গে যাওয়া হয় শুনিয়াছি, সত্য সত্যই কি সেখানে গিয়াও ধান ভানিতে হয়?

দেবতারা সকলে অমৃত খায়, পারিজাত লোফে, অপ্সরা লইয়া ক্রীড়া করে, মেঘে চড়ে, বিদ্যুৎ ধরে, রতি রতিপতির সঙ্গে লুকোচুরি খেলে—তুমি নাকি ততক্ষণ কেবল ঘেচর ঘেচর করিয়া ধান ভান ? ধন্য সাধ্য ভাই তোমার !

ঢেঁকি কোন উত্তর দিল না, কেবলই ধান ভানে। রাগ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলাম—একেবারে কমলাশ্রমে। কমলাশ্রমটা কি ? ৺ননীবাবু সম্প্রতি ধান ভানিতে গিয়াছেন। নিপ্রত্যাশী নাপিতানী একখানি ভাঙ্গা চালা ঘর রাখিয়া উত্তরাধিকারি-বিরহিতা হইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছে—ঘরখানির এমনি অবস্থা যে, আর কেহ তাহার কামনা করিল না—সুতরাং আমি তাহাতে কমলাশ্রম করিয়াছি—কেবল কমলাকান্তের আশ্রম নহে—সাক্ষাৎ কমলার আশ্রম। আমি সেইখানে চারপাইর উপর পড়িয়া আফিঙ্গ চড়াইলাম। তখন চক্ষু বুজিয়া আসিল। জ্ঞাননেত্র উদয় হইল। দেখিলাম, এ সংসার কেবল ঢেঁকিশাল। বড় বড় ইমারত, বৈঠকখানা, রাজপুরী সব ঢেঁকিশালা—তাহাতে বড় বড় ঢেঁকি, গড়ে নাক পুরিয়া খাড়া হইয়া রহিয়াছে। কোথাও জমিদাররূপ ঢেঁকি, প্রজাদিগের হৃৎপিণ্ড গড়ে পিষিয়া, নূতন নিরিখ-রূপ চাউল বাহির করিয়া সুখে সিদ্ধ করিয়া অন্ন ভোজন করিতেছেন। কোথাও আইনকারক ঢেঁকি, মিনিট রিপোর্টের রাশি গড়ে পিষিয়া, ভানিয়া বাহির করিতেছেন—আইন ; বিচারক ঢেঁকি সেই আইনগুলি গড়ে পিষিয়া বাহির করিতেছেন—দারিদ্র্য, কারাবাস—ধনীর ধনান্ত—ভাল মানুষের দেহান্ত। বাবু ঢেঁকি, বোতল গড়ে পিতৃধন পিষিয়া বাহির করিতেছেন—পিলে যকৃৎ ; তাঁর গৃহিণী ঢেঁকি একাদশীর গড়ে বাজার খরচ পিষিয়া বাহির করিতেছেন—অনাহার। সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক দেখিলাম লেখক ঢেঁকি—সাক্ষাৎ মা সরস্বতীর মুণ্ড ছাপার গড়ে পিষিয়া বাহির করিতেছেন—স্কুলবুক।

দেখিতে দেখিতে দেখিলাম—আমিও একটা মস্ত ঢেঁকি—কমলাশ্রমে লম্বমান হইয়া পড়িয়া আছি ; নেশার গড়ে মনোদুঃখ ধান্য পিষিয়া দপ্তর চাউল বাহির করিতেছি। মনে মনে অহঙ্কার জন্মিল—এমন চাউল ত কাহারও গড়ে হইতেছে না। তখন ইচ্ছা হইল—এ চাউল মনুষ্য-লোকের উপযুক্ত নহে, আমি স্বর্গে গিয়া ধান ভানিব। তখনই স্বর্গে গেলাম—"অশ্বমনোরথে।" স্বর্গে গিয়া, দেবরাজকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, "হে দেবেন্দ্র ! আমি শ্রীকমলাকান্ত ঢেঁকি—স্বর্গে ধান ভানিব।"

দেবেন্দ্র বলিলেন, "আপত্তি কি—পুরস্কার চাই কি ?"

আমি। উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা।

দেবরাজ। উর্ব্বশী মেনকা পাইবে না—আর যাহা চাহিলে, তাহা ত মর্ত্ত্যলোকেও তুমি পাইয়া থাক,—আটটার হিসাবে।

আমি দুর্ম্মুখ—বলিলাম, "কি ঠাকুর, অষ্টরম্ভা! সে কি আজকাল নরলোকের পাবার যো আছে? সে আজকাল দেবতাদেরই একচেটে।"

সন্তুষ্ট হইয়া দেবরাজ আমাকে বক্‌শিশ হুকুম করিলেন,—এক সের অমৃত, আর এক ঘণ্টার জন্য উর্ব্বশীর সঙ্গীত। চৈতন্য হইয়া দেখিলাম, পাশে ঘটিতে এক সের দুগ্ধ,—আর প্রসন্ন, দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছে—"নেশাখোর!" "বিটুলে!" "পেটার্থী!" ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি উর্ব্বশীকে বলিলাম, "বাইজি! এক ঘণ্টা হইয়াছে—এখন বন্ধ কর।"

কমলাকান্তের পত্র

প্রথম সংখ্যা

কি লিখিব?

পূজ্যপাদ

শ্রীযুক্ত বঙ্গদর্শন* সম্পাদক মহাশয়

শ্রীচরণকমলেষু।

আমার নাম শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী, সাবেক নিবাস শ্রীশ্রী৺নসিধাম, আপনাকে আমি প্রণাম করি। আপনার নিকট আমার সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচয় নাই, কিন্তু আপনি নিজগুণে আমার বিশেষ পরিচয় লইয়াছেন, দেখিতেছি। ভীষ্মদেব খোশ্‌নবীস জুয়াচোর লোক, আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম—আমি দপ্তরটি তাঁহার নিকট গচ্ছিত রাখিয়া তীর্থদর্শনে যাত্রা করিয়াছিলাম; তিনি সেই অবসর পাইয়া সেইটি আপনাকে বিক্রয় করিয়াছেন। বিক্রয় কথাটি আপনি স্বীকার করেন নাই, কিন্তু আমি জানি, ভীষ্মদেব ঠাকুর বিনামূল্যে শালগ্রামকে তুলসী দেন না, বিনামূল্যে যে আপনাকে শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত দপ্তর দিবেন, এমত সম্ভাবনা অতি

*"কমলাকান্তের দপ্তর" বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত হয়। যখন এই পত্রগুলি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়, তখন সঞ্জীববাবু ইহার সম্পাদক।

বিরল। এই জুয়াচুরির কথা আমি এত দিন জানিতাম না। দৈবাধীন একটি যোড়া জুতা কিনিয়া এ সন্ধান পাইলাম। একখানি ছাপার কাগজে জুতা যোড়াটি বান্ধা ছিল, দেখিয়া ভাবিতেছিলাম যে, কাহার এমন সৌভাগ্যের উদয় হইল যে, তাহার রচনা শ্রীমৎ কমলাকান্ত শর্ম্মার চরণযুগলের ব্যবহার্য্য পাদুকাদ্বয় মণ্ডন করিতেছে! মনে করিলাম, সার্থক তাহার লেখনীধারণ! সার্থক তাহার নিশীথ-তৈলদাহ! মূর্খের দ্বারা তাহার রচনা পঠিত না হইয়া সাধু জনের চরণের সঙ্গে যে কোন প্রকার সম্বন্ধযুক্ত হইয়াছে, ইহা বঙ্গীয় লেখকের সৌভাগ্য। এই ভাবিয়া কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া পড়িয়া দেখিলাম যে, কাগজখানি কি। পড়িলাম, উপরে লেখা আছে, "বঙ্গদর্শন।" ভিতরে লেখা আছে, "কমলাকান্তের দপ্তর।" তখন বুঝিলাম যে, আমারি এ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতির ফল।

আরও একটু কৌতূহল জন্মিল। বঙ্গদর্শন কি, তাহা জানিবার ইচ্ছা হইল। এক জন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "মহাশয়, বঙ্গদর্শনটা কি, তাহা বলিতে পারেন?" তিনি অনেকক্ষণ ভাবিলেন। অনেকক্ষণ পরে মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "বোধ হয় বঙ্গদেশ দর্শন করাই বঙ্গদর্শন।" আমি তাঁহার পাণ্ডিত্যের অনেক প্রশংসা করিলাম, কিন্তু অগত্যা অন্য বন্ধুকেও ঐ প্রশ্ন করিতে হইল। অন্য বন্ধু সিদ্ধান্ত করিলেন যে, শকারের উপর যে রেফটি আছে, বোধ হয়, তাহা মুদ্রাকরের ভ্রম; শব্দটি "বঙ্গদশন," অর্থাৎ বাংলার দাঁত। আমি তাহাকে চতুষ্পাঠী খুলিতে পরামর্শ দিয়া অন্য এক সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বঙ্গ শব্দে পূর্ব্ব-বাঙ্গালা ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, "ইহার অর্থ পূর্ব্ব-বাঙ্গালা দর্শন করিবার বিধি;" অর্থাৎ "A Guide to Eastern Bengal." এইরূপ বহু প্রকার অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে জানিতে পারিলাম যে, বঙ্গদর্শন একখানি মাসিক পত্রিকা এবং তাহাতে কমলাকান্ত শর্ম্মার মাসিক পিণ্ডদান হইয়া থাকে। এক্ষণে আবার শুনিতেছি, কোন ধনুর্দ্ধর ঐ দপ্তরগুলি নিজ প্রণীত বলিয়া প্রচারিত করিয়াছেন। আরও কত হবে!

অতএব হে বঙ্গদর্শন-সম্পাদক মহাশয়! অবগত হউন যে, আমি শ্রীকমলাকান্ত শর্ম্মা সশরীরে ইহজগতে অদ্যাপি অধিষ্ঠান করিতেছি এবং আপনাদিগের বিশেষ আপত্তি থাকিলেও আরও কিছুদিন অধিষ্ঠান করিব এমত ইচ্ছা রাখি।

এক্ষণে কি জন্য আপনাকে অদ্য পত্র লিখিতেছি, তাহা অবগত হউন। উপরে দেখিতে পাইবেন, "শ্রীশ্রী৺নসিধাম" লিখিয়াছি। অর্থাৎ আমার নসিবাবু শ্রীশ্রী৺ ঈশ্বরে বিলীন হইয়াছেন! ভরসা করি যে, তিনি সর্ব্বাশ্রয় শ্রীপাদপদ্মে পৌঁছিয়াছেন,

কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার গতি কোন্ পথে হইয়াছে, তাহার নিশ্চিত সম্বাদ আমি রাখি না। কেবল ইহাই জানি যে, ইহলোকে তিনি নাই। অতএব আমারও আশ্রয় নাই! অহিফেনের কিছু গোলযোগ হইয়া উঠিযাছে। তাহার কিছু বন্দোবস্ত করিতে পারেন? আমার দপ্তরের জন্য আপনি খোশনবীস মহাশয়কে কি দিয়াছিলেন বলিতে পারি না; কিন্তু আমাকে এক আধ পোয়া আফিঙ্গ পাঠাইলেই (আমার মাত্রা কিছু বেশী) আমি এক একটি প্রবন্ধ পাঠাইতে পারিব। আপনার মঙ্গল হউক । আপনি ইহাতে দ্বিরুক্তি করিবেন না।

কিন্তু আপনার সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত পাকাপাকি করিবার আগে, গোটা কত কথা জিজ্ঞাসা আছে। এ কমলাকান্তি কলে, ফরমাযেস মত সকল রকমের রচনা প্রস্তুত হয়—আপনার চাই কি? নাটক নভেল চাই, না পলিটিক্সের দরকার? কিছু ঐতিহাসিক গবেষণা পাঠাইব, না সংক্ষিপ্ত সমালোচনার বাহার দিব? বিজ্ঞানশাস্ত্রে আপনার প্রসক্তি, না ভৌগোলিকতত্ত্ব রসে আপনি সুরসিক? স্থূল কথাটা, গুরু বিষয় পাঠাইব, না লঘু বিষয় পাঠাইব? আমার রচনার মূল্য, আপনি গজ দরে দিবেন, না মণ দরে দিবেন? আর যদি গুরু বিষয়েই আপনার অভিরুচি হয়, তবে বলিবেন, তাহার কি প্রকার অলঙ্কার সমাবেশ করিব। আপনি কোটেশ্যন ভালবাসেন, না ফুটনোটে আপনার অনুরাগ? যদি কোটেশ্যন বা ফুটনোটের প্রয়োজন হয়, তবে কোন্ ভাষা হইতে দিব, তাহাও লিখিবেন। ইওরোপ ও আশিয়ার সকল ভাষা হইতেই আমার কোটেশ্যন সংগ্রহ করা হইয়াছে—আফ্রিকা ও আমেরিকার কতকগুলি ভাষার সন্ধান পাই নাই। কিন্তু সেই সকল ভাষার কোটেশ্যন, আমি অচিরাৎ প্রস্তুত করিব, আপনি চিন্তিত হইবেন না।

যদি গুরু বিষয়ক রচনা আপনার নিতান্ত মনোনীত হয়, তবে কি প্রকার গুরু বিষয়ে আপনার আকাঙ্ক্ষা তাহাও জানাইবেন। আমি স্বয়ং সে দিকে কিছু করিতে পারি না পারি, আমার এক বড়-সহায় জুটিয়াছে। ভীষ্মদেব খোশনবীস মহাশয়ের পুত্র যিনি ইউটিলিটি শব্দের আশ্চর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন,* তাঁহাকে আপনার স্মরণ থাকিতে পারে। তিনি এক্ষণে কৃতবিদ্য হইয়াছেন। এম. এ. পাস করিয়া বিদ্যার ফাঁস গলায় দিয়াছেন। গুরু বিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার। ইস্কুলের বহি চাই কি? তিনি বর্ণপরিচয় হইতে রোমদেশের ইতিহাস পর্য্যন্ত সকলই লিখিতে পারেন। ন্যাচরল্ হিষ্টরির একশেষ করিয়া রাখিয়াছেন; পুরাতন পেনি মেগেজিন্ হইতে

*ইউ—টিল—ইটি—আই।

অনক প্রবন্ধের অনুবাদ করিয়া রাখিয়াছেন, এবং গোল্ডস্মিথ কৃত এনিমেটেড্ নেচরের সারাংশ সঙ্কলন করিয়া রাখিয়াছেন। সে সব চাই কি? গুরুর মধ্যে গুরু যে পাটীগণিত এবং জ্যামিতি, তাহাতেও সাহসশূন্য নহেন। জ্যামিতি এবং ত্রিকোণমিতি চুলোয যাক, চতুষ্কোণমিতিতেও তাঁহার অধিকার—দৈববিদ্যাবলে তিনি আপনার পৈতৃক চতুষ্কোণ পুকুরটিও মাপিয়া ফেলিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, শুনিযা লোকে ধন্য ধন্য করিয়াছিল। তাঁহার ঐতিহাসিক কীর্ত্তির কথা কি বলিব? তিনি চিতোরের রাজা আলফ্রেড দি গ্রেটের একখানি জীবন-চরিত দশ পনের পৃষ্ঠা লিখিয়া রাখিযাছেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্য-সমালোচন-বিষয়ক একখানি গ্রন্থ মহাভারত হইতে সঙ্কলিত করিয়া রাখিযাছেন। তাহাতে কোমত ও হর্বট স্পেন্সরের মত খণ্ডন আছে; এবং ডারুইন যে বলেন, যে মাধ্যাকর্ষণের বলে পৃথিবী স্থির আছে, তাহারও প্রতিবাদ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে মালতীমাধব হইতে চারি পাঁচটা শ্লোক উদ্ধৃত করা হইযাছে, সুতরাং একখানি মোটের উপরে ভারি রকমের গুরুবিষয়ক গ্রন্থ হইয়া উঠিয়াছে। ভরসা করি, সমালোচনাকালে আপনারা বলিবেন, বাঙ্গালা ভাষায় ইহা অদ্বিতীয়।

ভরসা কবি, গুরু বিষয ছাড়িযা লঘু বিষয়ে আপনার অভিরুচি হইবে না। কেন না, সে সকলের কিছু অসুবিধা। খোশনবীসপুত্র একখানি নাটকের সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখিয়াছেন বটে; নায়িকার নাম চন্দ্রকলা, কি শশিরম্ভা রাখিবেন স্থির করিয়াছেন,—তাঁহার পিতা বিজযপুরের রাজা ভীমসিংহ; আর নায়ক আর একটা কিছু সিংহ; এবং শেষ অঙ্কে শশিরম্ভা নায়কের বুকে ছুরি মারিয়া আপনি হা হতোঽস্মি করিয়া পুড়িয়া মরিবেন, এই সকল স্থির করিয়াছেন। কিন্তু নাটকের আদ্য ও মধ্যভাগ কি প্রকার হইবে, এবং অন্যান্য "নাটকোল্লিখিত ব্যক্তিগণ" কিরূপ করিবেন, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। শেষ অঙ্কের ছুরি-মারা সিনের কিছু লিখিয়া রাখিয়াছেন; এবং আমি শপথপূর্ব্বক আপনার নিকট বলিতে পারি যে, যে কুড়ি ছত্র লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে আটটা "হা, সখি!" এবং তেরটা "কি হলো! কি হলো!" সমাবেশ করিয়াছেন। শেষে একটি গীতও দিয়াছেন—নায়িকা ছুরি হস্তে করিয়া গাহিতেছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, নাটকের অন্যান্য অংশ কিছুই লেখা হয নাই।

যদি নবেলে আপনার আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহা হইলেও আমরা অর্থাৎ খোশনবীস কোম্পানী কিছু অপ্রস্তুত নহি। আমরা উত্তম নবেল লিখিতে পারি, তবে কি না ইচ্ছা ছিল যে, বাজে নবেল না লিখিয়া ডনকুইক্‌সোট বা জিলব্লার পরিশিষ্ট লিখিব।

দুর্ভাগ্যবশতঃ দুইখানি পুস্তকেব একখানিও এ পর্য্যন্ত আমাদের পড়া হয নাই। সম্প্রতি মেকলের এসের পরিশিষ্ট লিখিযা দিলে আপনার কার্য্য হইতে পারে কি ? সেও নবেল বটে।

যদি কাব্য চাহেন, তবে মিত্রাক্ষর অমিত্রাক্ষর বিশেষ করিযা বলিবেন। মিত্রাক্ষর আমাদের হইতে হইবে না—আমরা পযাব মিলাইতে পারি না। তবে অমিত্রাক্ষর যত বলিবেন, তত পারিব। সম্প্রতি খোশনবীসের ছানা, জীমূতনাদবধ বলিযা একখানি কাব্যের প্রথম খণ্ড লিখিয়া রাখিযাছেন, ইহা প্রায় মেঘনাদবধের তুল্য—দুই চারিটা নামের প্রভেদ আছে মাত্র। চাই ?

আর যদি লঘু গুরু সব ছাড়িয়া, খোশনবিসী রচনা ছাড়িযা, সাফ কমলাকান্তি ঢঙ্গে আপনাব রুচি হয, তবে তাও বলুন, আমার প্রণীত ছাই ভস্ম যাহা কিছু লেখা থাকে, তাহা পাঠাই। মনে থাকে যেন, তাহার বিনিময়ে আফিঙ্গ লইব। ওজন কড়ায় গণ্ডায বুঝিয়া লইব—এক তিল ছাড়িব না!

আপনি কি রাজি ? আপনি রাজি হউন বা না হউন, আমি রাজি।

দ্বিতীয় সংখ্যা

পলিটিকৃস্

শ্রীচরণেষু, আফিঙ্গ পাইয়াছি। অনেকটা আফিঙ্গ পাঠাইয়াছেন—শ্রীচরণকমলেষু। আপনার শ্রীচরণকমলযুগলেষু—আরও কিছু আফিঙ্গ পাঠাইবেন।

কিন্তু শ্রীচরণকমলযুগল হইতে কমলাকান্তের প্রতি এমন কঠিন আজ্ঞা কি জন্য হইয়াছে, বুঝিতে পারিলাম না। আপনি লিখিযাছেন যে, এক্ষণে নয় আইনে অন্যত্র কিছু পলিটিকৃস্ কম পড়িবে—তুমি কিছু পলিটিকৃস্ ঝাড়িলে ভাল হয়। কেন মহাশয ? আমি কি দোষ করিযাছি যে, পলিটিকৃস্ সবজেক্টরূপী আমা ইট মাথায মারিব ? কমলাকান্ত ক্ষুদ্রজীবী ব্রাহ্মণ, তাহাকে পলিটিকৃস্ লিখিবার আদেশ কেন করিয়াছেন ? কমলাকান্ত স্বার্থপর নহে—আফিঙ্গ ভিন্ন জগতে আমার স্বার্থ নাই, আমার উপর পলিটিকেল চাপ কেন ? আমি রাজা, না খোসামুদে, না জুয়াচোর না ভিক্ষুক, না সম্পাদক, যে আমাকে পলিটিকৃস্ লিখিতে বলেন ? আপনি আমার দপ্তর পাঠ করিয়াছেন, কোথায আমার এমন স্থূল বুদ্ধির চিহ্ন পাইলেন যে, আমাকে পলিটিকৃস্ লিখিতে বলেন ? আফিঙ্গের জন্য আমি আপনার খোসামোদ করিযাছি বটে, কিন্তু তাই বলিযা আমি এমন স্বার্থপর চাটুকার অদ্যাপি হই নাই যে, পলিটিকৃস্

লিখি। ধিক্ আপনার সম্পাদকতায়! ধিক্ আপনার আফিঙ্গ দানে! আপনি আজিও বুঝিতে পারেন নাই যে, কমলাকান্ত শর্ম্মা উচ্চাশয় কবি, কমলাকান্ত ক্ষুদ্রজীবী পলিটিশ্যন নহে।

আপনার আদেশ প্রাপ্তে বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া এক পতিত বৃক্ষের কাণ্ডোপরি উপবেশন করিয়া বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের বুদ্ধিবৈপরীত্য ভাবিতেছিলাম। কি করি! ভরিটাক্ আফিঙ্গ গলদেশের অধোভাগে যেন তেন প্রকারেণ প্রেরণ করিলাম। সম্মুখে শিবে কলুর বাড়ী—বাড়ীর প্রাঙ্গণে দুই তিনটা বলদ বাঁধা আছে—মাটিতে পোঁতা নাদায় কলুপত্নীর হস্ত-মিশ্রিত খলি-মিশান ললিত বিচালিচূর্ণ গোগণ মুদিতনয়নে, সুখের আবেশে কবলে গ্রহণ করিয়া ভোজন করিতেছিল। আমি কতকটা স্থিরচিত্ত হইলাম—এখানে ত পলিটিক্স্ নাই। এই নাদার মধ্য হইতে গোগণ পলিটিক্স্-বিকার-শূন্য অকৃত্রিম সুখ পাইতেছে—দেখিয়া তৃপ্ত হইলাম। তখন অহিফেন-প্রসাদ-প্রসন্ন চিত্তে লোকের এই পলিটিক্স্প্রিয়তা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমার তখন বিদ্যাসুন্দর যাত্রার একটি গান মনে পড়িল।

বোবার ইচ্ছা কথা ফুটে,
খোঁড়ার ইচ্ছা বেড়ায় ছুটে,
তোমার ইচ্ছা বিদ্যা ঘটে
ইচ্ছা বটে ইত্যাদি।

আমাদের ইচ্ছা পলিটিক্স্—হপ্তায় হপ্তায় রোজ রোজ পলিটিক্স্; কিন্তু বোবার বাক্চাতুরীর কামনার মত, খঞ্জের দ্রুতগমনের আকাঙ্ক্ষার মত অন্ধের চিত্রদর্শনলালসার মত, হিন্দু বিধবার স্বামিপ্রণয়াকাঙ্ক্ষার মত আমার মনে আদরের আদরিণী গৃহিণীর আদরের সাধের মত, হাস্যাস্পদ, ফলিবার নহে। ভাই পলিটিক্স্ওয়ালারা, আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী তোমাদিগের হিতবাক্য বলিতেছি, পিয়াদার শ্বশুরবাড়ী আছে, তবু সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছিল, তাহাদের পলিটিক্স্ নাই। "জয় রাধে কৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গো!" ইহাই তাহাদের পলিটিক্স্! তদ্ভিন্ন অন্য পলিটিক্স্ যে গাছে ফলে তাহার বীজ এ দেশের মাটিতে লাগিবার সম্ভাবনা নাই!

এইরূপ ভাবিতেছিলাম, ইত্যবসরে দেখিলাম, শিবু কলুর পৌত্র দশমবর্ষীয় বালক, এক কাঁসি ভাত আনিয়া উঠানে বসিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। দূর হইতে একটি শ্বেতকৃষ্ণ কুক্কুর তাহা দেখিল। দেখিয়া, একবার দাঁড়াইয়া, চাহিয়া চাহিয়া, ক্ষুণ্ণ

মনে জিহ্বা নিষ্কৃত করিল। অমল-ধবল অন্নরাশি কাংস্যপাত্রে কুসুমদামবৎ বিরাজ করিতেছে—কুকুরের পেটটা দেখিলাম, নিতান্ত পড়িয়া আছে। কুকুর চাহিয়া চাহিয়া, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, এক বার আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া হাই তুলিল।

তার পর ভাবিয়া চিন্তিয়া ধীরে ধীরে এক এক পদ অগ্রসর হইল, এক এক বার কলুর পুত্রের অন্নপরিপূরিত বদন প্রতি আড়নয়নে কটাক্ষ করে, এক এক পা এগোয়। অকস্মাৎ অহিফেন-প্রসাদে দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিলাম—দেখিলাম, এই ত পলিটিক্‌স্,—এই কুকুর ত পলিটিশ্যন! তখন মনোভিনিবেশপূর্ব্বক দেখিতে লাগিলাম যে, কুকুর পাকা পলিটিকেল চাল চালিতে আরম্ভ করিল। কুকুর দেখিল—কলুপুত্র কিছু বলে না—বড় সদাশয় বালক—কুকুর কাছে গিয়া, থাবা পাতিয়া বসিল। ধীরে ধীরে লাঙ্গুল নাড়ে, আর কলুর পোর মুখপানে চাহিয়া, হ্যা-হ্যা করিয়া হাঁপায়। তাঁহার ক্ষীণ কলেবর, পাতলা পেট, কাতর দৃষ্টি এবং ঘন ঘন নিঃশ্বাস দেখিয়া কলুপুত্রের দয়া হইল, তাহার পলিটিকেল এজিটেশ্যন সফল হইল;—কলুপুত্র একখানা মাছের কাঁটা উত্তম করিয়া চুষিয়া লইয়া, কুকুরের দিকে ফেলিয়া দিল। কুকুর আগ্রহ সহকারে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া, তাহা চর্ব্বণ, লেহন, গেলন এবং হজমকরণে প্রবৃত্ত হইল। আনন্দে তাহার চক্ষু বুজিয়া আসিল।

যখন সেই মৎস্যকণ্টকসম্বন্ধে এই সুমহৎ কার্য্য উত্তমরূপে সমাপন হইল, তখন সেই সুচতুর পলিটিশ্যনের মনে হইল যে, আর একখানা কাঁটা পাইলে ভাল হয়। এইরূপ ভাবিয়া, পলিটিশ্যন আবার বালকের মুখপানে চাহিয়া রহিল। দেখিল, বালক আপন মনে গুড় তেঁতুল মাখিয়া ঘোর রবে ভোজন করিতেছে—কুকুর পানে আর চাহে না। তখন কুকুর একটি bold move অবলম্বন করিল—জাত পলিটিশ্যন, না হবে কেন? সেই রাজনীতিবিদ্ সাহসে ভর করিয়া একটু অগ্রসর হইয়া বসিলেন। আর এক বার হাই তুলিলেন। তাহাতেও কলুর ছেলে চাহিয়া দেখিল না। অতঃপর কুকুর মৃদু মৃদু শব্দ করিতে লাগিলেন। বোধ হয়, বলিতেছিলেন, হে রাজাধিরাজ কলুপুত্র! কাঙ্গালের পেট ভরে নাই। তখন কলুর ছেলে তাহার পানে চাহিয়া দেখিল। আর মাছ নাই—এক মুষ্টি ভাত কুকুরকে ফেলিয়া দিল। পুরন্দর যে সুখে নন্দনকাননে বসিয়া সুধা পান করেন, কার্ডিনেল উল্‌সি বা কার্ডিনেল জেরেজ যে সুখে কার্ডিনেলের টুপি পরিয়াছিলেন, কুকুর সেই সুখে সেই অন্নমুষ্টি ভোজন করিতে লাগিল। এমত সময়ে, কলুগৃহিণী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। ছেলের কাছে একটা কুকুর ম্যাক্ ম্যাক্ করিয়া ভাত খাইতেছে—দেখিয়া কলুপত্নী রোষ-কষায়িত-লোচনে এক ইষ্টকখণ্ড লইয়া কুকুর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।

রাজনীতিজ্ঞ তখন আহত হইয়া, লাঙ্গুলসংগ্রহপূর্ব্বক বহুবিধ রাগ রাগিণী আলাপচারী করিতে করিতে দ্রুতবেগে পলায়ন কবিল।

এই অবসরে আর একটি ঘটনা দৃষ্টিগোচব হইল। যত ক্ষণ ক্ষীণজীবী কুক্কুব আপন উদরপূর্ত্তির জন্য বহুবিধ কৌশল করিতেছিল, তত ক্ষণ এক বৃহৎকায় বৃষ আসিয়া কলুর বলদের সেই খোলবিচালি-পরিপূর্ণ নাদায মুখ দিযা জাব্না খাইতেছিল —বলদ বৃষের ভীষণ শৃঙ্গ এবং স্থূলকায দেখিযা, মুখ সরাইযা চুপ করিযা দাঁড়াইযা কাতরনযনে তাহার আহারনৈপুণ্য দেখিতেছিল। কুক্কুরকে দূরীকৃত করিয়া, কলুগৃহিণী এই দস্যুতা দেখিতে পাইয়া এক বংশখণ্ড লইযা বৃষকে গোভাগাড়ে যাইবার পরামর্শ দিতে দিতে তৎপ্রতি ধাবমানা হইলেন। কিন্তু ভাগাড়ে যাওয়া দূরে থাকুক—বৃষ এক পদও সরিল না—এবং কলুগৃহিণী নিকটবর্ত্তিনী হইলে বৃহৎ শৃঙ্গ হেলাইয়া, তাঁহার হৃদয়মধ্যে সেই শৃঙ্গাগ্রভাগ প্রবেশের সম্ভাবনা জানাইযা দিল। কলুপত্নী তখন রণে ভঙ্গ দিযা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বৃষ অবকাশমতে নাদা নিঃশেষ করিয়া হেলিতে দুলিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

আমি ভাবিলাম যে, এও পলিটিক্স্। দুই রকমের পলিটিক্স্ দেখিলাম—এক কুক্কুরজাতীয়, আর এক বৃষজাতীয। বিস্মার্ক এবং গর্শাকফ এই বৃষের দরের পলিটিশ্যন—আর উল্‌সি হইতে আমাদের পরমাত্মীয রাজা মুচিরাম রায় বাহাদুর পর্য্যন্ত অনেকে এই কুক্কুরের দলেব পলিটিশ্যন।

তৃতীয় সংখ্যা

বাঙ্গালির মনুষ্যত্ব

মহাশয়! আপনাকে পত্র লিখিব কি—লিখিবার অনেক অনেক শত্রু। আমি এখন যে কুঁড়ে ঘরে বাস করি, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার পাশে গোটা দুই তিন ফুলগাছ পুঁতিয়াছি। মনে করিয়াছিলাম, কমলাকান্তের কেহ নাই—এই ফুলগুলি আমার সখা সখী হইবে। খোসামোদ করিয়া ইহাদের ফুটাইতে হইবে না—টাকা ছড়াইতে হইবে না, গহনা দিতে হইবে না, মনযোগান গোছ কথা বলিতে হইবে না, আপনার সুখে উহারা আপনি ফুটিবে। উহাদের হাসি আছে—কান্না নাই; আমোদ আছে—রাগ নাই। মনে করিলাম, যদি প্রসন্ন গোযালিনী আমাকে ত্যাগ করিয়াছে, তবে এই ফুলের সঙ্গে প্রণয় করিব।

তা, ফুল ফুটিল—তারা হাসিল। মনে করিলাম—মহাশয় ওগো! কিছু মনে

করিতে না করিতে, ফুটন্ত ফুল দেখিয়া ভোমরার দল,—লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে, ভোমরা বোল্‌তা মৌমাছি—বহুবিধ রসক্ষেপা রসিকের দল, আসিয়া আমার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তখন গুন্ গুন্ ভন্ ভন্ ঝন্ ঝন্ ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিয়া হাড জ্বালাইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগকে অনেক বুঝাইয়া বলিলাম যে, হে মহাশযগণ! এ সভা নহে, সমাজ নহে, এসোসিয়েশ্যন, লীগ, সোসাইটি, ক্লাব প্রভৃতি কিছুই নহে—কমলাকান্তের পর্ণকুটীর মাত্র, আপনাদিগের ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিতে হয়, অন্যত্র গমন করুন—আমি কোন রিজলিউশ্যনই দ্বিতীযিত করিতে প্রস্তুত নহি; আপনারা স্থানান্তরে প্রস্থান করুন। গুন্ গুনের দল, তাহাতে কোন মতে সম্মত নহে—বরং ফুলগাছ ছাড়িয়া আমার কুটীরের ভিতর হল্লা করিতে আরম্ভ করিযাছে। এই মাত্র আপনাকে এক পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছিলাম—(আফিঙ্গ ফুরাইযাছে) —এমত সমযে এক ভ্রমর কুচকুচে কালো আসল বৃন্দাবনী কালাচাঁদ, ভোঁ করিযা ঘরের ভিতর উডিযা আসিযা কানের কাছে ঘ্যান্ ঘ্যান্ আরম্ভ করিলেন—লিখিব কি, মহাশয?

ভ্রমর বাবাজি নিশ্চিত মনে করেন, তিনি বড় সুরসিক—বড সম্বক্তা—তাঁহার ঘ্যান্‌ঘ্যানানিতে আমার সর্ব্বাঙ্গ জুডাইযা যাইবে। আমারই ফুলগাছের ফুলের পাপড়ি ছিঁড়িযা আসিয়া আমারই কানের কাছে ঘ্যান্ ঘ্যান্? আমার রাগ অসহ্য হইযা উঠিল; আমি তালবৃন্ত হস্তে ভ্রমরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। তখন আমি ঘূর্ণন, বিঘূর্ণন, সংঘূর্ণন প্রভৃতি বহুবিধ বক্রগতিতে তালবৃন্তাস্ত্র সঞ্চালন করিতে লাগিলাম; ভ্রমরও ডীন, উড্ডীন, প্রডীন, সমাডীন প্রভৃতি বহুবিধ কৌশল দেখাইতে লাগিল। আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী—দপ্তর-মুক্তাবলীর প্রণেতা, কিন্তু হায়, মনুষ্যবীর্য্য! তুমি অতি অসার! তুমি চিরদিন মনুষ্যকে প্রতারিত করিযা শেষে আপন অসারতা প্রমাণীকৃত কর। তুমি জামার ক্ষেত্রে হানিবলকে, পলটোবার ক্ষেত্রে চার্লসকে, ওযাটর্লুর ক্ষেত্রে নেপোলিযনকে, এবং আজি এই ভ্রমরসমরে কমলাকান্তকে বঞ্চিত করিলে! আমি যত পাখা ঘুরাইয়া বাযু সৃষ্টি করিযা ভ্রমরকে উড়াইতে লাগিলাম, ততই সে দুরাত্মা ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমার মাথামুণ্ড বেড়িযা চোঁ বোঁ করিতে লাগিল। কখনও সে আমার বস্ত্রমধ্যে লুক্কায়িত হইয়া, মেঘের আড়াল হইতে ইন্দ্রজিতের ন্যায় রণ করিতে লাগিল, কখনও কুম্ভকর্ণনিপাতী রামসৈন্যের ন্যায় আমার বগলের নীচে দিয়া ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল; কখনও স্যাম্পসনের ন্যায শিরোরুহমধ্যে আমার বীর্য্য সংস্থিত মনে করিয়া আমার শরন্নীরদনিন্দিত কুঞ্চিত শ্বেতকৃষ্ণ কেশদামমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভেরী বাজাইতে লাগিল। তখন দংশনভয়ে অস্থির হইয়া রণে ভঙ্গ

দিলাম। ভ্রমর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল। সেই সময়ে চৌকাঠ পায়ে বাধিয়া কমলাকান্ত—"পপাত ধরণীতলে!!!" এই সংসারসমরে মহারথী শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী—যিনি দারিদ্র্য, চিরকৌমার এবং অহিফেন প্রভৃতির দ্বারাও কখনও পরাজিত হয়েন নাই—হায়! তিনি এই ক্ষুদ্র পতঙ্গ কর্ত্তৃক পরাজিত হইলেন।

তখন ধূল্যবলুণ্ঠিত শরীরে দ্বিরেফরাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলাম,—"হে দ্বিরেফসত্তম! কোন্ অপরাধে দুঃখী ব্রাহ্মণ তোমার নিকট অপরাধী যে, তুমি তাহার লেখাপড়ার ব্যাঘাত করিতে আসিয়াছ? দেখ আমি এই বঙ্গদর্শনে পত্র লিখিতে বসিয়াছি—পত্র লিখিলে আফিঙ্গ আসিবে—তুমি কেন ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিযা তাহার বিঘ্ন কর?" আমি প্রাতে একখানি বাঙ্গালা নাটক পড়িতেছিলাম—তখন অকস্মাৎ সেই নাটকীয় রাগগ্রস্ত হইয়া বলিতে লাগিলাম—"হে ভৃঙ্গ! হে অনঙ্গরঙ্গতরঙ্গবিক্ষেপকারিন্! হে দুর্দ্দান্ত পাষণ্ডভণ্ডচিত্তলণ্ডভণ্ডকারিন্! হে উদ্যানবিহারিন্—কেন তুমি ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিতেছ? হে ভৃঙ্গ! হে দ্বিরেফ! হে ষট্‌পদ! হে অলে! হে ভ্রমর! হে ভোমরা! হে ভোঁ ভোঁ!—"

ভ্রমর ঝুপ করিয়া আসিয়া সামনে বসিল। তখন গুন্ গুন্ করিয়া গলা দুরস্ত করিয়া বলিতে লাগিল—আমি অহিফেনপ্রসাদে সকলেরই কথা বুঝিতে পারি—আমি স্থিরচিত্তে শুনিতে লাগিলাম।

ভৃঙ্গরাজ বলিতে লাগিলেন, "হে বিপ্র! আমার উপর এত চোট কেন? আমি কি একাই ঘ্যান্-ঘেনে! তোমার এ বঙ্গভূমে জন্মগ্রহণ করিযা ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিব না ত কি করিব? বাঙ্গালি হইয়া কে ঘ্যান্ ঘ্যানানি ছাড়া? কোন্ বাঙ্গালির ঘ্যান্ ঘ্যানানি ছাড়া অন্য ব্যবসা আছে? তোমাদের মধ্যে যিনি রাজা মহারাজা কি এমনি একটা কিছু মাথায় পাগড়ি ও হইলেন, তিনি গিয়া বেল্‌ভিডিয়রে ঘ্যান্ ঘ্যান্ আরম্ভ করিলেন। যিনি হইবেন উমেদার, তিনি গিযা রাত্রিদিবা রাজদ্বারে ঘ্যান্ ঘ্যান্ করেন। যিনি কেবল একটি চাকরির উমেদওযার—তাঁর ঘ্যান্ ঘ্যানানির ত আর অন্ত নাই। বাঙ্গালি বাবু যিনিই দুই চারিটা ইংরেজী বোল শিখিয়াছেন, তিনি অমনি উমেদওয়াররূপে পরিণত হইযা, দরখাস্ত বা টিকিট হাতে দ্বারে দ্বারে ঘ্যান্ ঘ্যান্—ডাঁশমাছির মত খাবার সময়ে, শোবার সময়ে, বস্‌বার সময়ে, দাঁড়াবার সময়ে, দিনে, রাত্রে, প্রাহ্লে, অপরাহ্লে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে—ঘ্যান্ ঘ্যান্ ঘ্যান্! যিনি উমেদওয়ারি ছাড়িয়া স্বাধীন হইয়া উকীল হইলেন, তিনি আবার সনদী ঘ্যান্ ঘেনে। সত্যমিথ্যার সাগর-সঙ্গমে প্রাতঃস্নান করিয়া উঠিয়া, যেথানে দেখেন, কাঠগড়ার ভিতর বিড়ে মাথায় সরকারি জুজু বসিয়া আছে—বড় জজ ছোট

জজ, সবজজ, ডেপুটি, মুন্সেফ—সেইখানে গিয়া সেই পেশাদার ঘ্যান্‌ঘেনে, ঘ্যান্‌ ঘ্যানানির ফোয়ারা খুলিয়া দেন। কেহ বা মনে করেন, ঘ্যান্‌ ঘ্যানানির চোটে দেশোদ্ধার করিবেন—সভাতলে ছেলে বুড়া জমা করিয়া ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ করিতে থাকেন। কোন্‌ দেশে বৃষ্টি হয নাই—এসো বাপু, ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ করি; বড় চাকরি পাই না—এসো বাপু, ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ করি—রামকান্তের মা মরিয়াছে—এসো বাপু, স্মরণার্থ ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ করি। কাহারও বা তাতেও মন উঠে না—তাঁরা কাগজ কলম লইয়া, হপ্তায় হপ্তায়, মাসে মাসে, দিন দিন ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ করেন; আর তুমি যে বাপু, আমার ঘ্যান্‌ ঘ্যানানিতে এত রাগ করিতেছ, তুমি ও কি করিতে বসিযাছ? বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের কাছে কিছু আফিঙ্গের যোগাড় করিবে বলিযা ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ করিতে বসিয়াছ। আমার চোঁ বোঁই কি এত কটু?

"তোমায় সত্য বলিতেছি, কমলাকান্ত! তোমাদের জাতির ঘ্যান্‌ ঘ্যানানি আর ভাল লাগে না। দেখ, আমি যে ক্ষুদ্র পতঙ্গ, আমিও শুধু ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ করি না—মধু সংগ্রহ করি আর হুল ফুটাই। তোমরা না জান শুধু মধু সংগ্রহ করিতে, না জান হুল ফুটাইতে—কেবল ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ পার। একটা কাজের সঙ্গে খোঁজ নাই—কেবল কাঁদুনে মেয়ের মত দিবারাত্রি ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌। একটু বকাবকি লেখালেখি কম করিয়া কিছু কাজে মন দাও—তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। মধু করিতে শেখ—হুল ফুটাইতে শেখ। তোমাদের রসনা অপেক্ষা আমাদের হুল শ্রেষ্ঠ—বাক্যবাণে মানুষ মরে না; আমাদের হুলের ভয়ে জীবলোক সদা সশঙ্কিত! স্বর্গে ইন্দ্রের বজ্র, মর্ত্ত্যে ইংরেজের কামান, আকাশমার্গে আমাদের হুল! সে যাক্‌, মধু কর; কাজে মন দাও। নিতান্ত যদি দেখ, রসনাকণ্ডূয়ন রোগ জন্য কাজে মন যায় না—জিবে কাষ্টকি দিযা ঘা কর—অগত্যা কাজে মন যাইতে পারে। আর শুধু ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ ভাল লাগে না।" এই বলিয়া ভ্রমররাজ ভোঁ করিয়া উড়িয়া গেল।

আমি ভাবিলাম যে, এই ভ্রমর অবশ্য বিশেষ বিজ্ঞ পতঙ্গ। শুনা আছে, মনুষ্যের পদবৃদ্ধি হইলেই সে বিজ্ঞ বলিয়া গণ্য হয়। এই জন্য দ্বিপদ মনুষ্য হইতে চতুষ্পদ পশু—পক্ষান্তরে যে সকল মনুষ্যের পদবৃদ্ধি হইয়াছে—তাহারা অধিক বিজ্ঞ বলিয়া গণ্য। এই ষট্‌পদের—একখানি না, দুখানি না—ছয় ছয়খানি পা! অবশ্য এ ব্যক্তি বিশেষ বিজ্ঞ হইবে—ইহার অসামান্য পদবৃদ্ধি দেখা যায়। এই বিজ্ঞ পতঙ্গের পরামর্শ অবহেলন করি কি প্রকারে? অতএব আপাততঃ ঘ্যান্‌ ঘ্যানানি বন্ধ করিলাম—কি মধুসংগ্রহের আশাটা রহিল। বঙ্গদর্শন পুষ্প হইতে অহিফেন মধু সংগ্রহ হইবে, এই ভরসায় প্রাণ ধারণ করে— আপনার আজ্ঞাবহ

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

চতুর্থ সংখ্যা

বুড়ো বয়সের কথা

সম্পাদক মহাশয়! আফিঙ্গ পৌঁছে নাই, বড কষ্ট গিয়াছে। আজ যাহা লিখিলাম, তাহা বিস্ফারিত লোচনে লেখা। নিজ বুদ্ধিতে, অহিফেন প্রাসাদাৎ নহে। একটা মনের দুঃখের কথা লিখিব।

বুড়া বযসের কথা লিখিব। লিখি লিখি মনে করিতেছি, কিন্তু লিখিতে পারিতেছি না। হইতে পারে যে, এই নিদারুণ কথা আমার কাছে বড় প্রিয়,—আপনার মর্ম্মান্তিক দুঃখের পরিচয় আপনার কাছে বড মিষ্ট লাগে, কিন্তু আমি লিখিলে পড়িবে কে? যে যুবা. কেবল সেই পড়ে; বুড়ায় কিছু পড়ে না। বোধ হয, আমার এই বুড়া বযসের কথার পাঠক জুটিবে না।

অতএব আমি ঠিক বুড়া বয়সের কথা লিখিব না। বলিতে পারি না; বৈতরণীর তরঙ্গাভিহত জীবনের সেই শেষ সোপানে আজিও পদার্পণ করি নাই; আজিও আমার পারের কড়ি সংগ্রহ করা হয নাই। আমার মনে মনে বিশ্বাস যে, সে দিন আজিও আসে নাই। তবে যৌবনেও আমার আর দাবি দাওয়া নাই; মিযাদি পাট্টার মিযাদ ফুরাইযাছে। এক দিকে মিযাদ অতীত হইল, কিন্তু বাকি বকেযা আদায উসুল করা হয নাই, তাহার জন্য কিছু পীড়াপীড়ি আছে; যৌবনের আখিরি করিযা ফারখতি লইতে পারি নাই। তাহার উপর মহাজনেরও কিছু ধারি; অনাবৃষ্টির দিনে অনেক ধার করিযা খাইয়াছিলাম, শোধ দিতে পারি এমত সাধ্য নাই। তার উপর পাটনির কড়ি সংগ্রহ করিবার সময আসিল। আমার এমন দুঃখের সময়ের দুটো কথা বলিব, তোমরা যৌবনের সুখ ছাড়িয়া কি এক বার শুনিবে না?

আগে আসল কথাটা মীমাংসা করা যাউক—আমি কি বুড়া? আমি আমার নিজের কথাই বলিতেছি এমত নহে. আমি বুডা, না হয যুবা, দুইয়ের এক স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু যাঁহারই বযসটা একটু দোটানা রকম—যাঁরই ছাযা পূর্ব্বদিকে হেলিয়াছে, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি, মীমাংসা করুন দেখি, আপনি কি বুড়া। আপনার কেশগুলি, হয়ত আজিও অনিন্দ্য ভ্রমরকৃষ্ণ, হয়ত আজিও দন্তসকল অবিচ্ছিন্ন মুক্তামালার লজ্জাস্থল, হয ত আপনার নিদ্রা অদ্যাপি এমন প্রগাঢ় যে, দ্বিতীয় পক্ষের ভার্য্যাও তাহা ভাঙ্গিতে পারে না;—তথাপি, হয় ত আপনি প্রাচীন। নয় ত, আপনার কেশগুলি শাদা কালোয় গঙ্গা যমুনা হইয়া গিয়াছে, দশন মুক্তাপাতি

ছিঁড়িয়া গিয়াছে, দুই একটি মুক্তা হারাইয়া গিয়াছে—নিদ্রা, চক্ষুর প্রতারণামাত্র, তথাপি আপনি যুবা। তুমি বলিবে, ইহার অর্থ, "বয়সেতে বিজ্ঞ নহে, বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে।" তাহা নহে—আমি বিজ্ঞতার কথা বলিতেছি না, প্রাচীনতার কথা বলিতেছি। প্রাচীনতা বয়সেরই ফল, আর কিছুরই নহে। ধাতুবিশেষে কিছু তারতম্য হয়, কেহ চল্লিশে বুড়া, কেহ বিয়াল্লিশে যুবা। কিন্তু তুমি কখন দেখিবে না যে, বয়সের অধিক তারতম্য ঘটে। যে পঁয়তাল্লিশে যুবা বলাইতে চায়, সে হয় যম-ভয়ে নিতান্ত ভীত, নয় তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়াছে; যে পঁয়ত্রিশে বুড়া বলাইতে চায়, সে হয় বড়াই ভালবাসে, নয় পীড়িত, নয় কোন বড় দুঃখে দুঃখী।

কিন্তু এই অর্দ্ধেক পথ অতিবাহিত করিয়া, প্রথম চস্‌মাখানি হাতে করিয়া রুমাল দিয়া মুছিতে মুছিতে ঠিক বলা দায় যে, আমি বুড়া হইয়াছি কি না। বুঝি বা হইয়াছি। বুঝি হই নাই। মনে মনে ভরসা আছে, একটু চক্ষুর দোষ হউক, দুই এক গাছা চুল পাকুক, আজিও প্রাচীন হই নাই। কই, কিছু ত প্রাচীন হয় নাই? এই চিরপ্রাচীন ভুবনমণ্ডল ত আজিও নবীন; আমার প্রিয় কোকিলের স্বর প্রাচীন হয় নাই; আমার সৌন্দর্য্য মাখা হীরা বসান, গঙ্গার ক্ষুদ্র তরঙ্গভঙ্গ ত প্রাচীন হয় নাই; প্রভাতের বায়ু, বকুল কামিনীর গন্ধ, বৃক্ষের শ্যামলতা, এবং নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা, কেহ ত প্রাচীন হয় নাই—তেমনই সুন্দর আছে। আমি কেবল প্রাচীন হইলাম? আমি এ কথায় বিশ্বাস করিব না। পৃথিবীতে উচ্চ হাসি ত আজিও আছে, কেবল আমার হাসির দিন গেল? পৃথিবীতে উৎসাহ, ক্রীড়া, রঙ্গ আজিও তেমনি অপর্য্যাপ্ত, কেবল আমারই পক্ষে নাই? জগৎ আলোকময়, কেবল আমারই রাত্রি আসিতেছে? সলমন কোম্পানির দোকানে বজ্রাঘাত হউক, আমি এ চস্‌মা ভাঙ্গিয়া ফেলিব, আমি বুড়া বয়স স্বীকার করিব না।

তবু আসে—ছাড়ান যায় না। ধীরে ধীরে দিনে দিনে পলে পলে বয়শ্চোর আসিয়া, এ দেহপুর প্রবেশ করিতেছি—আমি যাহা মনে ভাবি না কেন, আমি বুড়া, প্রতি নিঃশ্বাসে তাহা জানিতে পারিতেছে। অন্যে হাসে, আমি কেবল ঠোঁট হেলাইয়া তাহাদিগের মন রাখি। অন্যে কাঁদে, আমি কেবল লোকলজ্জায় মুখ ভার করিয়া থাকি—ভাবি, ইহারা এ বৃথা কালহরণ করিতেছে কেন? উৎসাহ আমার কাছে পণ্ডশ্রম—আশা আমার কাছে আত্ম-প্রতারণা। কই, আমার ত আশা ভরসা কিছু নাই? কই—দূর হউক, যাহা নাই, তাহা আর খুঁজিয়া কাজ নাই।

খুঁজিয়া দেখিব কি? যে কুসুমদাম এ জীবনকানন আলো করিত, পথিপার্শ্বে

একে একে তাহা খসিয়া পড়িয়াছে। যে মুখমণ্ডলসকল ভালবাসিতাম, একে একে অদৃশ্য হইয়াছে, না হয় রৌদ্রবিশুষ্ক বৈকালের ফুলের মত শুকাইয়া উঠিয়াছে। কই আর এ ভগ্নমন্দিরে, এ পরিত্যক্ত নাট্যশালায়, এ ভাঙ্গা মজলিসে সে উজ্জ্বল দীপাবলী কই? একে একে নিবিয়া যাইতেছে। কেবল মুখ নহে—হৃদয়। সে সরল, সে ভালবাসাপরিপূর্ণ, সে বিশ্বাসে দৃঢ়, সৌহার্দ্দ্যে স্থির, অপরাধেও প্রসন্ন, সে বন্ধুহৃদয় কই? নাই। কার দোষে নাই? আমার দোষে নহে। বন্ধুরও দোষে নহে। বয়সের দোষে অথবা যমের দোষে।

তাতে ক্ষতি কি? একা আসিয়াছি, একা যাইব—তাহার ভাবনা কি? এ লোকালয়ের সঙ্গে আমার বনিয়া উঠিল না—আচ্ছা—রোখশোধ। পৃথিবী! তুমি তোমার নিয়মিত পথে আবর্ত্তন করিতে থাক, আমি আমার অভীষ্ট স্থানে গমন করি—তোমায় আমায় সম্বন্ধ রহিত হইল—তাহাতে, হে মৃন্ময়ি জড়পিণ্ডগৌরব-পীড়িতে বসুন্ধরে! তোমারই বা ক্ষতি কি, আমারই বা ক্ষতি কি? তুমি অনন্ত কাল, শূন্যপথে ঘুরিবে, আমি আর অল্প দিন ঘুরিব মাত্র। তার পরে তোমার কপালে ছাইগুলি দিয়া, যাঁর কাছে সকল জ্বালা জুড়ায় তাঁর কাছে গিয়া সকল জ্বালা জুড়াইব!

তবে স্থির হইল এক প্রকার যে, বুড়া বয়সে পড়িয়াছি! এখন কর্ত্তব্য কি? "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ?" এ কোন গণ্ডমূর্খের কথা। আবার বন কোথা? এ বয়সে, অট্টালিকাময়ী লোকপূর্ণা আপনিসমাকুলা নগরীই বন। কেন না, হে বর্ষীয়ান্ পাঠক! তোমার আমার সঙ্গে আর ইহার মধ্যে কাহারও সহৃদয়তা নাই। বিপদ্‌কালে কেহ কেহ আসিয়া বলিতে পারে যে, "বুড়া! তুমি অনেক দেখিয়াছ, এ বিপদে কি করিব বলিয়া দাও,—" কিন্তু, সম্পদ্‌কালে কেহই বলিবে না, "বুড়া! আজি আমার আনন্দের দিন, তুমি আসিয়া আমাদিগের উৎসব বৃদ্ধি কর!" বরং আমোদ আহ্লাদ কালে বলিবে, "দেখ ভাই, যেন বুড়া বেটা জানিতে না পারে।" তবে আর অরণ্যের বাকি কি?

যেখানে আগে ভালবাসার প্রত্যাশা করিতে, এখন সেখানে তুমি কেবল ভয় বা ভক্তির পাত্র। যে পুত্র তোমার যৌবনকালে, তাহার শৈশবকালে, তোমার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়াও, অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থাতেই, ক্ষুদ্র হস্ত প্রসারণ করিয়া, তোমার অনুসন্ধান করিত, সে এখন লোকমুখে সম্বাদ লয়, পিতা কেমন আছেন। পরের ছেলে, সুন্দর দেখিয়া যাহাকে কোলে তুলিয়া, তুমি আদর করিয়াছিলে, সে এখন কালক্রমে বয়ঃক্রম বয়ঃপ্রাপ্ত, কর্কশকান্তি, হয় ত মহাপাপিষ্ঠ, পৃথিবীর পাপস্রোত বাড়াইতেছে, হয় ত, তোমারই দ্বেষক—তুমি কেবল কাঁদিয়া বলিতে পার, "ইহাকে

আমি কোলে পিঠে করিয়াছি।" তুমি যাহাকে কোলে বসাইয়া, ক, খ শিখাইয়াছিলে, সে হয় ত এখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত, তোমার মূর্খতা দেখিয়া মনে মনে উপহাস করে। যাহারই স্কুলের বেতন দিয়া তুমি মানুষ করিয়াছিলে, সে হয় ত এখন তোমাকে টাকা ধার দিয়া, তোমারই কাছে সুদ খায়। তুমি যাহাকে শিখাইতে, হয় ত সে তোমায় শিখাইতেছে। যে তোমার অগ্রাহ্য ছিল, তুমি আজি তার অগ্রাহ্য। আর অরণ্যের বাকি কি?

অন্তর্জগৎ ছাড়িয়া বহির্জগতেও এইরূপ দেখিবে। যেখানে তুমি স্বহস্তে পুষ্পোদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছিলে,—বাছিয়া বাছিযা, গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, বিগ্নোনিয়া, সাইপ্রেস, অরকেরিযা আনিয়া পুঁতিয়াছিলে, পাত্রহস্তে স্বয়ং জলসিঞ্চন করিয়াছিলে, সেখানে দেখিবে, ছোলা মটরের চাষ,—হারাধন পোদ গামছা কাঁধে, মোটা মোটা বলদ লইযা নির্ব্বিঘ্নে লাঙ্গল দিতেছে—সে লাঙ্গলের ফাল তোমার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। যে অট্টালিকা তুমি যৌবনে, অনেক সাধ মনে মনে রাখিয়া, অনেক সাধ পুরাইযা, যত্নে নির্ম্মাণ করিয়াছিলে, যাহাতে পালঙ্ক পাড়িয়া নয়নে নয়নে অধরে অধরে মিলাইয়া ইহ-জীবনের অনশ্বর প্রণয়ের প্রথম পবিত্র সম্ভাষণ করিয়াছিলে, হয ত দেখিবে, সে গৃহের ইষ্টক সকল দামু ঘোষের আস্তাবলের সুরকির জন্য চূর্ণ হইতেছে; সে পালঙ্কের ভগ্নাংশ লইয়া কৈলাসীর মা পাচিকা ভাতের হাঁড়িতে জ্বাল দিতেছে—আর অরণ্যের বাকি কি? সকল জ্বালার উপর জ্বালা, আমি সেই যৌবনে যাহাকে সুন্দর দেখিয়াছিলাম—এখন সে কুৎসিত। আমার প্রিয বন্ধু দাসু মিত্র, যৌবনের রূপে স্ফীতকণ্ঠ কপোতের ন্যায় সগর্ব্বে বেড়াইত—কত মাগী গঙ্গার ঘাটে, স্নানকালে তাহাকে দেখিয়া নমঃ শিবায় নমঃ বলিয়া ফুল দিতে, "দাসু মিত্রায় নমঃ" বলিয়া ফুল দিয়াছে। এখন সেই দাসু মিত্র শুষ্ককণ্ঠ, পলিতকেশ, দন্তহীন, লোলচর্ম্ম, শীর্ণকায়। দাসুর একটা ব্রাণ্ডি আর তিনটা মুরগী জলপানের মধ্যে ছিল,—এখন দাসু নামাবলীর ভরে কাতর, পাতে মাছের ঝোল দিলে, পাত মুছিয়া ফেলে। আর অরণ্যের বাকি কি?

গদার মাকে দেখ। যখন আমার সেই পুষ্পোদ্যানে, তরঙ্গিণী নামে যুবতী ফুল চুরি করিতে যাইত, মনে হইত, নন্দনকানন হইতে সচল সপুষ্প পারিজাত বৃক্ষ আনিয়া কে ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহার অলকদাম লইয়া উদ্যান-বায়ু ক্রীড়া করিত, তাহার অঞ্চলে কাঁটা বিঁধিয়া দিয়া, গোলাপ গাছ রসকেলি করিত। আর আজি গদার মাকে দেখ। বকাবকি করিতে করিতে চাল ঝাঁড়িতেছে—মলিনবসনা, বিকট-

দর্শনা, তীব্ররসনা—দীর্ঘাঙ্গী, কৃষ্ণাঙ্গী, কৃশাঙ্গী, লোলচর্ম্ম, পলিতকেশ, শুষ্ক-বাহু, কর্কশকণ্ঠ। এই সেই তরঙ্গিণী—আর অরণ্যের বাকি কি?

তবে স্থির, বনে যাওযা হবে না। তবে কি করিব? হিন্দুশাস্ত্রের বশবর্ত্তী হইযা কালিদাসও সর্ব্বগুণবান্ রঘুগণের বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমি নিশ্চিত বলিতে পাবি—কালিদাস চল্লিশ পার হইযা রঘুবংশ লিখেন নাই। তিনি যে রঘুবংশ যৌবনে লিখিযাছিলেন, এবং কুমারসম্ভব চল্লিশ পার করিয়া লিখিযাছিলেন, তাহা আমি দুইটি কবিতা উদ্ধার করিযা দেখাইতেছি—

প্রথম অজবিলাপে,

"ইদমুচ্ছ্বসিতালকং মুখং
তব বিশ্রান্তকথং দুনোতি মাম্।
নিশি সুপ্তমিবৈকপঙ্কজং
বিরতাভ্যন্তরষট্পদস্বনম্॥"*

এটি যৌবনেব কান্না।

তার পর রতিবিলাপে,

"গত এব ন তে নিবর্ত্ততে স সখা দীপ ইবানিলাহতঃ।
অহমস্য দশেব পশ্য মামবিসহ্যব্যসনেন ধূমিতাম্॥"+

এটা বুড়া বযসের কান্না।—

তা যাই হউক, কালিদাস বুড়া বযসের গৌরব বুঝিলেও কখনও বৃদ্ধের কপালে মুনিবৃত্তি লিখিতেন না। বিস্মার্ক, মোল্ট্‌কে ও ফ্রেডারিক বুডা; তাঁহারা মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে—জর্ম্মান ঐকজাত্য কোথা থাকিত? টিযর প্রাচীন—টিযর মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে ফ্রান্সের স্বাধীনতা এবং সাধারণতন্ত্রাবলম্বন কোথা থাকিত? গ্লাডষ্টোন এবং ডিস্রেলি—বুড়া—তাঁহারা মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে পার্লিমেণ্টের রিফর্ম্ম এবং আযরিশ্ চর্চ্চের ডিসেষ্টাব্লিষমেণ্ট কোথা থাকিত?

প্রাচীন বযসই বিষযৈষার সময়। আমি অস্ত্র-দন্তহীন ত্রিকালের বুড়ার কথা বলিতেছি না।—তাঁহারা দ্বিতীয় শৈশবে উপস্থিত। যাঁহারা আর যুবা নই বলিয়াই বুড়া, আমি তাহাদিগের কথা বলিতেছি। যৌবন কর্ম্মের সময় বটে, কিন্তু তখন কাজ

* বাযুবশে অলকাগুলিন চালিত হইতেছে—অথচ বাক্যহীন তোমার এই মুখ রাত্রিকালে প্রমুদিত, সুতরাং অভ্যন্তরে ভ্রমর-গুঞ্জন-বর্জ্জিত একটি পদ্মের ন্যায় আমাকে ব্যথিত করিতেছে।

\+ তোমার সেই সখা বায়ুতাড়িত দীপের ন্যায় পরলোকে গমন করিয়াছেন, আর ফিরিবেন না। আমি নির্ব্বাপিত দীপের দশাবৎ অসহ্য দুঃখে ধূমিত হইতেছি দেখ।

ভাল হয না। একে বুদ্ধি অপরিপক্ক, তাহাতে আবার রাগ দ্বেষ ভোগাসক্তি, এবং স্ত্রীগণের অনুসন্ধানে তাহা সতত হীনপ্রভ ; এজন্য মনুষ্য যৌবনে সচরাচর কার্য্যক্ষম হয না। যৌবন অতীতে মনুষ্য বহুদর্শী, স্থিরবুদ্ধি, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, এবং ভোগাসক্তির অনধীন, এজন্য সেই কার্য্যকারিতার সময। সেইজন্য, আমার পরামর্শ যে, বুড়া হইযাছি বলিয়া, কেহ স্বকার্য্য পরিত্যাগ করিযা মুনিবৃত্তির ভান করিবে না। বার্দ্ধক্যেও বিষয চিন্তা করিবে।

তোমরা বলিবে, একথা বলিতে হইবে না ; কেহই জীবন থাকিতে ও শক্তি থাকিতে বিষযচেষ্টা পরিত্যাগ করে না। মাতৃস্তনপান অবধি উইল করা পর্য্যন্ত আবালবৃদ্ধ কেবল বিষযান্বেষণে বিব্রত। সত্য, কিন্তু আমি সেরূপ বিষযানুসন্ধানে বৃদ্ধকে নিযুক্ত করিতে চাহিতেছি না। যৌবনে যে কাজ করিযাছ, সে আপনার জন্য ; তাবপর যৌবন গেলে যত কাজ করিবে, পরের জন্য। ইহাই আমার পরামর্শ। ভাবিও না যে, আজিও আপনার কাজ করিয়া উঠিতে পারিলাম না—পরের কাজ করিব কি ? আপনার কাজ ফুরায না—যদি মনুষ্যজীবন লক্ষ বর্ষ পরিমিত হইত, তবু আপনার কাজ ফুরাইত না—মনুষ্যের স্বার্থপরতার সীমা নাই—অন্ত নাই। তাই বলি, বার্দ্ধক্যে আপনার কাজ ফুরাইযাছে, বিবেচনা করিযা পরহিতে রত হও। এই মুনিবৃত্তি যথার্থ মুনিবৃত্তি। এই মুনিবৃত্তি অবলম্বন কর।

যদি বল, বার্দ্ধক্যেও যদি আপনার জন্য হউক, পরের জন্য হউক, বিষয়-কার্য্যে নিরত থাকিব, তবে ঈশ্বরচিন্তা করিব কবে ?—পরকালের কাজ করিব কবে ? আমি বলি, আশৈশব পরকালের কাজ করিবে, শৈশব হইতে জগদীশ্বরকে হৃদযে প্রধান স্থান দিবে। যে কাজ সকল কাজের উপর কাজ, তাহা প্রাচীন কালের জন্য তুলিযা রাখিবে কেন ? শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে, সকল সমযেই ঈশ্বরকে ডাকিবে। ইহার জন্য বিশেষ অবসরের প্রযোজন নাই—ইহার জন্য অন্য কোন কার্য্যের ক্ষতি নাই। বরং দেখিবে, ঈশ্বরভক্তির সঙ্গে মিলিত হইলে সকল কার্য্যই মঙ্গলপ্রদ, যশস্কর এবং পরিশুদ্ধ হয়।

আমি বুঝিতে পারিতেছি, অনেকের এ সকল কথা ভালো লাগিতেছে না। তাঁহারা এতক্ষণ বলিতেছেন, তরঙ্গিণী যুবতীর কথা হইতেছিল—হইতে হইতে আবার ঈশ্বরের নাম কেন ? এই মাত্র বুড়া বয়সের ঢেঁকি পাতিযা, বঙ্গদর্শনের জন্য ধান ভানিতেছিলে—আবার এ শিবের গীত কেন ? দোষ হইয়াছে স্বীকার করি, কিন্তু মনে মনে বোধ হয় যে, সকল কাজেই একটু একটু শিবের গীত ভাল।

ভাল হউক বা না হউক, প্রাচীনের অন্য উপায় নাই। তোমার তরঙ্গিণী হেমাঙ্গিণী

সুরঙ্গিণী কুরঙ্গিণীর দল, আর আমার দিকে ঘেঁষিবে না। তোমার মিল, কোমত, স্পেন্সর, ফুয়রবাক মনোরঞ্জন করিতে পারে না। তোমার দর্শন, বিজ্ঞান, সকলই অসার—সকলই অন্ধের মৃগয়া। আজিকার বর্ষার দুর্দ্দিনে—আজি এ কালরাত্রির শেষ কুলগ্নে,—এ নক্ষত্রহীন অমাবস্যার নিশির মেঘাগমে,—আমায় আর কে রাখিবে? এ ভবনদীর তপ্ত সৈকতে, প্রখরবাহিনী বৈতরণীর আবর্ত্তভীষণ উপকূলে—এ দুস্তর পাবাবারের প্রথম তরঙ্গমালার প্রঘাতে, আর আমায় কে রক্ষা করিবে? অতি বেগে প্রবল বাতাস বহিতেছে—অন্ধকার, প্রভো! চারি দিকেই অন্ধকার! আমার এ ক্ষুদ্র ভেলা দুষ্কৃতের ভরে বড ভারি হইযাছে। আমায় কে রক্ষা করিবে?

পঞ্চম সংখ্যা

কমলাকান্তের বিদায়

সম্পাদক মহাশয়!

বিদায় হইলাম, আর লিখিব না। বনিল না। আপনার সঙ্গে বনিল না, পাঠকের সঙ্গে বনিল না, এ সংসারের সঙ্গে আমার বনিল না। আমার আপনার সঙ্গে আর আমার বনিল না। আর কি লেখা হয? বেসুরে কি এ বাঁশী বাজে? বাঁশী বাজি বাজি করে, তবু বাজে না—বাঁশী ফাটিযাছে। আবার বাজ দেখি, হৃদযের বংশী! হায়! তুই কি আর তেমনি করিয়া বাজিতে জানিস? আর কি সে তান মনে আছে? না, তুই সেই আছিস—না আমি সেই আমি আছি। তুই ঘুণে ধরা বাঁশী—আমি ঘুণে ধরা—আমি ঘুণে ধরা কি কি ছাই তা আমি জানি না। আমার সে স্বর নাই—আর বাজাইব কি? আর সে রস নাই, শুনিবে কে? একবার বাজ দেখি, হৃদয়! এই জগৎ সংসারে—বধির, অর্থচিন্তায বিব্রত, মূঢ জগৎ সংসারে, সেইরূপ আবার মনের লুকান কথাগুলি তেমনি করিয়া বল্ দেখি? বলিলে কেহ শুনিবে কি? তখন বয়স ছিল—কত কাল হইল সে দপ্তর লিখিয়াছিলাম—এখন সে বয়স, সে রস নাই—এখন সে রস ছাড়া কথা কেহ শুনিবে কি? আর সে বসন্ত নাই—এখন গলা-ভাঙ্গা কোকিলের কুহুরব কেহ শুনিবে কি?

ভাই, আর কথায় কাজ নাই—আর বাজিযা কাজ নাই—ভাঙ্গা বাঁশে মোটা আওয়াজে আর কুক্কুর-রাগিণী ভাঁজিয়া কাজ নাই। এখন হাসিলে কেহ হাসিবে না—কাঁদিলে বরং লোকে হাসিবে। প্রথম বয়সের হাসিকান্নায় সুখ আছে—লোকে সঙ্গে সঙ্গে হাসে কাঁদে;—এখন হাসিকান্না। ছি!—কেবল লোক হাসান!

হে সম্পাদককুলশ্রেষ্ঠ! আপনাকে স্বরূপ বলিতেছি—কমলাকান্তের আর সে রস নাই। আমার সে নসীবাবু নাই—অহিফেনের অনটন—সে প্রসন্ন কোথায় জানি না—তাহার সে মঙ্গলা গাভী কোথায় জানি না। সত্য বটে, আমি তখনও একা—এখনও একা—কিন্তু তখন আমি একায় এক সহস্র—এখন আমি একায় আধখানা। কিন্তু একার এত বন্ধন কেন? যে পাখীটি পুষিয়াছিলাম—কবে মরিয়া গিয়াছে—তাহার জন্য আজিও কাঁদি; যে ফুলটি ফুটাইয়াছিলাম—কবে শুকাইয়াছে, তাহার জন্য আজিও কাঁদি; যে জলবিম্ব, একবার জলস্রোতে সূর্য্যরশ্মি সম্প্রভাত দেখিয়াছিলাম—তাহার জন্য আজিও কাঁদি। কমলাকান্ত অন্তরের অন্তরে সন্ন্যাসী—তাহার এত বন্ধন কেন? এ দেহ পচিযা উঠিল—ছাই-ভস্ম মনের বাঁধনগুলা পচে না কেন? ঘর পুড়িয়া গেল—আগুন নিবে না কেন? পুকুর শুকাইয়া আসিল—এ পঙ্কে পঙ্কজ ফুটে কেন? ঝড় থামিয়াছে—দরিয়ায় তুফান কেন? ফুল শুকাইয়াছে—এখনও গন্ধ কেন? সুখ গিয়াছে—আশা কেন? স্মৃতি কেন? জীবন কেন? ভালবাসা গিয়াছে—যত্ন কেন? প্রাণ গিয়াছে—পিণ্ডদান কেন? কমলাকান্ত গিয়াছে—যে কমলাকান্ত চাঁদ বিবাহ করিত, কোকিলের সঙ্গে গায়িত, ফুলের বিবাহ দিত, এখন আবার তার আফিঙ্গের বরাদ্দ কেন? বাঁশী ফাটিয়াছে—আবার সা, ঋ, গ, ম কেন? প্রাণ গিয়াছে ভাই, আর নিশ্বাস কেন? সুখ গিয়াছে, ভাই, আর কান্না কেন?

তবু কাঁদি। জন্মিবামাত্র কাঁদিয়াছিলাম, কাঁদিয়া মরিব। এখন কাঁদিব, লিখিব না।

অনুগত, স্বগত এবং বিগত
শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

কমলাকান্তের জোবানবন্দী

খোশনবীস জুনিয়র প্রণীত

সেই আফিঙ্গখোর কমলাকান্তের অনেকদিন কোন সম্বাদ পাই নাই। অনেক সন্ধান করিয়াছিলাম, অকস্মাৎ সম্প্রতি একদিন তাহাকে ফৌজদারী আদালতে দেখিলাম। দেখি যে, ব্রাহ্মণ এক গাছতলায় বসিয়া, গাছের গুঁড়ি ঠেসান দিয়া, চক্ষু বুজিয়া ডাবায় তামাকু টানিতেছে। মনে করিলাম, আর কিছু, না ব্রাহ্মণ লোভে

পড়িয়া কাহার ডিবিয়া হইতে আফিঙ্গ চুরি করিয়াছে—অন্য সামগ্রী কমলাকান্ত চুরি করিবে না—ইহা নিশ্চিত জানি। নিকটে একজন কালোকোর্ত্তা কনেষ্টবলও দেখিলাম। আমি বড় দাঁড়াইলাম না—কি জানি যদি কমলাকান্ত জামিন হইতে বলে। তফাতে থাকিয়া দেখিতে লাগিলাম যে, কাণ্ডটা কি হয়।

কিছুকাল পরে কমলাকান্তের ডাক হইল। তখন একজন কনেষ্টবল রুল ঘুরাইযা তাহাকে সঙ্গে করিয়া এজ্‌লাসে লইয়া গেল। আমি পিছু পিছু গেলাম। দাঁড়াইয়া, দুই একটি কথা শুনিয়া, ব্যাপারখানা বুঝিতে পারিলাম।

এজ্‌লাসে, প্রথামত মাচানের উপর হাকিম বিরাজ করিতেছেন। হাকিমটি একজন দেশী ধর্ম্মাবতার—পদে ও গৌরবে ডিপুটি। কমলাকান্ত আসামী নহে—সাক্ষী। মোকদ্দমা গরুচুরি। ফরিয়াদী সেই প্রসন্ন গোয়ালিনী।

কমলাকান্তকে সাক্ষীর কাটারায় পুরিয়া দিল। তখন কমলাকান্ত মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। চাপরাশী ধমকাইলেন—"হাস কেন?"

কমলাকান্ত যোড়হাত করিয়া বলিল, "বাবা, কার ক্ষেতে ধান খেয়েছি—যে, আমাকে এর ভিতর পুরিলে?"

চাপরাশী মহাশয় কথাটা বুঝিলেন না। দাড়ি ঘুরাইয়া বলিলেন, "তামাসার জায়গা এ নয়—হলফ পড়।"

কমলাকান্ত বলিল, "পড়াও না বাপ্।"

একজন মুহুরী তখন হলফ পড়াইতে আরম্ভ করিল। বলিল, "বল, আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া…"

কমলাকান্ত। (সবিস্ময়ে) কি বলিব?

মুহুরী। শুন্‌তে পাওনা—"পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে—"

কমলা। পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে! কি সর্ব্বনাশ।

হাকিম দেখিলেন, সাক্ষীটা কি একটা গণ্ডগোল বাধাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "সর্ব্বনাশ কি?"

কমলা। পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনেছি—এ কথাটা বল্‌তে হবে?

হাকিম। ক্ষতি কি? হলফের ফারমই এই।

কমলা। হুজুর সুবিচারক বটে। কিন্তু একটা কথা বলি কি, সাক্ষ্য দিতে দিতে দুই একটা ছোট রকম মিথ্যা বলি, না হয় বলিলাম—কিন্তু গোড়াতেই একটা বড় মিথ্যা বলিয়া আরম্ভ করিব, সেটা কি ভাল?

হাকিম। এর আর মিথ্যা কথা কি?

কমলাকান্ত মনে মনে বলিল, "তত বুদ্ধি থাকিলে তোমার কি এ পদবৃদ্ধি হইত ?" প্রকাশ্যে বলিল, "ধর্ম্মাবতার, আমার একটু একটু বোধ হইতেছে কি যে, পরমেশ্বর ঠিক প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। আমার চোখের দোষই হউক আর যাই হউক, কখনও ত এ পর্য্যন্ত পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম না। আপনারা বোধ হয় আইনের চসমা নাকে দিযা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পারেন—কিন্তু আমি যখন তাঁহাকে এ ঘরের ভিতর প্রত্যক্ষ পাইতেছি না—তখন কেমন করিযা বলি—আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে—"

ফরিযাদীর উকিল চটিলেন—তাঁহার মূল্যবান্ সময, যাহা মিনিটে মিনিটে টাকা প্রসব করে, তাহা এই দরিদ্র সাক্ষী নষ্ট করিতেছে। উকিল তখন গরম হইযা বলিলেন, "সাক্ষী মহাশয! Theological Lectureটা ব্রাহ্মসমাজের জন্য রাখিলে ভাল হয না? এখানে আইনের মতে চলিতে মন স্থির করুন।"

কমলাকান্ত তাঁহার দিকে ফিরিল। মৃদু হাসিযা বলিল, "আপনি বোধ হইতেছে উকীল।"

উকীল। (হাসিযা) কিসে চিনিলে ?

কমলা। বড সহজে। মোটা চেন আর ময়লা শামলা দেখিযা। তা, মহাশয়! আপনাদের জন্য এ Theological Lecture নয। আপনারা পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখেন স্বীকার করি—যখন মোয়াক্কেল আসে।

উকীল সরোষে উঠিযা হাকিমকে বলিলেন, "I ask the protection of the Court against the insults of this witness."

কোর্ট বলিলেন, "Oh Baboo! the witness is your own witness, and you are at liberty to send him away if you like."

এখন কমলাকান্তকে বিদায দিলে উকীলবাবুর মোকদ্দমা প্রমাণ হয না—সুতরাং উকীলবাবু চুপ করিয়া বসিযা পড়িলেন। কমলাকান্ত ভাবিলেন, এ হাকিমটি জাতিভ্রষ্ট—পালের মত নয়।

হাকিম গতিক দেখিয়া, মুহুরিকে আদেশ করিলেন যে, "ওথের প্রতি সাক্ষীর objection আছে—উহাকে simple affirmation দাও।" তখন মুহুরি কমলাকান্তকে বলিল, "আচ্ছা, ও ছেড়ে দাও—বল, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি—বল।"

কমলা। কি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সেটা জানিয়া প্রতিজ্ঞাটা করিলে ভাল হয না?

মুহুরি হাকিমের দিকে চাহিযা বলিল, "ধর্ম্মাবতার! সাক্ষী বড় সেরকশ।"

উকিলবাবু হাঁকিলেন, "Very Obstructive."

কমলাকান্ত। (উকীলের প্রতি) শাদা কাগজে দস্তখত করিয়া লওয়ার প্রথাটা আদালতের বাহিরে চলে জানি—ভিতরেও চলিবে কি?

উকীল। শাদা কাগজে কে তোমার দস্তখত লইতেছে?

কমলা। কি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, তাহা না জানিয়া, প্রতিজ্ঞা করা, আর কাগজে কি লেখা হয়, তাহা না দেখিয়া দস্তখত করা, একই কথা।

হাকিম তখন মুহুরিকে আদেশ করিলেন যে, "প্রতিজ্ঞা আগে ইহাকে শুনাইয়া দাও—গোলমালে কাজ নাই।" মুহুরি তখন বলিলেন, "শোন, তোমাকে বলিতে হইবে যে, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি যে সাক্ষ্য দিব, তাহা সত্য হইবে, আমি কোন কথা গোপন করিব না—সত্য ভিন্ন আর কিছু হইবে না।"

কমলা। ওঁ মধু মধু মধু।

মুহুরি। সে আবার কি?

কমলা। পড়ান, আমি পড়িতেছি।

কমলাকান্ত তখন আর গোলযোগ না করিযা প্রতিজ্ঞা পাঠ করিল। তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার জন্য উকীলবাবু গাত্রোত্থান করিলেন, কমলাকান্তকে চোখ রাঙ্গাইয়া বলিলেন, "এখন আর বদ্‌মায়েশি করিও না—আমি যা জিজ্ঞাসা করি, তার যথার্থ উত্তর দাও। বাজে কথা ছাড়িয়া দাও।"

কমলা। আপনি যা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাই আমাকে বলিতে হইবে? আর কিছু বলিতে পাইব না?

উকীল। না।

কমলাকান্ত তখন হাকিমের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "অথচ আমাকে প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে, 'কোন কথা গোপন করিব না।' ধর্ম্মাবতার, বে-আদবি মাফ হয়। পাড়ায় আজ একটা যাত্রা হইবে, শুনিতে যাইব ইচ্ছা ছিল; সে সাধ এইখানেই মিটিল। উকীলবাবু অধিকারী—আমি যাত্রার ছেলে, যা বলাইবেন, কেবল তাই বলিব; যা না বলাইবেন, তা বলিব না। যা না বলাইবেন, তা কাজেই গোপন থাকিবে। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের অপরাধ লইবেন না।"

হাকিম। যাহা আবশ্যক বিবেচনা করিবে, তাহা না জিজ্ঞাসা হইলেও বলিতে পার।

কমলাকান্ত তখন সেলাম করিয়া বলিল, "বহুৎ খুব।" উকীল তখন জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন, "তোমার নাম কি?"

কমলা। শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

উকীল। তোমার বাপের নাম কি ?

কমলা। জোবানবন্দীর আভ্যুদয়িক আছে না কি ?

উকীল গরম হইলেন, বলিলেন, "হুজুর! এসব Contempt of Court," হুজুর, উকীলের দুর্দশা দেখিয়া নিতান্ত অসন্তুষ্ট নন—বলিলেন, "আপনারই সাক্ষী।" সুতরাং উকীল আবার কমলাকান্তের দিকে ফিরিলেন, বলিলেন, "বল। বলিতে হইবে।"

কমলাকান্ত পিতার নাম বলিল। উকীল তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি জাতি।"

কমলা। আমি কি একটা জাতি ?

উকীল। তুমি কোন্ জাতীয় ?

কমলা। হিন্দু জাতীয়।

উকীল। আঃ! কোন্ বর্ণ ?

কমলা। ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ।

উকীল। দূর হোক ছাই। এমন সাক্ষীও আনে! বলি তোমার জাত আছে ?

কমলা। মারে কে ?

হাকিম দেখিলেন, উকীলের কথায় হইবে না। বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কৈবর্ত্ত, হিন্দুর নানা প্রকার জাতি আছে জান ত—তুমি তার কোন্ জাতির ভিতর ?"

কমলা। ধর্ম্মাবতার! এই উকীলেরই ধৃষ্টতা! দেখিতেছেন আমার গলায় যজ্ঞোপবীত, নাম বলিয়াছি চক্রবর্ত্তী—ইহাতেও যে উকীল বুঝেন নাই যে, আমি ব্রাহ্মণ, ইহা আমি কি প্রকারে জানিব ?

হাকিম লিখিলেন, "জাতি ব্রাহ্মণ।" তখন উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বয়স কত ?"

এজলাসে একটা ক্লক ছিল—তাহার পানে চাহিয়া হিসাব করিয়া কমলাকান্ত বলিল, "আমার বয়স ৫১ বৎসর, দুই মাস, তের দিন, চারি ঘণ্টা, পাঁচ মিনিট—"

উকীল। কি জ্বালা! তোমার ঘণ্টা মিনিট কে চায় ?

কমলা। কেন, এই মাত্র প্রতিজ্ঞা করাইয়াছেন যে, কোন কথা গোপন করিব না।

উকীল। তোমার যা ইচ্ছা কর! আমি তোমায় পারি না। তোমার নিবাস কোথা ?

কমলা। আমার নিবাস নাই।

উকীল। বলি, বাড়ী কোথা ?

কমলা। বাড়ী দূরে থাক্, আমার একটা কুঠারীও নাই।

উকীল। তবে থাক কোথা ?

কমলা। যেখানে সেখানে।

উকীল। একটা আড্ডা ত আছে ?

কমলা। ছিল যখন নসীবাবু ছিলেন। এখন আর নাই।

উকীল। এখন আছ কোথা ?

কমলা। কেন, এই আদালতে ?

উকীল। কাল ছিলে কোথা ?

কমলা। একখানা দোকানে।

হাকিম বলিলেন, "আর বকাবকিতে কাজ নাই—আমি লিখিয়া লইতেছি, নিবাস নাই। তার পর ?"

উকীল। তোমার পেশা কি ?

কমলা। আমার আবার পেশা কি ? আমি কি উকীল না বেশ্যা যে, আমার পেশা আছে ?

উকীল। বলি খাও কি করিয়া ?

কমলা। ভাতের সঙ্গে ডাল মাখিয়া, দক্ষিণ হস্তে গ্রাস তুলিয়া, মুখে পুরিয়া গলাধঃকরণ করি।

উকীল। সে ডাল ভাত জোটে কোথা থেকে ?

কমলা। ভগবান্ জোটালেই জোটে নইলে জোটে না।

উকীল। কিছু উপার্জ্জন কর ?

কমলা। এক পয়সাও না।

উকীল। তবে কি চুরি কর ?

কমলা। তাহা হইলে ইতিপূর্ব্বেই আপনার শরণাগত হইতে হইত। আপনি কিছু ভাগও পাইতেন।

উকীল তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া, আদালতকে বলিলেন, "আমি এ সাক্ষী চাহি না। আমি ইহার কোন জোবানবন্দী করাইতে পারিব না।"

প্রসন্ন বাদিনী, উকিলের কোমর ধরিল ; বলিল, "এ সাক্ষী ছাড়া হইবে না। এ বামন সত্য কথা বলিবে, তাহা আমি জানি—কখনও মিছা বলে না। উহাকে তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে জান না— তাই ও অমন করিতেছে। ও বামনের আবার পেশা কি ? ও এর বাড়ী ওর বাড়ী খেযে বেড়ায়, ওকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, উপার্জ্জন কর। ও কি বল্‌বে ?"

উকীল তখন হাকিমকে বলিল, "লিখুন, পেশা ভিক্ষা।"

এবার কমলাকান্ত রাগিল, "কি? কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী ভিক্ষোপজীবী? আমি মুক্তকণ্ঠে হলফের উপর বলিতেছি, আমি কখনও কাহারও কাছে এক পয়সা ভিক্ষা চাই না।"

প্রসন্ন আর থাকিতে পারিল না—সে বলিল, "সে কি ঠাকুর! কখন আফিঙ্গ চেয়ে খাও নাই?"

কমলা। দূর মাগি ধেমো গোযালের মেযে! আফিঙ্গ কি পযসা! আমি কখন একটি পয়সাও কাহারও কাছে ভিক্ষা লই নাই।

হাকিম হাসিযা বলিলেন, "কি লিখিব, কমলাকান্ত?"

কমলাকান্ত নরম হইযা বলিল, "লিখুন, পেশা ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ-গ্রহণ।" সকলে হাসিল—হাকিম তাই লিখিয়া লইলেন।

তখন উকীল মহাশয মোকদ্দমায প্রবৃত্ত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি ফরিযাদীকে চেন?"

কমলা। না।

প্রসন্ন হাঁকিল, "সে কি, ঠাকুর! চিরটা কাল আমার দুধ দই খেলে, আজ বল চিনি না?"

কমলাকান্ত বলিল, "তোমার দুধ দই চিনি না, এমন কথা ত বলিতেছি না—তোমার দুধ দই বিলক্ষণ চিনি। যখনই দেখি এক পোযা দুধে তিন পোয়া জল, তখনই চিনতে পারি যে, এ প্রসন্ন গোয়ালীর দুধ; যখনই দেখতে পাই যে, ঘোলের চেযে দই ফিকে, তখনই চিনতে পারি যে, এ প্রসন্নমযীর দধি। দুধ দই চিনি নে?"

প্রসন্ন নথ ঘুরিযা বলিল, "আমার দুধ দই চেন, আর আমায় চিনতে পার না?"

কমলাকান্ত বলিল, "মেয়েমানুষকে কে কবে চিনিতে পেরেছে, দিদি? বিশেষ, গোযালার মেযের কাঁকালে যদি দুধের কেঁড়ে থাকিল, তবে কার বাপের সাধ্য তাকে চিনে উঠে?"

উকীল তখন আবার সওয়াল করিতে লাগিলেন, "বুঝা গেল; তুমি বাদিনীকে চেন—উহার সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ আছে?"

কমলা। মন্দ নয়—এত গুণ না থাকিলে কি উকীল হয়!

উকীল। তুমি আমার কি গুণ দেখিলে?

কমলা। বামনের ছেলে গোয়ালার মেয়েতেও আপনি একটা সম্বন্ধ খুঁজিযা বেড়াইতেছেন।

উকীল। এমন সম্বন্ধ কি হয় না? কে জানে তুমি ওর পোষ্যপুত্র কি না?

কমলা। ওর নয়, কিন্তু ওর গাইযের বটে।

উকীল। বুঝা গেল, তোমার সঙ্গে বাদিনীর একটা সম্বন্ধ আছে, একেবারে সাফ বলিলেই হইত—এত দুঃখ দাও কেন? এখন জিজ্ঞাসা করি, তুমি এ মোকদ্দমার কি জান?

কমলা। জানি যে, এ মোকদ্দমায আপনি উকীল, প্রসন্ন ফরিয়াদী, আমি সাক্ষী আর এই নেড়ে আসামী।

উকীল। তা নয়, গোরুচুরির কি জান?

কমলা। গোরুচুরি আমাব বাপ দাদাও জানে না। বিদ্যাটা আমায শিখাইবেন?—আমার দুধ দধির বড দরকার।

উকীল। আঃ—বলি গোরুচুরি দেখিয়াছ?

কমলা। একদিন দেখিয়াছিলাম। নসীবাবুর একটা বকনা—এক বেটা মুচি—

উকীল। কি যন্ত্রণা! বলি, প্রসন্ন গোযালিনীর গোরু যখন চুরি যায, তখন তুমি দেখিয়াছ?

কমলা। না—চোর বেটার এত বুদ্ধি হয় নাই যে, আমাকে ডাকিয়া সাক্ষী রাখিয়া গোরুটা চুরি করে। তাহা হইলে আপনারও কাজের সুবিধা হইত, আমারও কাজের সুবিধা হইত।

প্রসন্ন দেখিল, উকীলকে টাকা দেওয়া সার্থক হয নাই—তখন আপনার হাতে হাল লইবার ইচ্ছায, উকীলের কানে কানে বলিয়া দিল, "ও বামন সে সব কিছুর সাক্ষী নয়—ও কেবল গোরু চেনে।"

উকীল মহাশয তখন কুল পাইলেন। গর্জ্জিযা উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি গোরু চেন?"

কমলাকান্ত মধুর হাসিযা বলিল, "আহা, চিনি বই কি—নহিলে কি আপনার সঙ্গে এত মিষ্টালাপ করি?"

হাকিম দেখিলেন, সাক্ষী বড় বাড়াবাড়ি করিতেছে—বলিলেন, "ও সব রাখ।" প্রসন্ন গোয়ালীর শামলা গাই আদালতের সম্মুখে মাঠে বাঁধা ছিল—দেখা যাইতেছিল। ডিপুটি বাবু সেই দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই গোরুটি চেন?"

কমলাকান্ত যোড়হাত করিয়া বলিল, "কোন্ গোরুটি, ধর্ম্মাবতার?"

হাকিম বলিলেন, "কোন্ গরুটি কি? একটি বই ত সাম্‌নে নাই?"

কমলা। আপনি দেখিতেছেন, একটি—আমি দেখিতেছি, অনেকগুলি।

হাকিম বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "দেখিতে পাইতেছ না—ঐ শামলা ?"

কমলাকান্ত শামলা গাইযের দিকে না চাহিয়া উকীলের শামলার প্রতি চাহিল। বলিল, "এ শামলাও চুরির না কি ?"

কমলাকান্তের নষ্টামি হাকিম আব সহ্য করিতে পারিলেন না—বলিলেন, "তুমি আদালতের কাজেব বড় বিঘ্ন করিতেছ—Contempt of Court জন্য তোমার পাঁচ টাকা জরিমানা।"

কমলাকান্ত আভূমিপ্রণত সেলাম কবিয়া যোডহাত কবিয়া বলিল, "বহৎ খুব হজুব ! জরিমানা আদায়ের ভার কার প্রতি ?"

হাকিম। কেন ?

কমলা। কিরূপে আদায করিবেন, সে বিষয়ে তাঁহাকে কিছু উপদেশ দিব।

হাকিম। উপদেশের প্রযোজন কি ?

কমলা। ইহলোকে ত আমার নিকট জরিমানা আদাযের কোন সম্ভাবনা নাই—তিনি পরলোকে যাইতে প্রস্তুত কি না জিজ্ঞাসা করিব।

হাকিম। জরিমানা না দিতে পাব, কযেদ যাইবে।

কমলা। কত দিনের জন্য, ধর্ম্মাবতার ?

হাকিম। জরিমানা অনাদাযে এক মাস কয়েদ।

কমলা। দুই মাস হয় না ?

হাকিম। বেশী মিযাদের ইচ্ছা কর কেন ?

কমলা। সময়টা কিছু মন্দ পড়িযাছে—ব্রাহ্মণভোজনেব নিমন্ত্রণ আব তেমন সুলভ নয—জেলখানায যাহাতে মাস দুই ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ হয, সে ব্যবস্থা যদি আপনি করেন, তবে গরীব ব্রাহ্মণ উদ্ধার পায।

এরূপ লোককে জরিমানা বা কযেদ করিয়া কি হইবে। হাকিম হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি যদি গোল না করিয়া সোজা জোবানবন্দী দাও, তবে তোমার জরিমানা মাপ করা যাইতে পারে। বল—ঐ গোরু তুমি চেন কি না ?"

হাকিম তখন এক জন কনষ্টেবলকে আদেশ করিলেন যে, গোরুব নিকট গিযা প্রসন্নের গাই দেখাইযা দেয। কনষ্টেবল তাহাই করিল। বিষণ্ণ উকীল বাবু তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ গোরু তুমি চেন।"

কমলা। সিংওযালা গোরু—তাই বলুন।

উকীল। তুমি বল কি ?

কমলা। আমি বলি শামলাওয়ালা—তা যাক্—আমি ও সিংওয়ালা গোরুটা চিনি। বিলক্ষণ আলাপ আছে।

উকীল। ও কার গোরু ?

কমলা। আমার।

উকীল। তোমার।

কমলা। আমারই।

হরি হরি! প্রসন্নের মুখ শুকাইল। উকীল দেখিল, মোকদ্দমা ফাঁসিয়া যায়। প্রসন্ন তখন তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিল, "তবে রে বিট্‌লে! গোরু তোমার।"

কমলাকান্ত বলিল, "আমার না ত কার! আমি ওর দুধ খেয়েছি, ওর দই খেয়েছি—ওর ঘোল খেয়েছি, ওর ছানা খেয়েছি—ওর মাখন খেয়েছি, ওর ননী খেয়েছি—ও গোরু আমার হলো না, তুই বেটী পালিস্ ব'লে কি তোর বাবার গোরু হলো।"

উকীল অতটা বুঝিলেন না। বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার, witness hostile। permission দিন, আমি ওকে cross করি।"

কমলা। কি ? আমায় cross করিবে ?

উকীল। হাঁ, করিব।

কমলা। নৌকায়, না সাঁকো বেঁধে ?

উকীল। সে আবার কি ?

কমলা। বাবা! কমলাকান্ত-সাগর পার হও, এত বড় হনুমান্ তুমি আজও হও নাই।

এই বলিয়া কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী রাগে গর্ গর্ করিয়া কাটরা হইতে নামিয়া যায়—চাপরাশী ধরিয়া আবার কাটরায় পুরিল। তখন কমলাকান্ত আলুথালু হইয়া নিশ্চেষ্ট হইল—বলিল, "কর বাবা ক্রস্ কর!—আমি অগাধ সমুদ্রে পড়িয়া আছি—যে ইচ্ছা সে লম্ফ দাও—'অপামিবাধারমনুত্তরঙ্গং!'—উকীল মহাশয়! এ প্রশান্ত মহাসমুদ্র তরঙ্গ বিক্ষেপ করে না, আপনি স্বচ্ছন্দে উল্লম্ফন করুন!"

উকীল তখন কোর্টকে বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার, দেখা যাইতেছে যে, এ ব্যক্তি বাতুল; ইহাকে আর ক্রস্ করিবার প্রয়োজন নাই। বাতুল বলিয়া ইহার জোবানবন্দী পরিত্যক্ত হইবে। ইহাকে বিদায় দেওয়া হউক।"

হাকিম কমলাকান্তের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলে বাঁচেন, বিদায় দিতে প্রস্তুত, এমত সময়ে প্রসন্ন হাত যোড় করিয়া আদালতে নিবেদন করিল, "যদি হুকুম হয়, তবে আমি স্বয়ং উহাকে গোটা কত কথা জিজ্ঞাসা করি, তার পর বিদায় দিতে হয়, দিবেন।"

হাকিম কৌতূহলী হইয়া অনুমতি দিলেন। প্রসন্ন তখন কমলাকান্তের প্রতি চাহিয়া বলিল, "ঠাকুর! মৌতাতের সময় হয়েছে না ?"

কমলা। মৌতাতের আবার সময় কি রে বেটী—"অজরামরবৎ প্রাজ্ঞঃ বিদ্যাং নেশাঞ্চ চিন্তয়েৎ।"

প্রসন্ন। অং বং এখন রাখ—এখন মৌতাত করিবে ?

কমলা। দে !

প্রসন্ন। আচ্ছা, আগে আমার কথার উত্তর দাও—তার পর সে হবে।

কমলা। তবে জল্‌দি জল্‌দি বল—জল্‌দি জল্‌দি জবাব দিই।

প্রসন্ন। বলি, গোরু কার ?

কমলা। গোরু তিন জনের ; গোরু প্রথম বয়সে গুরুমহাশয়ের ; মধ্য বয়সে স্ত্রীজাতির ; শেষ বয়সে উত্তরাধিকারীর ; দড়ি ছিঁড়িবার সময়ে কারও নয়।

প্রসন্ন। বলি, ঐ শামলা গাই কার ?

কমলা। যে ওর দুধ খায় তার।

প্রসন্ন। ও গোরু আমার কি না ?

কমলা। তুই বেটী কখন ওর এক বিন্দু দুধ খেলি নে, কেবল বেচে মর্‌লি, গোরু তোর হলো ? ও গোরু যদি তোর হয় তবে বাঙ্গাল বেঙ্কের টাকাও আমার। দে বেটী, গোরুচোরকে ছেড়ে দে—গরীবের ছেলে দুধ খেয়ে বাঁচুক।

হাকিম দেখিলেন, দুই জনে বড় বাড়াবাড়ি করিতেছে—আদালত মেছো-হাটা হইয়া উঠিল। তখন উভয়কে ধমক দিয়া, জিজ্ঞাসাবাদ নিজহস্তে লইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রসন্ন এই গোরুর দুধ বেচে ?"

কমলা। আজ্ঞা, হাঁ।

"উহার গোয়ালে এই গোরু থাকে ?"

কমলা। ও গোরুও থাকে, আমিও কখন কখন থাকি।

"ঐ খাওয়ায় ?"

কমলা। উভয়কে।

বাদিনীর উকীল তখন বলিলেন, "আমার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে—আমি উহাকে আর জিজ্ঞাসা করিতে চাই না।" এই বলিয়া তিনি উপবেশন করিলেন। তখন আসামীর উকীল গাত্রোত্থান করিলেন। দেখিয়া কমলাকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার তুমি কে ?"

আসামীর উকীল বলিলেন, "আমি আসামীর পক্ষে তোমাকে ক্রস্ করিব।"

কমলা। একজন ত ক্রস্ করিয়া গেল, আবার তুমি কুমার বাহাদুর এলে না কি ?

উকীল। কুমার বাহাদুর কে ?

কমলা। রাজপুত্রকে চেন না? ত্রেতা যুগে আগে ক্রস্ করিলেন, পবনাত্মজ মহাশয়। তার পর ক্রস্ করিলেন কুমার বাহাদুর।*

উকীল। ও সব রাখ—তুমি গোরু চেন বলেছ—কিসে চেন?

কমলা। কখন শিঙ্গে—কখন শামলায়!

উকীল রাগিষা উঠিযা, গর্জ্জন করিয়া, টেবিল চাপড়াইযা বলিলেন, "তোমার পাগলামি রাখ—তুমি এই গোরু চিনিতে পারিতেছ কিসে?"

কমলা। ঐ হাম্বা-রবে।

উকীল হতাশ হইয়া বলিলেন, "Hopeless!" উকীল মহাশয বসিয়া পড়িলেন—আর জেরা করিবেন না। কমলাকান্ত বিনীতভাবে বলিল, "দড়ি ছেঁড় কেন, বাবা?"

উকীল আর জেরা করিবেন না দেখিয়া হাকিম কমলাকান্তকে বিদায দিলেন। কমলাকান্ত ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইল। আমি কিছু কাজ সারিয়া বাহিরে আসিযা দেখিলাম যে, কমলাকান্ত থেলো হুঁকা হাতে করিয়া বসিযা আছে—চারি দিকে লোক জমিযাছে—প্রসন্নও সেখানে আসিয়াছে। কমলাকান্ত তাহাকে তিরস্কার করিতেছে আর বলিতেছে, "তোর মঙ্গলার বাঁটের দিব্য, তোর দুধের কেঁড়ের দিব্য, তোর ঘোল-মউনির দিব্য, তোর ফাঁদি-নথের দিব্য, তুই যদি চোরকে গোরু ছেড়ে না দিস্।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "চক্রবর্ত্তী মহাশয! চোরকে গোরু ছাড়িয়া দিবে কেন?"

কমলাকান্ত বলিল, "পূর্ব্বকালে মহারাজ শ্যেনজিৎকে এক ব্রাহ্মণ বলিয়াছিল যে, 'বৎস, গোপস্বামী ও তস্কর, ইহাদের মধ্যে যে ধেনুর দুগ্ধ পান করে, সেই তাহার যথার্থ অধিকারী। অন্যের তাহার উপর মমতা প্রকাশ করা বিডম্বনা মাত্র।' † এই হলো ভীষ্মদেব ঠাকুরের Hindu Law, আর ইহাই এখনকার ইউরোপের International Law। যদি সভ্য এবং উন্নত হইতে চাও, তবে কাড়িযা খাইবে। গো শব্দে ধেনুই বুঝ আর পৃথিবীই বুঝ, ইনি তস্করভোগ্যা। সেকন্দর হইতে রণজিৎ সিংহ পর্য্যন্ত সকল তস্করই ইহার প্রমাণ। Right of Conquest যদি একটা right হয়, তবে Right of theft, কি একটা right নয়? অতএব, হে প্রসন্ন নামে গোপকন্যে! তুমি আইনমতে কার্য্য কর। ঐতিহাসিক রাজনীতির অনুবর্ত্তী হও। চোরকে গোরু ছাড়িয়া দাও।"

এই বলিয়া কমলাকান্ত সেখান হইতে চলিয়া গেল। দেখিলাম, মানুষটা নিতান্ত ক্ষেপিয়া গিযাছে।

খোশনবীস জুনিয়র

* অঙ্গদ। † শান্তি পর্ব্ব, ১৭৪ অধ্যায়।

সংক্ষিপ্ত টীকা

প্রথম সংখ্যা

একা

"কে গায় ওই ?"

পরিচয়—দপ্তরের প্রথম সংখ্যাটিতে কমলাকান্তরূপী বঙ্কিমচন্দ্রের তিনটি উপলব্ধি ব্যক্ত হইয়াছে। প্রথমটি এই যে তিনি একা; দ্বিতীয়টি, আশা মানুষের জীবনকে রঙিন করিয়া তোলে; তৃতীয়টি 'প্রীতি সংসারে সর্ব্বব্যাপিনী—প্রীতিই ঈশ্বর।'

লেখকের এই ভাবনা-কয়টির মূলে রহিয়াছে একটি গীত। বঙ্কিমচন্দ্র সংগীতানুরাগী ছিলেন—মৃণালিনী আর ইন্দিরাতে তাঁর গানের পরিচয় পাওয়া যায়—বন্দে মাতরম্ আর এই গ্রন্থেরই 'একটি গীত' (দ্বাদশ সংখ্যা) তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ।—পথিক পথ দিয়া যাইতে যাইতে আপন মনে গান গাহিতেছিল। সেই গানের সুর তাঁহার কাছে 'বহুকাল-বিস্মৃত সুখস্বপ্নের ন্যায়' মধুর বলিয়া মনে হইয়াছে। পথিকের মন জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রির অপরূপ সৌন্দর্য দেখিয়া আনন্দে ভরিয়া গিয়াছে—তাই সে গান গাহিতেছিল; কিন্তু সেই গান শুনিয়া কমলাকান্তের হৃদয় আলোড়িত হয় কেন এই প্রশ্ন তাঁহার মনে জাগিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রকৃতির এই অপরূপ শোভার মধ্যে সকলের মনেই আনন্দ উথলিয়া উঠিতেছিল। কেবল তিনি নিজে এই আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া ছিলেন—তাঁহার অন্তর ছিল নিরানন্দ; তাই আনন্দের সংবাদ লইয়া পথিকের গান যখন তাঁহার কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়াছে, তখনই তাঁহার অন্তর সহসা সমাগত আনন্দের প্রবাহে আলোড়িত হইয়াছে।

তাঁহার আনন্দের অভাব কেন তাহা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি একা, সেইজন্যই তাঁহার আনন্দ নাই। বিশ্বময় যে আনন্দোচ্ছলিত জীবনধারা প্রবাহিত হইতেছে তাহার মধ্যে আপনাকে বিলীন করিয়া দিবার একটা বাসনা তাঁহার অন্তরে জাগিয়াছে—কিন্তু সে বাসনা সফল হইবে কি না সে বিষয়ে তাঁহার ঘোরতর সন্দেহ আছে। সেইজন্য তিনি সে কথা এড়াইয়া সকলকে একা না থাকিতে বলিয়াছেন। অপরের ভালোবাসার পাত্র না হইলে মানুষের জন্মই বৃথা—পরের ভালো লাগে বলিয়াই ফুলের জীবন সার্থক—পরের জন্যই হৃদয়কে বিকশিত করিয়া তুলিতে হইবে।

ঐ গানের সুর তাঁহার অন্তরে আনন্দের যে বন্যা বহাইযা দিয়াছে তাহার কারণ এই যে, তিনি বহুকাল এমন বিশুদ্ধ আনন্দ হইতে উদ্ভূত সংগীত শোনেন নাই— প্রকৃত আনন্দ অনুভব করেন নাই। তাহার কারণ এই যে, তাঁহার যৌবন বহুদিন হইল গত হইযাছে। যৌবনে প্রকৃতি তাঁহার কাছে শোভার আধার বলিযা মনে হইত, মানুষ তাঁহার কাছে সারল্যের প্রতিমূর্তি বলিয়া মনে হইত—সেইজন্য তাঁহাব আনন্দের সীমা ছিল না। তখন সংগীত শুনিয়া যে আনন্দ হইত এখন তাহা মনে পড়িল। তখন কারণে অকারণে যে অপরিসীম আনন্দ জীবন ভরিযা দিত তাহা তাঁহাব মনে পড়িল। তখন অন্তরে যে প্রফুল্লতা ছিল এখন তাহা না থাকায় এখন আর সে আনন্দ নাই—কেবল এই সংগীত সেই অতীত যৌবনের স্মৃতিটুকু বহন করিযা তাঁহার চিত্তকে আলোড়িত কবিযা তুলিযাছে।

সেই প্রফুল্লতা কেন নাই কমলাকান্তেব জবানীতে বঙ্কিমচন্দ্র তাহা বিশ্লেষণ করিযাছেন। তিনি বলিতেছেন যে, আশাই মানুষের জীবনকে আনন্দে ভরিযা রাখে। 'যৌবনে অর্জিত সুখ অল্প, কিন্তু সুখের আশা অপরিমিতা।'—কিন্তু বযস যতই বাডিযা চলে ততই আশাভঙ্গ হইতে থাকে। সুখ হযতো কিছু পরিমাণে বাড়ে, কিন্তু রূঢ় বাস্তবজ্ঞান মনের সেই অন্তহীন আশা বিদূরিত করিযা দেয। অভিজ্ঞতা বাডিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাশা কমিয়া আসে। জীবনের পথে যে অনেক বাধাবিঘ্ন আছে, যেখানে যাহা আশা করা যায সেখানে তাহা যে পাওয়া নাও যাইতে পারে, অনেক সময ব্যর্থতাও আশার ছদ্মবেশে আসে—এই বোধ ক্রমে অন্তরে সঞ্চারিত হইতে থাকে।

এখন অন্তরে সে আশা না থাকায় তিনি ঐ সংগীত আর দ্বিতীয়বার শুনিতে চাহেন না। এই সংগীতের পরিবর্তে অপর এক সংগীত শুনিবার জন্য তাঁহাব চিত্ত উৎসুক। পূর্বে তিনি যে বহুকণ্ঠধ্বনিত সংসার-সংগীত শুনিযাছিলেন তাহা আর শুনিবেন না। তিনি যে অপর সংগীত শুনিতেছেন তাহা তাঁহাব অন্তরকে গভীরতর আনন্দে পরিপূরিত করিযা দিতেছে। সেই সংগীত প্রীতিব সংগীত। প্রীতি সমগ্র সংসারে ব্যাপ্ত হইয়া রহিযাছে—ঈশ্বর প্রীতির মধ্য দিযাই ব্যক্ত। যৌবনোত্তর জীবনে প্রীতিই এখন তাঁহার কাছে সংসার-সংগীতের স্থান গ্রহণ করিযাছে। প্রীতির সুর যদি তাঁহার কানে চিরকাল বাজিতে থাকে তাহা হইলে অপর কিছুতে তাঁহার প্রয়োজন নাই। মানুষের প্রতি সুগভীর প্রীতিই তাঁহার প্রৌঢ় জীবনের সর্বোচ্চ কামনা।

পাঠপ্রসঙ্গে—কে গায় ওই—এখানে গায়ক কে তাহা লক্ষ্য নয়। লেখকের

কানে গানের সুরটি আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সেই সুরটি বা গানটিই তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছে। কে গায়ক তাহা জানিবার জন্য তিনি উৎসুক নন।

সুখস্বপ্নের স্মৃতির ন্যায়—বঙ্কিমচন্দ্র সংগীতরসিক ছিলেন। কিন্তু এখানে সংগীতের উৎকর্ষ যে তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে এমন নয়। সংগীতের মূলে যে আনন্দ আছে তাহাই তাঁহার চিত্তকে আলোড়িত করিয়াছে—তাঁহার অন্তরে অতীতকালের আনন্দের স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে এই রচনাটি প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তদেশে দাঁড়াইয়া যৌবনের সুখস্বপ্নের ক্ষণিক অনুভূতি বলা যাইতে পারে। সুখস্বপ্ন নিমেষকালের জন্য দৃষ্ট হয়, তাহার পর বিলীন হইয়া যায়। এখানেও বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরে যে স্মৃতি জাগিয়াছে তাহাও কেবল মুহূর্তকালব্যাপী—রচনাটির শেষভাগে দেখি যে, তিনি আনন্দের স্মৃতিটুকুকে গভীরতর উপলব্ধির মধ্যে ডুবাইয়া দিয়াছেন। বিগত যৌবনের আনন্দময় স্মৃতি তাঁহার নিকট সুখস্বপ্নের মতো অনুভূতিগ্রাহ্য অথচ অপ্রাপ্য ও ক্ষণিক বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে; সেই সঙ্গে জীবনের প্রৌঢ় অনুভূতি তাঁহার চিত্তকে ভাবস্থিত করিয়াছে। যৌবনের আনন্দচঞ্চল স্মৃতিকে অতিক্রম করিয়া গভীরতর রহস্যানুসন্ধানেব এই প্রবণতা প্রবীণ লেখকের পক্ষে স্বাভাবিকই হইয়াছে।

মনের আনন্দ উছলিয়া উঠিতেছে—মানুষের সৌন্দর্যানুভূতি ও শিল্পসাধনা তাহার আনন্দবৃত্তি হইতেই উদ্ভূত। প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখিয়া পথিকের অন্তরে আনন্দ উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে—সংগীতের মধ্য দিয়া সেই আনন্দেরই অভিব্যক্তি হইতেছে। অবশ্য শিল্পমাত্রই সাধনার অপেক্ষা রাখে। যে পথিক গান গাহিতে গাহিতে যাইতেছে তাহাকে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু পরিমাণে সংগীতকলার সাধনা করিতে হইয়াছে, কিন্তু তাহার এই গানকে নিছক একটা শিল্পকর্ম বলা চলে না। শিল্পসৃষ্টির মধ্যেও একটা আনন্দ আছে সন্দেহ নাই—সে আনন্দ সৃষ্টির আনন্দ। কিন্তু এখানে গীতরত পথিকের মনে যে আনন্দ জাগিয়াছে তাহা স্বতন্ত্র জাতীয় আনন্দ। প্রকৃতির উদার সৌন্দর্য তাহার অন্তরে রম্যতার ভাব সঞ্চার করিয়া তুলিয়াছে—সংগীত তাহারই একটা তির্যক প্রতিফলন। সৌন্দর্যানুভূতি পরিতৃপ্ত হওয়ায় তাহার আনন্দবৃত্তির আর একটি শাখা শিল্পানুভূতি সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, বাস্তবিকপক্ষে এই ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া অর্ধসজ্ঞান।

আমার হৃদয়কে আলোড়িত করে কেন—আলংকারিকরা কাব্যকে সহৃদয় হৃদয়সংবাদী বলেন। সংগীতপ্রমুখ অন্যান্য শিল্পকলা সম্পর্কেও ঐ কথাই বলা যাইতে পারে। শিল্পী যখন কোনো সৃষ্টি করেন তখন তাহার মধ্যে কোনো ভাবের

আপনার অনুভূতি দ্বারা বিশেষীকৃত রূপ ফুটাইয়া তোলেন। প্রত্যেক মানুষের অন্তরের মধ্যে পার্থক্য আছে। একই বিষয় বিভিন্ন মানুষের কাছে বিভিন্ন মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। তবে বংশাগতি বা পরিবেশলব্ধ সংস্কারের সাজাত্যের জন্য বিভিন্ন মানুষের অন্তরেও একটা সাধারণ প্রবৃত্তি দেখা যায়। শিল্পকর্ম ব্যক্তি-বিশেষের সৃজনব্যাপার হইলেও সাধারণীকরণের ফলে বহুজনগ্রাহ্য হইয়া উঠে। সেইজন্যই একজনের সৃষ্ট শিল্প অপর একজনের অন্তরকে স্পর্শ করিতে পারে।— এখানে অবশ্য লেখক তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইবার অপর একটি কারণ দেখাইয়াছেন।

আমিই কেবল নিরানন্দ ইত্যাদি—সকলের মনেই আনন্দ আছে; সেইজন্য তাহারা আনন্দপ্রবাহের মধ্যে আপনাদের ডুবাইয়া দিতে পারিয়াছে। সেইজন্য এই গান তাহাদের চিত্তে নূতন কোনো ভাবনার উদ্রেক করে নাই। কিন্তু লেখকের অন্তরে আনন্দ নাই; সেইজন্য এই আনন্দোদ্ভূত সংগীত তাঁহার কাছে একটি বিশেষ বস্তু বলিয়া মনে হইযাছে এবং তাহা তাঁহার চিত্তে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহার হৃদয় বেসুরা বলিয়া সুরের স্পর্শে তাঁহার চিত্ত আন্দোলিত হইতেছে।— লেখক কেন যে নিরানন্দ তাহা স্পষ্টভাবে বলেন নাই। রচনাটির শেষ অংশে বৃদ্ধ বয়সে আশার অভাবে মানুষের হৃদযে আনন্দের পরিমাণ যে কমিয়া আসে তাহা বলা হইযাছে। তবে পরবর্তী অনুচ্ছেদেই যে একাকিত্ববোধের পরিচয পাওয়া যায তাহাই এই নিরানন্দের মূল এরূপ অনুমান করা অসংগত হইবে না।

আমি একা—বৃদ্ধ বযসে কমলাকান্ত সকল সঙ্গী হারাইয়া একা হইযা পডিযাছেন। আনন্দে মুখর পৃথিবীতে সে নিরানন্দ বলিয়াও একাকী। বাস্তবিকপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন আলোচনা করিলে তাঁহার একাকিত্বই সবচেযে বেশি করিযা আমাদের চোখে পড়ে। যৌবনে যখন তিনি সাহিত্যসৃষ্টিতে ব্রতী হইযাছিলেন তখন তাঁহার কযেকজন সাহিত্যানুরাগী বন্ধু হযতো ছিল; কিন্তু পরিণত বয়সে তিনি যখন লেখনী ধারণ করিয়া গুরুত্বপূর্ণ অপর কার্যে অগ্রসর হইযাছেন তখন তাঁহাকে একাকীই সাধনা করিতে হইযাছে। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিযা ধর্মতত্ত্ব, শ্রীমদ্‌ভগমদগীতা প্রভৃতি বিষযে বা সামাজিক, ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক বহু বিষযে সত্যান্বেষী ও মানব-প্রেমিকের দৃষ্টি লইয়া যে আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে যোগ দিয়া সহায়তা করিবার মতো লোক তিনি পান নাই। তিনি বারবার নব্য শিক্ষিত এবং প্রাচীনপন্থী উভয় দলের বাঙালীর চিন্তার দ্বারে করাঘাত করিয়াছেন, কিন্তু সাড়া পান নাই বলিলেই হয়। এমন কি কযেকটি উপন্যাসের মধ্যে তাঁহার যে সুগভীর জীবনদৃষ্টি

ব্যক্ত হইযাছে, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সাহিত্যানুরাগীরা তাহার কতটুকু উপলব্ধি করিতে পারিযাছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহেব অবকাশ আছে।

এই বহু জনাকীর্ণ ইত্যাদি—বহুজন-পরিবেষ্টিত হইযাও নিঃসঙ্গ থাকাব নিযতিই বেশির ভাগ প্রতিভাধর পুরুষের ভাগ্যে ঘটিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র যে পৃথিবীতে বাস করিতেন সে পৃথিবীতে কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। এ যুগে বহু মনীষী বা কর্মী ঐভাবে আগন্তুকের মতো এই পৃথিবীতে আসিযা দোসরহীন অবস্থায় আপনাদেব ভাবনার ডালা লইযা ফিরিযাছেন। আত্মার এই নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্ব সকল যুগে সকল দেশেই প্রতিভাশালী শিল্পীর জীবনে দেখিতে পাওযা যায।

কেহ একা থাকিও না—উপনিষদে পাওযা যায যে, ব্রহ্ম প্রথমে একা ছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার তৃপ্তি হইল না। তিনি তখন প্রজাকাম হইযা এই বিশ্বকে সৃষ্টি করিলেন। মানুষ একা থাকিতে পারে না—তাহার মনকে উন্মুক্ত করিয়া দিবার মতো একটা অবকাশ একটা অবলম্বন থাকা চাই। বঙ্কিমচন্দ্র উপনিষদ দ্বারা প্রভাবিত হইযাছেন বলিযা মনে হয না। তবে উপনিষদের এই ভাবটির সহিত তাঁহাব চিন্তাটির নিকট সাদৃশ্য আছে। উপনিষদে আত্মার সত্যকামনার কথা বলা হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র হৃদয়েব সংযোগকেই প্রাধান্য দিযাছেন। মানুষ আত্মকেন্দ্রিক না হইয়া অপরের সহিত হৃদয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করিবে ইহা বলাই তাঁহার অভিপ্রায। তাঁহার এই অভিমতটির মূলে পাশ্চাত্ত্য মানবপ্রেমেব আদর্শের প্রভাব আছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যে রোমান্টিক আদর্শবাদ ইউরোপ, বিশেষ করিযা ইংলণ্ডের ভাবুক সমাজকে উদ্বুদ্ধ করিযাছিল তাহাও কতক পরিমাণে তাঁহার বোধটিকে প্রভাবিত করিয়াছে। কযেক ছত্র পরে 'পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না। পবেব জন্য তোমার হৃদযকুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও' এই ভাবটি পাশ্চাত্ত্য পরিহিত-সাধনব্রতের আদর্শ।

তাহা বলি নাই—এখন তিনি সংগীত ভালো লাগার মূল কারণটি বলিতে উদ্যত হইযাছেন। পূর্বে নিজের নিরানন্দ ও একাকিত্ব সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহা তাঁহার এই মূল উক্তির ভূমিকামাত্র।

এ হৃদয আর তাই নাই—ক্রোচে প্রমুখ আধুনিক নন্দনতাত্ত্বিক বলেন যে, কোনো বিষয় নিজে সুন্দর কিংবা অসুন্দর নয়। মানুষের চিত্তটাই সব। মানুষের চিত্তে যাহা সুন্দর বলিযা প্রতিভাত হয তাহাকেই সুন্দর বলা হয়; মানুষেব চিত্তে যাহা অসুন্দর বলিয়া প্রতিভাত হয তাহাকেই অসুন্দর বলা হয়। কমলাকান্তরূপী বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন যে, যৌবনে যখন তাঁহার চিত্তে স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ছিল তখন সকলই তাঁহার নিকট সুন্দর বলিয়া মনে হইয়াছে। এখন জীবনের রূপ যে পালটাইয়া

গিযাছে এমন নয। তবে বযোবৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে নানাকারণে তাঁহাব অন্তরের সেই প্রফুল্লতা বিনষ্ট হইযা যাওযায এখন আর এই পৃথিবী তাঁহাব কাছে আনন্দময বলিযা মনে হয না। দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভঙ্গির পবিবর্তন সাধিত হওযায পৃথিবীর রূপ তাঁহাব কাছে পরিবর্তিত হইযা গিযাছে। তিনি মনে মনে ('মনেব ভিতব মন লুকাইযা') যৌবনেব আনন্দের কথা চিন্তা করিতেছিলেন ; সেই সময়ে সংগীতধ্বনি তাঁহার কানে পৌঁছানোতেই এই সংগীতধ্বনি তাঁহাব ভালো লাগিযাছে। এই সংগীত যেন মুহূর্তকালের জন্য তাঁহার প্রবীণতাজনিত আনন্দেব অভাব দূব করিযা অকাবণ-আনন্দের উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ যৌবনের স্মৃতি জাগাইযা দিয়াছে। সেইজন্য এই সংগীত তাঁহার কাছে মধুর বলিয়া মনে হইযাছে।

ক্ষতি অপেক্ষা অর্জ্জন অধিক—মানুষ তাহাব শক্তি ও উদ্যম ব্যয কবিয়া সংসাব-যাত্রায় একটা নিরাপদ ভিত্তি অর্জন কবে। বহুদিনব্যাপী প্রচেষ্টার ফলে এই ভিত্তিটি সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ক্ষতি অপেক্ষা অর্জনটাই বেশি বলিয়া নির্দেশ করা হইয়া থাকে। জীবনের প্রারম্ভে যাহা ছিল, তাহা অপেক্ষা অধিকতর সম্পদ অর্জন করা হইযাছে ইহাই সচরাচর দেখা যায। সারা জীবন খাটিযা মানুষ শেষ বযসে যেমন কিছু টাকা-পয়সা জমাইতে পারে তেমনি পুত্র-কন্যা, নাতী-নাতনী প্রভৃতি ভালবাসার পাত্র-পাত্রীর সংখ্যাও বাড়িয়া যায।

তবে বযসে স্ফূর্তি কমে কেন—যদি বযস বাড়িযা যাওযার সঙ্গে সঙ্গে সম্পদ বা অর্জিত সুখ বাড়িযা চলে তাহা হইলে হৃদযে আনন্দের উচ্ছ্বাস দিন দিন কমিয়া আসে কেন ইহাই লেখকের জিজ্ঞাসা।

আশা সেই রঙ্গিন কাচ—আশাকেই বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের সর্ববিধ আনন্দের মূল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আশা মানুষের অন্তরে একটা প্রবল শক্তি দান কবে। সেই শক্তির বলে মানুষ জীবনের সর্বসুখ আহবণ কবিবে বলিযা বিশ্বাস কবে। এইজন্য তাহার হৃদযে আনন্দ উচ্ছলিত হইযা উঠে।

এখন জানিয়াছি ইত্যাদি—বঙ্কিমচন্দ্র এখানে অভিজ্ঞতাকেই আশার প্রতিকূলরূপে স্থাপন করিয়াছেন। মানুষ যতক্ষণ কোনো বিষযের পরিণতি কী হইবে তাহা জানে না, ততক্ষণই সে অনেক কিছু আশা করে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে যখন সে দেখে যে, তাহার আশা সার্থক হইবার পথে অনেক বাধা, বারবার ব্যর্থতাই দেখা যাইতেছে তখন তাহার আশার পরিধি সংকীর্ণ হইযা আসে। বাইবেলে আছে যে, মানুষ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়া স্বর্গের সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। অভিজ্ঞতার সাহায্যে কোনো বিষয়ের

যথার্থ পরিচয় লাভ করিলেও তেমনই আশার সুখস্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়, বারবার আশা ভঙ্গ হইলে আশা করিবার শক্তিই অবসন্ন হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয়বার শুনিতে চাই না—বাস্তবিকপক্ষে ঐ বিশেষ সংগীতে কমলাকান্তের আকর্ষণ নাই—উহা তাঁহার যৌবনের স্মৃতি মুহূর্তের জন্য জাগ্রত করিয়া দিয়াছিল বলিয়াই তাঁহার নিকট মধুর বলিয়া মনে হইয়াছিল। সেইজন্য এখন আর তাহা শুনিতে চাহেন না। যৌবনের স্মৃতি আনন্দময় হইলেও কমলাকান্ত আর তাহা ফিরিয়া পাইতে চাহেন না। এখন তিনি এমন এক আনন্দের সন্ধান পাইয়াছেন যাহার কাছে যৌবনের উন্মাদনাময় আনন্দ তুচ্ছ বলিয়া মনে হইয়াছে। বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে গভীরতর জীবনবোধ জাগ্রত হওয়ায় তিনি যৌবনের আনন্দের উচ্ছ্বাসের পরিবর্তে শান্তরসাপ্লুত ধ্রুব আনন্দের জন্য উৎসুক হইয়াছেন।

প্রীতি সংসারে সর্ব্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি—এই উক্তিটি এই রচনাটির চরম বক্তব্য বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্র প্রীতিকে সকলের উপরে স্থান দিয়াছেন—ইহা তাঁহার প্রৌঢ় উপলব্ধির ফল। যৌবনে মানুষের মনে যে আনন্দ থাকে তাহা অনেকাংশে স্বকেন্দ্রিক—তখন সে নিজের হৃদয়ের আশায় মাতিয়া থাকায় অপরের দিকে বিশেষ চাহিয়া দেখে না। কিন্তু বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে যৌবনের উচ্ছ্বাস কমিয়া যায়—আশার তরঙ্গ শমিত হইয়া আসে—কিন্তু এই সময় সর্ববব্যাপী প্রেম হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চারিত হইতে পারে। প্রীতি ও ঈশ্বরের অভিন্নতা কল্পনা বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব। ইহার উপর পাশ্চাত্ত্য আদর্শের প্রভাব নাই। প্রেমভক্তির যে আদর্শ বৈষ্ণবীয় চিন্তায় দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্রকে তাহা আদৌ প্রভাবিত করে নাই। এই উক্তিটি তাঁহার স্বকীয় উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। 'মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না'—পরিসমাপ্তিতে এই উক্তিটিতে তিনি আপনার আদর্শটি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার দেশপ্রেমের মূলেও তাঁহার এই প্রীতি বর্তমান। স্বদেশের কল্যাণসাধনের কামনাও ইহার সহিত জড়িত। 'বাঙ্গালা নব্য লেখকদের প্রতি' তিনি যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার একাংশ এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে—'যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন তবে অবশ্য লিখিবেন।'

দ্বিতীয় সংখ্যা

মনুষ্য-ফল

পরিচয়—বঙ্কিমচন্দ্র মানবপ্রেমিক ছিললেন। কিন্তু তাঁহার মানবপ্রেম ভাববিহ্বলতায পরিণত হয় নাই। তাঁহার চরিত্রের মধ্যে একটা কঠোর পুরুষালিভাব ছিল—যাহার জন্য তিনি একদিকে যেমন স্রষ্টা হইয়াও কঠোর সমালোচক হইয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনই মানবপ্রেমিক হইয়াও মানবচরিত্র কঠোরভাবে সমালোচনা করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার উপন্যাসগুলির মধ্যে মানবচরিত্রচিত্রণ আছে বটে, কিন্তু সেখানে তিনি সোজাসুজিভাবে মানবচরিত্রের সমালোচনায় বিশেষ প্রবৃত্ত হইতে পারেন নাই। এখানে কমলাকান্তের মুখ দিযা তিনি কৌতুকের সুরে মানবচরিত্র সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

এই প্রবন্ধে তিনি মানুষকে ফলরূপে কল্পনা করিয়াছেন। আফিমের মাত্রা একটু বেশি চড়াইলে কমলাকান্ত মানুষকে ফলরূপে দেখিতেন। ফলের যেমন আকৃতি-প্রকৃতি বিভিন্নরূপের, মানুষের আকৃতি-প্রকৃতিও সেইরূপ বিভিন্ন। ফল সাধারণতঃ পাকিলে পড়িযা যায়, কিন্তু কোনো কোনোটি নানাকারণে অকালে খসিযা পড়ে; সেইরূপ মানুষও সাধারণতঃ বৃদ্ধ হইলে মৃত্যু বরণ করে। রোগ বা অন্য কারণে অনেক মানুষও আবার অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ফলের স্বাদ শ্রী বা গুণাগুণ যেমন বহুবিধ, মানুষের রূপগুণ প্রভৃতিও সেইরূপ বহুবিধ।

কমলাকান্ত বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে বিভিন্ন জাতীয় ফলরূপে দেখিয়াছেন। বড়োলোকদের তিনি কাঁটাল বলিয়া মনে করেন। কাঁটালের মধ্যে কতকগুলি আটালো, কতকগুলি ভুতুড়িতে পরিপূর্ণ—তেমনই বড়লোকদের অনেকেই অসার-চরিত্র। অনেক ফল ইঁচোড়েই খাওয়া হয়, অনেক ফল পাকিলেও আবার শৃগালের পেটে যায। তেমনই বড়লোকের অর্থ আত্মসাৎ করিবার লোকের অভাব হয় না। কাঁটাল পাকিলে যেমন তাহার চারিদিকে মাছি ভন্‌ভন্ করিতে থাকে, সেইরূপ বড়লোকের প্রসাদার্থীর অভাব কোন সময়েই ঘটে না। কাঁটাল ঘরে রাখিয়া দিলে পচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হয়; বড়লোক কেবল অর্থসঞ্চয় করিলেও নানা বিপত্তির আশঙ্কা থাকিয়া যায়।

কমলাকান্ত সিবিল সার্বিসের সাহেবদের আমের সহিত তুলনা করিয়াছেন। আম দেখিতে সুন্দর—কিন্তু কাঁচায় অত্যন্ত টক, অনেক আম পাকিলেও টক থাকিয়া

যায়। তেমনই সিবিল সার্বিসের সাহেবরা বাহ্যত উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইলেও তাহাদের অনেকের প্রকৃতিতেই উগ্রতা দেখা যায়—এ দেশে বহুকাল থাকিবার পরও অনেকের উগ্রতা যায় না। অনেক খারাপ আম যেমন বাহ্যত সুন্দর হওযায ফাঁকি দিয়া বেশি দামে বিক্রি হইয়া যায; তেমনই অনেক সাহেব গুণহীন হইলেও উচ্চ বেতনে নিযুক্ত আছে।—যাহারা আম্ররসিক তাহারা যেমন আম পাড়িযাই না খাইয়া প্রথমে তাহাকে ঠাণ্ডা জলে বা সুবিধা হইলে বরফ জলে শীতল করিয়া তাহার পর ছুরি চালায়, তেমনই যাহারা সিবিল সার্বিসের সাহেবদের সহিত আচার-ব্যবহারে পটু তাহারা প্রথমে সেলাম বাজাইযা খোসামোদ করিয়া তাহার পর কার্যসিদ্ধি করে।

সাধারণ লোকে স্ত্রীলোককে কলাগাছের সহিত তুলনা করে। কিন্তু কমলাকান্ত এই তুলনার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিতে পারেন না। তাঁহার মতে কলা ও স্ত্রীজাতির মধ্যে সাদৃশ্য এই যে, দুইই বানরের প্রিয। অনেকে বাহ্যরূপ মাত্র সার দেখিয়া স্ত্রীজাতিকে মাকাল ফলের সহিত তুলনা করেন। কিন্তু কমলাকান্ত ইহাও স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে রমণী এই সংসারে নারিকেলের সহিত তুলনীয। নারিকেল যেমন লোকে কাঁদি কাঁদি পাড়ে না—প্রয়োজন অনুসারে একটি আধটি পাড়ে, বিবাহের বেলাও সেই কথা প্রযোজ্য। কেবল নারিকেল-ব্যবসায়ীর সহিত তুলনীয় বিবাহ-ব্যবসায়ী কুলীনরা ইহার অন্যথাচরণ করে।

নারিকেল ও স্ত্রীজাতি উভয়ই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায থাকে। প্রথম অবস্থায় নারিকেলের জলে পেট ঠাণ্ডা হয—কিশোরীর অকৃত্রিম প্রেমও স্নিগ্ধকর। নারিকেলের ডাবই ভালো—স্ত্রীজাতির যৌবনাবস্থাই শ্রেষ্ঠ। উভয়েরই রূপ অতুলনীয। চৈত্রের দ্বিপ্রহরে সদ্যপাড়া ডাব ও সংসারশিক্ষাহীনা যুবতী দুইই নিরতিশয় তপ্ত—প্রথমে শীতল করিয়া তাহার পর ব্যবহারযোগ্য।

কমলাকান্তের মতে নারিকেলের জল, শস্য, মালা ও ছোবড়া এবং স্ত্রীলোকের স্নেহ বুদ্ধি, বিদ্যা ও রূপ তুলনীয। রৌদ্রে দগ্ধ হইলে নারিকেলের জল যেমন স্নিগ্ধ, সংসারের দুঃখতাপে মায়ের স্নেহ, স্ত্রীর প্রণয ও কন্যার ভক্তি তেমন জীবন জুড়াইযা দেয। ঝুনা নারিকেলের জল একটু ঝাল হয়—স্ত্রীলোক প্রবীণা হইলে তাহার প্রকৃতিও কিছুটা ঝাল হয়। নারিকেলের শাঁসের মতোই স্ত্রীলোকের বুদ্ধি অল্প বয়সে বিশেষ থাকে না, যৌবনে মধুর কিন্তু প্রবীণ অবস্থায় কঠিন—তখন ইহা গৃহিণীপনা নামে অভিহিত হয়। পরিণতবুদ্ধি রমণীকে ভুলাইয়া কিছু আদায় করা দুঃসাধ্য। নারিকেলের মালা আধখানাই দেখা যায়—কমলাকান্ত স্ত্রীলোকের বিদ্যা আধখানা বলেন; তাঁহার মতে নারিকেলের মালার মতোই স্ত্রীলোকের বিদ্যা বিশেষ

কাজে লাগে না। নারিকেলের ছোবড়াতে যে দড়ি তৈয়ারি হয তাহাতে বড়ো বড়ো জাহাজ বাঁধা হয বা রথ টানা হয়, নারীর রূপও তেমনই অনেককে বাঁধিয়া রাখে বা আকর্ষণ করে। লোকে নারিকেলের দড়ি গলায দেয না বটে, কিন্তু নারীর রূপে অনেকে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

কমলাকান্ত গাছের নারিকেল বা সংসারের নারিকেল কোনোটিই আহরণ করিতে পারেন নাই বলিযা ক্ষোভ প্রকাশ করিযাছেন। কারণ নারিকেল পাড়িতে হইলে অপরের খোসামোদ করিতে হইবে। নিজেও নারিকেল পাড়িতে চেষ্টা করিতে পারেন কিন্তু নারিকেল ঘাড়ে করিবার শক্তি তাঁহার নাই।

দেশহিতৈষী নামে যাঁহারা খ্যাত, কমলাকান্ত তাঁহাদের শিমুল ফুল বলিযা মনে করেন। শিমুল ফুলের মতোই তাঁহাদের বাহিরের শোভা আছে, কিন্তু ভিতরে কোনো গুণ নাই। শিমুল ফুল হইতে ফল হইলে তাহাতেও শস্যের আশা নাই— তুলা মাত্র সার; দেশহিতৈষীরা পরিপক্ক হইলে বক্তৃতায সারা দেশ ভরিযা দেন এই মাত্র।

কমলাকান্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের ধুতুরা ফুল জ্ঞান করেন। ধুতুরার অপর কোনো গুণ নাই, কেবল ইহা মাদকতা আনে এই মাত্র। প্রবন্ধাদি নেশার জিনিসে অধ্যাপকদের দুই চারিটি বচন জুড়িযা দিলে তাহার মাদকতা বাড়িয়া যায। এই বচনযুক্ত প্রবন্ধাদি বাংলাদেশ মাতাইয়া তুলিযাছে।

কমলাকান্তের মতে বাংলার লেখকরা তেঁতুলের সঙ্গে তুলনীয। তেঁতুল যাহা কিছু স্পর্শ করে তাহাকেই অম্লরসাত্মক করিযা তোলে। যে তেঁতুল খায সে অজীর্ণ রোগে ভোগে—যাহারা খাদ্যকে সাহেবি করিযা লইযাছে তাহারা তেঁতুল খাইবার দায এড়াইযাছে।

কমলাকান্ত দেশী হাকিমদের কুষ্মাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। ইঁহাদের উচ্চ পদে তুলিযা দিলে ইঁহারা উচ্চপদাধিষ্ঠিত হন—তাহা না হইলে ইঁহারা মাটিতে গড়াগড়ি যান। এই সব কুমড়ার রূপ বা গুণ বিশেষ নাই। দেশী ও বিলাতী কুমড়ার মতোই হাকিমেরও দেশী বিলাতী ভেদ আছে।

পরিশেষে কমলাকান্ত নিজেকে সংসারোদ্যানের সকল ফলের চেযে নিকৃষ্ট বলিয়াছেন।

পাঠপ্রসঙ্গে—মাত্রা চড়াইলে—কমলাকান্ত যখনই উদ্ভট কোনো কল্পনার আশ্রয় লইযাছেন, তখনই আফিমের মাত্রা বেশি চড়াইবার কথা বলিয়াছেন। কমলাকান্ত যাহা দেখিযাছেন বা বলিয়াছেন, তাহা সত্য—কিন্তু তাহা যেন সাদা

চোখে দেখিবার বা বলিবার মতো নয়। অসাধারণ কিছু বর্ণনা করিবার জন্য সাধারণ অবস্থা অতিক্রম করা চাই।

সকলগুলি পাকিতে পায় না—এখানে রোগে বা অন্য কারণে অকালমৃত্যুর প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

দেবসেবায় বা ব্রাহ্মণভোজনে লাগে—আপাতদৃষ্টিতে কৌতুককর বলিযা মনে হইলেও লেখক বাস্তবিকপক্ষে সৎকার্যে জীবন উৎসর্গের কথা বলিতে চাহিয়াছেন।

শৃগালে খায়—অর্থাৎ তাহাদের জীবন ব্যর্থ হইয়া যায়।

কতকগুলি তিক্ত ইত্যাদি—কমলাকান্ত এখানে মানুষের প্রকৃতি ও গুণাগুণের বৈচিত্র্যের কথা বলিতেছেন।

কাঁটাল বলিয়া বোধ হয়—বড়ো মানুষেরা অর্থে বড়ো; কাঁটালও আকারে বড়ো।

কতকগুলি বড় আটা ইত্যাদি—যাহারা ধনী হইলেও মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করেন না, লেখক তাহাদের প্রতি কটাক্ষ করিযাছেন।

ইঁচড়েই থাকে ইত্যাদি—অনেকে বড়োলোকের সন্তান হইলেও নিজেরা বিশেষ অর্থ উপার্জন করিতে পারে না। কেহ কেহ কুসঙ্গে পড়িযা বা বিষযবুদ্ধির অভাবে সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলে।

শৃগালেরা কেহ বা দেওয়ান ইত্যাদি—ধনীকে শোষণ করিবার জন্য তাহার কর্মচারীরা সর্বদাই উৎসুক হইয়া থাকে। অনেকেই তাহার ধনের কিছুটা আত্মসাৎ করিবার সুযোগ পাইলে ছাড়ে না।

রসের প্রত্যাশা—কিছু পরিমাণ অর্থসাহায্য। শৃগাল ও মাছি এই দুইটি ভেদ করিয়া শোষক ও প্রসাদাথা এই দুই শ্রেণী স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হইযাছে।

পচিয়া দুর্গন্ধ হইয়া উঠে—সম্ভবত এই ছত্রটির গূঢ়ার্থ নাই; তবে কেবল ধন-সঞ্চয় কল্যাণকর নয় এইরূপ একটা অর্থ করা যাইতেও পারে।

আমার বিবেচনায় ইত্যাদি—ইহা কমলাকান্তের রসিকতামাত্র।

এ দেশে আম ছিল না—কেহ কেহ অনুমান করেন যে, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে ভারতে আম আসে। তবে প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যেও আম্রের উল্লেখ আছে।

দেখিতে রাঙ্গা রাঙ্গা—বাহ্য রূপ ও আড়ম্বরকে কটাক্ষ করা হইয়াছে।

কাঁচায় বড় টক ইত্যাদি—ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের আচরণের মধ্যে যে উগ্রতা আছে তাহাকে বঙ্কিমচন্দ্র টক বলিয়াছেন। এদেশে অনেককাল থাকিবার পর তাহাদের উগ্রতা কতকটা কমিয়া যায় বটে, কিন্তু একেবারে চলিয়া যায় না।

ফাঁকি দিয়া পঁচিশ টাকা শ' বিক্রয় হইয়া যায়—অনেক ব্রিটিশ রাজকর্মচারী

বাস্তবিকপক্ষে অকর্মণ্য, কিন্তু বাহ্য আড়ম্বরের জন্য উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়া প্রচুর মাহিনা পাইয়া থাকে। তাহাদের যোগ্যতার তুলনায় তাহারা অধিকতর প্রতিপত্তি লাভ করে।

কাঁচা মিঠে আম—পাকিলে পানশে—কোনো কোনো ব্রিটিশ রাজকর্মচারী প্রথম এদেশে আসিবার সময় সহৃদয় আচরণ করে, কিন্তু পরে তাহাদের আচরণে সহৃদযতা বা সৌজন্য থাকে না।

আমসী করাই ভাল—কৌতুকই এই অংশটির লক্ষ্য।

কিযৎক্ষণ সেলাম জলে ইত্যাদি—ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের তোষামোদ-লুব্ধতার প্রতি কটাক্ষ বঙ্কিমচন্দ্র অন্যত্রও করিযাছেন। 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' বা 'লোক-রহস্যে'র কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পাবে।

কলাগাছের সহিত তুলনা—কলাবৌযেব দৃষ্টান্তে লজ্জাশীলতার দিক হইতে স্ত্রী-জাতিকে কলাগাছের সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে।

গেছো কথা—বাঁদুরে কথা ; মূর্খেব উক্তি।

উভযেই বানরের প্রিয—যাহারা নারীর রূপলুব্ধ, কমলাকান্ত তাহাদের বানরের সদৃশ জ্ঞান করিযাছেন।

মাকাল ফলকেই ইত্যাদি—কেহ কেহ নারীজাতিকে গুণহীন ও রূপমাত্র সার বলিযা দেখিতে সুদৃশ্য অথচ অখাদ্য মাকাল ফলের সহিত তুলনা করেন।

কাঁদি কাঁদি পাড়ে না—অর্থাৎ বহু বিবাহ করে না।

ব্যবসাযী নহিলে—নারিকেল-ব্যবসাযী একসঙ্গে কাঁদি কাঁদি নারিকেল পাড়ে। যে সকল কুলীন ব্রাহ্মণ বহু বিবাহ করে কমলাকান্ত তাহাদের বিবাহ-ব্যবসায়ী বলিযা অভিহিত করিয়াছেন।

করকচি বেলা—প্রথম অবস্থা, যখন শাঁস হয নাই। এই সময় নারিকেলের জল স্বাদু ও শরীরের পক্ষে বিশেষ স্নিগ্ধকর।

ডাবই ভাল—বঙ্কিমচন্দ্র যৌবনকেই শ্রেষ্ঠ কাল বলিযা নির্দেশ করিযাছেন। যৌবনে সৌন্দর্য বিকশিত হয বলিয়াই যে তিনি নারীর পক্ষে ইহাকে শ্রেষ্ঠ সময় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন তাহা নয, যৌবনে মানুষের সকল বৃত্তি স্ফূর্তিলাভ করে বলিযাই তিনি যৌবনের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিযাছেন। বাস্তবিকপক্ষে তাঁহার উপন্যাসগুলিতে যুবকযুবতীর চিত্রই সমধিক পরিমাণে ফুটিয়াছে—চন্দ্রশেখর বা সত্যানন্দ প্রভৃতি দুই একটি ব্যতীত অপর বিশেষ বিগতযৌবন চরিত্র তাঁহার শিল্প-

নিপুণতার পরিচয় দেয় না। মনের দিক দিয়া প্রবীণ হইলেও বঙ্কিমচন্দ্র প্রাণের দিক দিয়া যৌবনেরই উপাসক ছিলেন।

বড় তপ্ত—নবোদ্ভিন্নযৌবনা নারীর মধ্যে যে তেজ থাকে তাহা শিক্ষার গুণে সংহত না হইলে অনিষ্ট সাধন করিতে পারে। বস্তুতঃ, যৌবনের মধ্যেই একটা প্রবল আবেগ আছে। এই আবেগ সংযত না করিলে ক্ষতিসাধন করিতে পারে।

কলিজা পুড়িয়া যাইবে—সংসারের শিক্ষা বা বোধ না থাকিলে নারীর প্রেম অনেক সময় পুরুষের জীবনে দুঃখ বহন করিয়া আনে। সংসার-শিক্ষাশূন্যা নারীর প্রেম যে পুরুষের হৃদয়কে কীভাবে দগ্ধ করে তাহা বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে কুন্দনন্দিনী ও নগেন্দ্রনাথের মধ্য দিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।—বঙ্কিমচন্দ্র সংসারে প্রবেশ করিবার পূর্বে নারীর উপযুক্ত শিক্ষা প্রয়োজন এই মত দৃঢভাবে পোষণ করিতেন। প্রফুল্ল 'দেবী চৌধুরাণী' হইবার জন্য কঠোর শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল। সংসার-জীবনে প্রবেশ করিতে হইলেও নারীকে যথোপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

উভয়ই বড় স্নিগ্ধকর—নারীর প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের এই মনোভাব অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের। মাতা, পত্নী বা কন্যারূপে নারীর স্নেহ, প্রেম ইত্যাদির চিত্র বা গৌরব বর্ণনা আমরা পূর্বতন সাহিত্যে পাই বটে, কিন্তু নারীর হৃদয় যে কীভাবে পুরুষের জীবনকে স্নিগ্ধ ছায়ায় আবৃত করিয়া রাখে সে সম্বন্ধে কোনো সচেতন ধারণা আমরা এই সময় পাই না। উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিবার পর হইতে বাংলাদেশে যে মধ্যবিত্ত সমাজের উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে নারীর মূল্য বিশেষভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম জীবনের সাহিত্যগুরু কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নারী-বিদ্বেষ এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে।—পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে গভীরতর অধ্যয়নের ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের চেতনায় নারী সম্পর্কীয় বোধটি পরিপুষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার উপন্যাসগুলিতেও নারীচরিত্র বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

ভাবের বেলায় বড় সুমিষ্ট বড় কোমল—বঙ্কিমচন্দ্র যুবতীর বুদ্ধিকে অস্বীকার করেন নাই, অথচ তাহা যে পরিণত এমন কথা বলেন নাই।

অজীর্ণ রোগে রাত্রে নিদ্রা হয় না—টাকা ফেরত দিবার দুশ্চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে গৃহিণীর গঞ্জনায় নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটার ইঙ্গিত আছে বলিয়া মনে হয়।

আধখানা বৈ পুরা দেখিতে পাইলাম না—বঙ্কিমচন্দ্র যখন এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তখন পাশ্চাত্ত্য দেশে সবে স্ত্রী শিক্ষার প্রসার হইতেছে। স্ত্রীলোকের

বিদ্যা তখনও পরিণতি লাভ করিবার সুযোগ লাভ করে নাই। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগ না করা হইলে শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হয় না।

দুই মালার মাপে—বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবত বলিতে চাহিয়াছেন যে, এই রচনাগুলিতে বিশেষভাবে স্ত্রীলোকের বিদ্যা ব্যক্ত হয় নাই। স্ত্রীলোক পুরুষের মতো ধরণে রচনা করিয়াছেন।

দুই বড় অসার—কমলাকান্ত নারীর স্নেহকেই সবচেয়ে বেশি মর্যাদা দিয়াছেন। তাহার পর বুদ্ধির স্থান। স্ত্রীজাতির বিদ্যাকে তিনি বিশেষ মূল্য দেন নাই—নারীর রূপকে তিনি অসার এবং ক্ষতিকর বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন।

অনেক নরহত্যা নিবারণ হইবে—নারীর রূপে লুব্ধ হইয়া অনেকে অনেক দুষ্কার্য করিয়াছে। প্রণয়ে হতাশ হইয়াও অনেকে মৃত্যুবরণ করিয়াছে। সুতরাং নারীর রূপের যদি আকর্ষণী শক্তি না থাকে তাহা হইলে অনেক প্রাণ বাঁচিয়া যাইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সবগুলি উপন্যাসের মধ্যেই নারীর রূপই অনর্থ ঘটাইয়াছে।

বিশ্বেশ্বরকে দিবেন—দেবতাকে বিশেষভাবে যে ফল উৎসর্গ করা যায়, তাহা আর ভোগ করা হয় না। কমলাকান্ত নারিকেল ফল শিবকে নিবেদন করিয়াছেন, তিনি নিজে আর এই ফল গ্রহণ করিবেন না।

শিমুল ফুল ভাবি—দেশহিতৈষীর ভড়ং করিয়া অনেকে বড়ো বড়ো কথা বলিত। বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে দেশাত্মবোধ পূর্ণভাবে জাগ্রত হয় নাই। সুতরাং অনেকেই দেশহিতৈষণার নাম করিয়া আত্ম প্রচারণাই করিত। বঙ্কিমচন্দ্র এই সব বাক্‌সর্বস্ব দেশহিতৈষীদের বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখেন নাই।

নেড়া গাছে—সম্ভবত বাংলাদেশের দুরবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

খানিক তুলা বাহির হইয়া ইত্যাদি—দেশহিতৈষীরা যখন কোনো কাজে হাত দেন তখনও গুরুত্বহীন কথার স্তূপ ছাড়া আর কিছুই সৃষ্টি করিতে পারেন না।

বড় বড় বচনে—স্মৃতির বিধান সম্পর্কীয় উক্তিগুলিই এখানে কমলাকান্তের লক্ষ্য। স্মৃতির অনেক অংশই যে সমাজ-জীবনের আকৃতি ও প্রকৃতির পরিবর্তনের ফলে কালবারিত হইয়া গিয়াছে বঙ্কিমচন্দ্র তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ভট্টপল্লীর এক প্রান্তে জন্মগ্রহণ করিলেও তিনি স্মৃতিশাস্ত্রকে বিশেষ মূল্য দেন নাই। পাশ্চাত্ত্য সমাজবিধি ও আইনের জ্ঞানও স্মৃতিশাস্ত্রের প্রতি উপেক্ষার কারণ হইতে পারে। যুগের উপযোগী হইয়া না ওঠার জন্য বহু শত বৎসরের পুরাতন শাস্ত্র যে কণ্টকময় ধুতুরার ফল প্রসব করিবে তাহাতে বিচিত্র কি।

প্রবন্ধ-গাঁজার মধ্যে ইত্যাদি—প্রবন্ধের মধ্যে শোভা বৃদ্ধির জন্য সংস্কৃত শ্লোকাদি উদ্ধারের রীতিকে বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ সুনজরে দেখেন নাই। অকারণ উদ্ধৃতি প্রবন্ধের মধ্যে বাগ্‌জাল বিস্তারে অযথা আড়ম্বর সৃষ্টি করে এই মাত্র।

আমাদের দেশে লেখকদিগকে ইত্যাদি—অনেক লেখক অক্ষমতাবশত যে বিষয় লইয়া প্রবন্ধ রচনা করে তাহাকেই বিকৃত করিয়া ফেলে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে শিব গড়িতে বানর তৈরি করার দৃষ্টান্তগুলি সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের কঠোর নিন্দার ভাগী হইয়াছে।

যাঁহারা সাহেব হইয়াছেন ইত্যাদি—বিশুদ্ধ কৌতুকের নিদর্শন।

ইহারা পৃথিবীর কুষ্মাণ্ড—বঙ্কিমচন্দ্র নিজে হাকিম ছিলেন, কার্যোপলক্ষ্যে তাঁহাকে দেশী হাকিমের সংস্পর্শে আসিতে হইয়াছিল। আপনার অভিজ্ঞতা হইতেই হাকিম সম্পর্কে তিনি এই বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

বিলাতী কুমড়া—যাহারা এ দেশীয় হইয়াও আঠারো আনা সাহেবী ভাবাপন্ন, কমলাকান্ত তাহাদের বিলাতী কুমড়া বলিয়াছেন।

সর্ব্বাপেক্ষা অকর্ম্মণ্য কদর্য্য টক—কমলাকান্ত নিজেকেও বাদ দেন নাই। নিজেকে টক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

তৃতীয় সংখ্যা

ইউটিলিটি বা উদরদর্শন

পরিচয়—উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা এদেশে প্রচলিত হয়, পাশ্চাত্ত্য দর্শন তাহার মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছিল। বস্তুত, ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগে সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শন এই তিনটি জিনিসই সবচেয়ে বেশি প্রসারলাভ করিয়াছিল—এই তিনটি বিষয়ের মধ্য দিয়াই পাশ্চাত্ত্য জগতের চিন্তার সহিত আমাদের পরিচয় ঘটিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের মধ্যে কোমৎ, স্পেন্সার প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে বেন্থাম ও মিলও বঙ্কিমচন্দ্রের আগ্রহ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। 'গরিষ্ঠসংখ্যক লোকের জন্য মহত্তম মঙ্গল'—ইহাই বেন্থাম প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য হিতবাদীদের মূল নীতি। বঙ্কিমচন্দ্র এই আদর্শে পুরাপুরি বিশ্বাসী না হইলেও ইহার উপর যে তাঁহার কিছুটা আস্থা ছিল 'ধর্ম্মতত্ত্ব' প্রথম খণ্ডের দ্বাবিংশতি-

তম অধ্যায়ে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাকে তিনি ধর্মের একটি ক্ষুদ্র অংশ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অবশ্য এই রচনাটিতে বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্ত্য হিতবাদ দর্শনের অনুসরণ করেন নাই। পাশ্চাত্ত্য হিতবাদ দর্শনের কথা স্মরণ মাত্র করিয়া একটি উদ্ভট দর্শন কল্পনা করিয়া তাহার নাম দিয়াছেন উদরদর্শন। তাঁহার এই দর্শনটি তিনি সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের রীতিতে প্রথমে সূত্র দিয়া তাহার পর ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। বস্তুত, এই ভাষ্য কৌতুকরসকেই প্রশ্রয় দিয়াছে।

রচনাটির প্রারম্ভে কমলাকান্ত বেন্থামের হিতবাদের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি নিজেও একজন দার্শনিক এবং হিতবাদ দর্শন অবলম্বন করিয়া নূতন একটি দর্শনশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের অনুসরণে সূত্র এবং ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন এবং নিজে সংস্কৃতজ্ঞ হইলেও বঙ্গভাষাভাষীদের বুঝিবার সুবিধার জন্য বাংলা ভাষাতেই রচনা করিয়াছেন।

কমলাকান্ত উদরদর্শনে সাতটি সূত্র রচনা করিয়াছেন। প্রথম সূত্রে তিনি জীবশরীরস্থ বৃহৎ গহ্বরবিশেষকে উদর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ভাষ্যে নাক কান বা পর্বতগুহাদিকে উদর আখ্যাদানের প্রতিষেধ করিয়াছেন এবং কোনো কোনো স্থানে অঞ্জলিও বুঝায় তাহা জানাইয়াছেন। দ্বিতীয় সূত্রে কমলাকান্ত উদরের ত্রিবিধ পূর্তিই পরমার্থ বলিয়া তৃতীয় সূত্রে আধিভৌতিক পূর্তিকেই বিহিত বলিয়াছেন। দ্বিতীয় সূত্রের ভাষ্যে তিনি আহারকে আধিভৌতিক পূর্তি, ধনীর বাক্যে প্রত্যাশাকে আধ্যাত্মিক পূর্তি এবং প্লীহা-যকৃৎ প্রভৃতির বৃদ্ধিকে আধিদৈবিক পূর্তি বলিয়াছেন।

চতুর্থ সূত্রে বিদ্যা, বুদ্ধি, পরিশ্রম, উপাসনা, বল ও প্রতারণা এই ছয়টিকে পূর্বপণ্ডিতদের মতে পুরুষার্থের উপায় বলিয়া উল্লেখ করিয়া পঞ্চম সূত্রে এই উপায়গুলি দিয়া যে পুরুষার্থ সাধন অসাধ্য তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। চতুর্থ সূত্রের ভাষ্যে তিনি উপায় ছয়টির অভিনব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কমলাকান্তের মতে বিদ্যা বাংলার স্বতঃসিদ্ধ, বুদ্ধি সকলের মধ্যেই পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে, আহার-নিদ্রাদিই পরিশ্রম, গুণীর গুণকীর্তন উপাসনা, হাঁক-ডাক ও অঙ্গভঙ্গি বল এবং বিক্রয় চিকিৎসা ও ধর্মোপদেশই প্রতারণা। পঞ্চম সূত্রের ভাষ্যে তিনি এই কয়টি দিয়া যে উদরপূর্তি অসম্ভব একে একে তাহার উদাহরণ দিয়াছেন।

কমলাকান্ত ষষ্ঠ সূত্রে হিতসাধনকেই পুরুষার্থের একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়া সপ্তম সূত্রে সকলকে দেশের হিতসাধন করিতে নির্দেশ দিয়া তাঁহার দর্শনের সহিত হিতবাদ দর্শনের ঐক্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। ষষ্ঠ সূত্রের ভাষ্যে তিনি হিতসাধনের অভিনব দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

পাঠ প্রসঙ্গে—ইউটিলিটি—এই শব্দটির সম্ভাব্য অর্থ করিয়া ভীষ্মদেব খোশনবীশ যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা উপভোগ্য হইযাছে। কমলাকান্তকে 'দুর্বৃত্ত দশানন লম্বোদর গজানন' বলিয়া অভিহিত করাও কৌতুকাবহ।

বাঙ্গালায় প্রচলিত—কমলাকান্ত এখানে বাংলাদেশের কথাই বলিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার দর্শনের ভাষ্য বা ব্যাখ্যা করিবার সময় তিনি বাংলাদেশ হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিযাছেন। বাংলাদেশে হিতবাদ দর্শনের ব্যবহারিক প্রযোগ প্রচলিত—কমলাকান্ত তাহাতে একটা শাস্ত্রানুগত রূপ দান করিয়াছেন এই মাত্র।

আমি যে অসংস্কৃতজ্ঞ ইত্যাদি—উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলাদেশে সংস্কৃতশাস্ত্রে জ্ঞানই পাণ্ডিত্যের একমাত্র নিদর্শন ছিল। কমলাকান্ত বাংলায দর্শন রচনা করিয়াছেন বলিযা পাছে লোকে তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষায অনভিজ্ঞ বলে এই জন্য তিনি প্রথমেই বলিযা রাখিযাছেন যে, তিনি সংস্কৃত ভাষা জানেন।

ভারতবর্ষে, বিশেষ করিযা বাংলাদেশে তর্কবিদ্যার বিশেষ প্রসার হইযাছিল। মধ্যযুগের সংস্কৃত পণ্ডিতদের মধ্যে যাঁহারা ভাষ্য গ্রন্থ বা টীকা রচনা করিযাছেন তাঁহারা প্রতিপদেই প্রযোজনে-অপ্রয়োজনে এক-একটি শব্দ লইযা কূট তর্কের অবতারণা করিতেন। এখানে কমলাকান্ত কৌতুক করিযা ভাষ্য রচনার ঐ উক্তিটি গ্রহণ করিয়াছেন। উদরের সংজ্ঞা নির্দেশ এবং নাক, কান বা পর্বতের গুহাকে উদর বলিয়া ভুল করিবার কল্পনা দর্শনশাস্ত্রের রীতিতে অভিজ্ঞ-অনভিজ্ঞ উভয়েরই কাছে কৌতুকাবহ বলিয়া মনে হইবে।

অঞ্জলি পুরাইতে হয়—কমলাকান্তের উদ্ভাবনী শক্তি প্রশংসনীয।

সাংখ্যেরও এই মত—সাংখ্য আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তিন প্রকার দুঃখের কথা বলিয়া ত্রিবিধ দুঃখের সম্পূর্ণ বিরতি হইলেই পরমপুরুষার্থ অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হয় এই তত্ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছে। কমলাকান্তের উদর-দর্শনে অবশ্য উদরের ত্রিবিধ পূর্তিকেই পরমপুরুষার্থ বলিযা নির্দেশ দেওয়া হইযাছে।

আধ্যাত্মিক উদর পূর্ত্তি হয়—বড়োলোকদের আশাপ্রদ বাক্য শুনিলে মনে যে আশার সঞ্চার হয় তাহাতে মন কতকটা শান্ত হয় বটে, কিন্তু বাস্তবে কোনো লাভ হয় না। কমলাকান্ত ইহাকে আধ্যাত্মিক উদরপূর্তি বলিয়া কৌতুক করিয়াছেন।

বিদ্যা বাঙ্গালার স্বতঃসিদ্ধ—অনেকে বিশেষ কিছু পড়াশোনা না করিয়াই নিজেকে শিক্ষিত বলিয়া মনে করে। বিশেষ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে যখন শিক্ষার প্রসার সীমাবদ্ধ ছিল তখন অনেকে যৎসামান্য শিক্ষালাভ করিয়াই নিজেদের সুপণ্ডিত বলিয়া প্রচার করিত। কমলাকান্তের মুখ দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সেই পণ্ডিতম্মন্য

স্বল্পবিদ্যার অধিকারীদের আক্রমণ করিয়াছেন। অশিক্ষিত ধনীর পাণ্ডিত্যের বড়াইয়ের প্রতি কটাক্ষ তাঁহার অন্য রচনাতেও আছে।

যে আশ্চর্য্য শক্তি দ্বারা ইত্যাদি—বুদ্ধির সংজ্ঞাটি অভিনব ও বিশেষ কৌতুকজনক হইয়াছে। অপরকে বুদ্ধিহীন এবং নিজেকে বুদ্ধিমান বলিয়া মনে করিবার যে ধারণা সকলেরই আছে কমলাকান্ত তাহা লইয়া মৃদু কৌতুক করিয়াছেন।

উপযুক্ত সময়ে ঈষদুষ্ণ ইত্যাদি—লেখক সুকৌশলে সাধারণ গৃহস্থ বাঙালীর সুখলালিত জীবনকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন। অবস্থাপন্ন বাঙালীদের মধ্যে অনেকেই কমলাকান্ত কথিত পরিশ্রম ছাড়া আর কিছুই করিত না বা এখনও কেহ কেহ করে না।

কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে কোন কথা ইত্যাদি—গুণহীন ও গুণবানের দোষ বা গুণ কীর্তনের সংজ্ঞাগুলি মনোজ্ঞ হইয়াছে।

বল—কমলাকান্ত বলের যে কয়টি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহা বিশেষ করিয়া সাধারণ বাঙালীর কথাই মনে করাইয়া দেয়। বাঙালীর বল কেবল মুখে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। সে হস্তপদ ব্যবহার করিলে কিল, চড় বা লাথি দেখানো ছাড়া আর কিছুই বিশেষ করে না। উত্তেজিত হইলে তাহার মুখে হিন্দী ও ইংরেজী ভাষা বাহির হওয়ার দৃষ্টান্ত এ যুগেও ভুরি ভুরি দেখা যায়। পলায়নকে বলরূপে কল্পনা কৌতুকাবহ। ষড়বিধ বলের মধ্যে রোদন, প্রহার-সহিষ্ণুতা ও দ্বেষ-হিংসা প্রভৃতি 'অহিংসা' বল প্রয়োগের কল্পনাও কমলাকান্তের রসিকতার নিদর্শন।

প্রতারণা—দোকানদার যে ঠকাইতেছে এবং চিকিৎসক যে অনর্থক ফাঁকি দিয়া টাকা লইতেছে এই ধারণা সর্বজনীন বলা যায়। বাস্তবিকপক্ষে যাহাতে অপরে না ঠকায় বরং পারিলে অপরকে ফাঁকি দিয়া নিজে লাভবান হই—এই চিন্তাটি সাধারণ মানুষের অনেকের মধ্যেই দেখা যাইবে। ধর্মোপদেষ্টা বা ধার্মিককে ভণ্ড বলিয়া লেখক সাধারণ লোকের ধারণার হীনতার প্রতিই ইঙ্গিত করিতেছেন। ধার্মিক যে বিনা কারণে এবং প্রতিদানের প্রত্যাশা না করিয়া অপরকে উপদেশ দিতে পারে হিসাবী লোকের কাছে তাহা চিন্তার অগোচর—সুতরাং সে ধর্মোপদেষ্টাকে প্রতারক বলিয়া সন্দেহ করে।

বিদ্যাতে যদি ইত্যাদি—বাংলাদেশের সংবাদপত্রের অবস্থা বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে বিশেষ উন্নত না হইলেও এখানে তিনি অল্প শিক্ষিত সম্পাদকদের পত্রিকাগুলিকে কটাক্ষ করিয়া এই উক্তি করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

মন্দ পে-বিল লিখি নাই—নাগা ফকিররা সাহেবের কাছে ভিক্ষা চাহিতেছে এই

ছবি আঁকিয়া পে-বিল তৈয়ার করায় কমলাকান্ত যথার্থ গুণবান সাহেবের গুণ প্রকাশ করিয়া উপাসনাই করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সাহেবের পছন্দ না হওয়ায় কমলাকান্ত ক্ষুব্ধ।

হিতসাধনের দ্বারা সাধ্য—এই সূত্রটির ভাষ্যে কমলাকান্ত পরের মঙ্গল সাধনের নামে যাহারা আপনাদের হিতসাধন করে তাহাদের আক্রমণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা যজমানের মঙ্গলের জন্য মন্ত্র দিয়া বা পূজাদি করিয়া নিজেদের উদর পূরণ করেন। ইউরোপীয় জাতিরা অসভ্যদের উন্নয়নের নাম করিয়া নিজেদের অধিকার বিস্তার করেন। লেখকেরা পরের জ্ঞান বা আনন্দের জন্য পাঠযোগ্য বা অপাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করিয়া অর্থবান হইতেছেন। পরের হিতসাধন উপলক্ষ্য মাত্র, নিজের উদরপূর্তিই লক্ষ্য।

সপ্তম দর্শন—সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায, বৈশেষিক, পূর্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা এই ছয়টি প্রধান দর্শন।

চতুর্থ সংখ্যা

পতঙ্গ

পরিচয়—কমলাকান্তের দপ্তরের কয়েকটি রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কতক পরিমাণে খেয়ালী কল্পনার আশ্রয় লইয়া অভিনব বিষয় সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু খেয়ালী কল্পনার মধ্যেও একটা দিব্য দৃষ্টি আছে। আপাততঃ যাহাকে নিরতিশয় লঘু বলিয়া মনে হয় তাহার অন্তরালে গভীর সত্য লুকাইয়া আছে। একটু অনুধাবন করিলেই দেখা যায় যে, বঙ্কিমের সৃজনী কল্পনাই রচনাটির মূলে রহিয়াছে—খেয়ালী কল্পনা সৃজন ব্যাপারে সহায়তা করিতেছে এই মাত্র। বাহিরের কল্পনা অন্তর্লীন সত্যে উপনীত হইবার একটা পথ মাত্র।

এই রচনাটিতে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বক্তব্য বিষয়টিকে পরিস্ফুট করিবার জন্য একটি প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। পতঙ্গ সেই প্রতীক। পতঙ্গ আলো দেখিলেই তাহার দিকে ছুটিয়া যায়। আগুনের সংস্পর্শে আসিবামাত্রই তাহাকে মরিতে হয়। কিন্তু তবুও সে আগুনে ঝাঁপ দিতে দ্বিধাবোধ করে না। মানুষও এইরূপ পতঙ্গ—সেও কেনো-না-কোনো আগুনে ঝাঁপ দিবার জন্য নিয়ত উৎসুক। জ্ঞান, ধন, মান, রূপ, ধর্ম, ইন্দ্রিয়—আগুনের নানাপ্রকার ভেদ আছে। যে যে

আগুনের অনুরাগী সে সেই আগুনে ঝাঁপ দিতে যায়। পৃথিবীর কোনো-না-কোনো বিষয়ের জন্য যে মানবের মনে সুতীব্র স্পৃহা জাগিয়াছে সে তাহাকে লাভ করিবার জন্য মৃত্যুবরণ করিতেও দ্বিধাবোধ করে না।

অন্য কয়েকটি রচনার মতো কমলাকান্ত এখানেও নসীরামবাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া দলাদলিতে চটিয়া গিয়া আফিঙের মাত্রা চড়াইয়া দিয়াছেন। ঝিমাইতে ঝিমাইতে তিনি দেখিয়াছেন যে, একটি কাচ দিয়া ঘেরা আলোর চারিদিকে একটা পতঙ্গ সোঁ-ও-ও বোঁ-ও-ও করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কমলাকান্ত দিব্য কর্ণ লাভ করিয়া শুনিলেন যে, পতঙ্গটি আলোর সঙ্গে কথা কহিতেছে। সে বলিতেছে যে, সে পূর্বে প্রদীপে পুড়িয়া মরিতে পারিত—এখন কাচের আবরণের জন্য পুড়িয়া মরিতে পায় না। হিন্দুর মেয়েদের সহমরণ বন্ধ হইয়াছে—তাহাদের সাধ আশা ফুরাইলে সহমরণে যাইত ; কিন্তু সে নিছক পুড়িবার জন্যই পুড়িয়া মরে, আর কিছুই চাহে না। পুড়িয়া মরা ছাড়া আর কোনো প্রয়োজন যে তাহার শরীরে থাকিতে পারে তাহা সে বুঝিতে পারে না। এই পৃথিবীর সবকিছুই পুরাতন, সুতরাং বৈচিত্র্যহীন ও বিস্বাদ। সুতরাং সে পুড়িতে চাহে। বহ্নির কাজ যেমন পোড়ানো, তাহার কাজ তেমনই পুড়িয়া মরা। কাচ কেবল তাহার আকাঙ্ক্ষাকে বাধা দিতেছে। আগুন কি তাহা পতঙ্গের জানা নাই—সে কেবল আগুনকে তাহার একান্ত কাম্য বলিয়া জানে—সে তাহাকে ছাড়িতে পারিবে না।

কমলাকান্ত ঝিমাইতে ঝিমাইতে নসীবাবুর ডাকে চমকিয়া উঠিয়া তাঁহার দিকে চাহিতেই তাঁহার মনে হইল যে, মানুষমাত্রেই পতঙ্গ—তাহারাও আগুনে পুড়িয়া মরিতে চায়—কেহ মরে, কেহ কাচে বাধা পাইয়া ফিরিয়া আসে। জ্ঞান, ধন, মান, রূপ, ধর্ম, ইন্দ্রিয়—সবই অগ্নিস্বরূপ। এই সংসার কাচময়। সেইজন্য আগুনে ঝাঁপ দিতে গিয়া সকলে ফিরিয়া আসে। এই আবরণ না থাকিলে সংসার থাকিত না। সকল ধর্মান্বেষী চৈতন্যদেবের মতো ধর্ম উপলব্ধি করিলে কয়জন বাঁচিত। জ্ঞান অনেক সময় আবরণের কাজ করে—কিন্তু সক্রেতিস, গেলিলিও তাহাতে পুড়িয়া মরিয়াছেন। বহ্নিতে মনুষ্যদহনের বৃত্তান্তই কাব্য নামে অভিহিত হয়। মহাভারত মানবহ্নিতে দুর্যোধন-পতঙ্গ দাহের ইতিবৃত্ত। প্যারাডাইস লস্টে জ্ঞানবহ্নি, সেণ্টপলের গাথায় ধর্মবহ্নি, আণ্টনি-ক্লিওপেত্রায় ভোগবহ্নি, রোমিও-জুলিয়েতে রূপবহ্নি, ওথেলোতে ঈর্ষাবহ্নি, গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাসুন্দরে ইন্দ্রিয়বহ্নি জাজ্বল্যমান। এই বহ্নির স্বরূপ মানুষের জ্ঞানের অতীত। ঈশ্বর, ধর্ম, স্নেহ—কোনো কিছুর যথার্থ স্বরূপ মানুষ জানে না—তাহাদের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ানোই তাহার নিয়তি।

পাঠ প্রসঙ্গে—দলাদলিতে চটিষা—সামান্য বিষয় লইয়াও যে বাঙালী দলাদলি করে বঙ্কিমচন্দ্র সেই ইঙ্গিত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় কমলাকান্ত আফিমখোর ভালোমানুষ, দলাদলি তাঁহার বিশেষ পছন্দ নয়। সেইজন্য দলাদলির কথা শুনিয়া তিনি চটিয়াছেন।

অনাদি ক্রিয়া পরম্পরার একটি ফল—প্রত্যেক কার্যেরই একটা কারণ থাকে। কমলাকান্ত যে নসীরামবাবুর বৈঠকখানায় গিযাছেন তাহার একটি কারণ ছিল। আবার সেই কারণটিও শেষ কথা নয়! সেই কারণটি ঘটিবার অন্য কারণ আছে। এইভাবে কারণের পর কারণ অনুসন্ধান করিযা গেলে এই সামান্য কার্যটির মূলে অনাদি ক্রিয়া পরম্পরা দেখা যাইবে। এই সমস্ত ক্রিয়ার সমবেত ফলেই কমলাকান্ত নসীবাবুর বৈঠকখানায় গিয়া আফিমের মাত্রা চড়াইয়াছেন; সুতরাং ইহাই তাঁহার বিধিলিপি। এইজন্যই তিনি ইহার অন্যথা করিতে পারেন না বলিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এক্ষণে সাধারণ একটি ব্যাপারকে তর্কশাস্ত্রের যুক্তি-জাল দিয়া সমাচ্ছন্ন করিয়া অভিনব করিযা তুলিয়াছেন।

দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইলাম—অফিমের প্রসাদে কমলাকান্ত প্রায়ই দিব্য চক্ষু ও দিব্য কর্ণ লাভ করিয়াছেন।

আমাদের রাইট আছে—পাশ্চাত্ত্য দেশে সামাজিক বা রাজনৈতিক অধিকার লইযা যে ঘোষণা করা হয় বঙ্কিমচন্দ্র পতঙ্গের মুখে সেই অধিকারের দাবি বিন্যস্ত করিযাছেন। বহুকাল ধরিযা যাহা করা হইয়াছে তাহার উপর একটা অধিকার জন্মিয়া যায়। পতঙ্গ সেই অধিকারের কথা বলিতেছে। এইভাবে পুড়িয়া মরিবার অধিকার ঘোষণা অভিনব সন্দেহ নাই।

আমরা কি হিন্দুর মেয়ে ইত্যাদি—রামমোহনের প্রচেষ্টায আইন করিয়া সহমরণ প্রথা বন্ধ করিয়া দেওযা হইয়াছিল। হিন্দুর মেয়ে সহমরণে পুড়িয়া মরিতে পায় না; সেজন্য পতঙ্গও কি পুড়িয়া মরিতে পারিবে না? বঙ্কিমচন্দ্র মধ্যযুগের সতীদাহ প্রথার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। এই ছত্রে এবং পরের দুইটি অনুচ্ছেদে স্ত্রীজাতির তুলনায় পতঙ্গের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কৌতুকজনক।

স্ত্রীজাতিও রূপের শিখা ইত্যাদি—রূপে মুগ্ধ হইয়া স্ত্রীজাতি আত্মবিসর্জন দেয। নারী সম্পর্কে এই উক্তিটি বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পূর্ণ মত নয়। তাঁহার উপন্যাসে রূপানুরাগের স্থান থাকিলেও তিনি নারীর প্রেমে অন্য উপাদানগুলিকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। ইহাকে প্রাসঙ্গিক উক্তি বলা যাইতে পারে।

তবে এ শরীর কেন—পতঙ্গ আগুনে দেহ বিসর্জন দেওয়াকেই জীবনের সবচেয়ে

বড়ো কাজ বলিয়া মনে করে। সেইরূপ মানুষ বিদ্যা, রূপ, ধর্ম প্রভৃতি কোনো বিষয়কে চরম জ্ঞান করিয়া তাহার জন্য জীবন বিসর্জন দেওয়া শ্রেয় বলিয়া মনে করে।

তাহাতে কি সুখ—এখানে পতঙ্গের মনোভাবটি ব্যক্ত হইয়াছে। তাহার নিকট যাহা একান্ত কামনার জিনিস নয় তাহা অসার বলিয়া মনে হইয়াছে। যে যাহাতে নিবিষ্টচিত্ত, তাহা ভিন্ন অপর বিষয়ে তাহার আকাঙ্ক্ষা বিশেষ থাকে না। যে যাহার জন্য উৎসুক তাহাই তাহার কাছে একমাত্র আনন্দের নিদান।

দিব বৈ ত গ্রহণ করিব না—পতঙ্গ বহ্নিতে আত্মসমর্পণ করিয়া জ্বলিয়া মরার সুখ ব্যতীত আর কিছুই চায় না। মানুষও যাহার জন্য পাগল তাহার জন্য আপনার সর্বসুখ বিসর্জন দেওয়া ছাড়া তাহার আর কিছু কাম্য নাই। যে ধনের জন্য পাগল, সে ধন চায় বটে, কিন্তু পরিমিত ধন পাইলেই তাহার আশা মিটে না—অপরিমিত ধনের অধিকারী হইয়াও সে অর্থের সন্ধানে ফেরে, বস্তুত, ধন তাহার কাম্য নয়, সে ধন দিয়া ধনবহ্নিকে প্রজ্বলিত করে।

তুমি আমার বাসনার ইত্যাদি—মানুষ যাহা চায় তাহার সম্বন্ধেও এই কথা বলে ইত্যাদি—যাহা কামনার ধন তাহার স্বরূপ জ্ঞাত হইলে তাহার প্রতি আগ্রহ চলিয়া যায়। যতদিন পর্যন্ত তাহা অপরিজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত বা অধিক রহস্যাবৃত থাকে ততদিন পর্যন্তই তাহার প্রতি আকর্ষণ থাকে। যাহা অতিপরিচিত তাহার অভিনবত্ব আর থাকে না।

মনুষ্যমাত্রই পতঙ্গ, সকলেরই এক একটি বহ্নি আছে—ইহাই এই রচনাটির মূল কথা। বঙ্কিমচন্দ্র পতঙ্গ ও বহ্নিকে প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়া মানুষের কোনো কোনো বিষয়ে দুর্মদ আকাঙ্ক্ষার কথা বলিয়াছেন।

সংসার কাচময়—পতঙ্গ যেমন আলোর আগুনকে ঘেরিয়া যে কাচ আছে তাহাতে লাগিয়া ফিরিয়া আসে বলিয়া পুড়িয়া মরে না, মানুষও তেমনই সংসারের নানা জিনিসে প্রতিহত হয় বলিয়া বাঁচিয়া যায়। একদিকে তাহার যেমন দুর্নিবার কামনা থাকে, অন্যদিকে আবার এমন কয়েকটি বিষয় থাকে যাহা তাহাকে অন্যদিকে বাঁধিয়া রাখে।

যদি সকল ধর্মবিৎ চৈতন্যদেবের ন্যায় ইত্যাদি—মহাপ্রভু ভগবৎ প্রেমে উন্মাদ হইয়াছিলেন। তাঁহার গভীর অধ্যাত্মানুভূতিই ইহার কারণ। অপর ধর্মবেত্তাদের এইরূপ ধর্মানুভূতি হইলে তাঁহাদের প্রচারগুণে সংসারে আর কেহ থাকিত না।

সক্রেতিস—প্রাচীন গ্রীসের জ্ঞানী সক্রেতিসকে সত্য জ্ঞান প্রচার করিতে গিয়া রাজপুরুষদের বিরাগভাজন হইয়া বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

গেলিলিও—মধ্যযুগের বিজ্ঞানসাধক গেলিলিও যে বৈজ্ঞানিক সত্য প্রচার করেন তাহা বাইবেলের বর্ণনার বিরুদ্ধ হওযায ধর্মযাজক ও রাজপুরুষদের নিকট নিগ্রহ ভোগ করিযাছিলেন।

মানবহ্নি সৃজন করিয়া—দুর্যোধন তাঁহার মানের জন্যই পাণ্ডবদেব সহিত বিরোধ করিয়াছিলেন। সেই মানের জন্যই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ এবং কুরুকুল ধ্বংস হইযাছিল।

জ্ঞানবহ্নিজাত দাহের গীত "Paradise Lost"—মানুষ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইযা স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইযাছিল; মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট' কাব্যে সেই কাহিনী বর্ণিত হইযাছে।

ধর্ম্মবহ্নির অদ্বিতীয কবি সেণ্ট পল—ভগবদ্ভক্ত পল যীশুখ্রীষ্টের বাণী প্রচার করিতে আত্মনিযোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার সাধনায ইউরোপে খ্রীষ্টধর্ম দৃঢমূল হয।

ভোগবহ্নির পতঙ্গ "আণ্টনি, ক্লিওপেত্রা"—রোমক বীর আণ্টনি মিশরের বিলাসিনী রাজ্ঞী ক্লিওপেত্রার প্রতি আকৃষ্ট হইযাছিলেন। তাঁহাদের প্রণযের ফল বিষময হইযাছিল। আণ্টনি কোনো মতে বাঁচিযাছিলেন বটে, কিন্তু ক্লিওপেত্রা সর্প-দংশনে প্রাণ বিসর্জন দিযাছিলেন। ইংরাজ কবি সেক্সপীযার, আণ্টনি ও ক্লিওপেত্রার কাহিনী লইযা একটি নাটক লিখিযাছিলেন।

রূপবহ্নিব "রোমিও ও জুলিযেত"—শেক্সপীযারের অপর একটি নাটকের "প্রেমিক প্রেমিকা"। ইহারা প্রণযাবদ্ধ হইযা গৃহত্যাগ করে, কিন্তু অবশেষে মৃত্যু বরণ করে।

ঈর্ষ্যাবহ্নির "ওথেলো"—শেক্সপীযারের আর একটি নাটক। এই নাটকে ইযাগো ওথেলোর প্রতি ঈর্ষাপরবশ হইযা তাঁহাকে তাঁহার সাধ্বীপত্নী ডেসডেমনার প্রতি সন্দিহান করিযা তোলেন। ডেসডেমনার হত্যা ও ওথেলোর আত্মহত্যাতে নাটকের পরিসমাপ্তি হইযাছে।

গীতগোবিন্দ ইত্যাদি—এদেশের কাব্য কযেকটি সম্পর্কে বঙ্কিমের অভিমত লক্ষ্যণীয়।

তাহা কি কিছু জানি না ইত্যাদি—এই অংশে বঙ্কিমচন্দ্রের অধ্যাত্মদৃষ্টির গভীরতা প্রকাশিত হইযাছে। অবাঙ্‌মনসোগোচর ঈশ্বরের সম্পর্কে এখানে বঙ্কিম তাঁহার ধ্যানধারণা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিযাছেন। তাঁহার অন্য কোনো রচনায এতটা গভীর অনুভূতি আছে কি না সন্দেহ। ঈশ্বর, ধর্ম, স্নেহ প্রভৃতি সব কিছুকেই একটি

অখণ্ড সত্যের অন্তর্গত করিয়া দেখার মধ্যে তাঁহার কবিকল্পনাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের পক্ষপাতী না হইলেও দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্রাহ্ম ভক্তের চিন্তার সহিত তাঁহার অধ্যাত্মচিন্তার এই অংশটির সাজাত্য লক্ষণীয়।

পঞ্চম সংখ্যা

আমার মন

পরিচয়—এই রচনাটিকে মোটামুটিভাবে চারিটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথমে কমলাকান্তের মন হারাইয়া ফেলা লইয়া লেখক কৌতুক করিয়াছেন। ইহার পর সুখের মূল অন্বেষণ করিতে গিয়া পরসুখবর্ধনকেই স্থায়ী সুখের মূল বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। তৃতীয় অংশে বর্তমানে এদেশে প্রকৃত সুখের অভাব ও অর্থ বা বাহ্যসম্পদের জন্য নিরতিশয় লালসার কথা বলিয়া লেখক ক্ষোভ করিয়াছেন। পরিশেষে তিনি আত্মসর্বস্বতা বিস্মৃত হইয়া পরের জন্য চিন্তা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। বস্তুত, প্রবন্ধটি লঘুভাবে শুরু হইয়াছে; কিন্তু রসিকতা করিতে করিতে কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর বঙ্কিমচন্দ্র অকস্মাৎ গভীর সত্য দর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহার পরেই স্বদেশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আশাভঙ্গ-জনিত ক্ষোভ ও পরিশেষে দেশবাসীর কাছে সাগ্রহ অনুরোধ ব্যক্ত হইয়াছে। দপ্তরের আরও দুই একটি সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র লঘু-প্রসঙ্গ হইতে গভীর প্রসঙ্গে চলিয়া গিয়াছেন।

কমলাকান্ত সহসা অনুভব করিয়াছেন যে, তাহার মন হারাইয়া গিয়াছে। পূর্বে পাকশালায় তাঁহার মন হারাইয়া যাইত। পোলাও-কালিয়া-কোফতা, ইলিশ মাছের ঝোল, ছাগবৎসের কোরমা, লুচি, সন্দেশ বা অন্য সুখাদ্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগ প্রবল ছিল। সুতরাং প্রথমে সেখানে তাঁহার মন হারাইয়াছে কি না সন্ধান করিতে গিয়া তিনি দেখিলেন যে, সেখানে তাঁহার মন নাই।—জনৈক বন্ধুর কথায় তিনি প্রসন্ন গোয়ালিনীর কাছে তাঁহার মন আছে কিনা দেখিতে গেলেন। লোকে প্রসন্নর প্রতি তাঁহার আকর্ষণ সম্পর্কে নানা কথা বলিত—কিন্তু তিনি প্রসন্নের গব্যরসেরই অনুরাগী ছিলেন। প্রসন্ন তাঁহাকে সস্তায় দুধ খাওয়াইত এবং মাঝে মাঝে বিনামূল্যে ক্ষীর, সর প্রভৃতিও দিয়া যাইত। তাহা ছাড়া, তাঁহার রচনার সে ভক্ত ছিল এবং তাঁহারই অনুরোধে আফিম ধরিয়াছিল। সুতরাং প্রসন্নের প্রতি তাঁহার অনুরাগ থাকিবে তাহাতে সন্দেহ কি? তবে প্রসন্নর সঙ্গে সঙ্গে প্রসন্নর মঙ্গলা গাইয়ের প্রতিও তাঁহার

াকর্ষণ ছিল। প্রসন্ন তাঁহাকে যে গব্যরস সেবন করাইত তাহা মঙ্গলা হইতেই
হৃত। কিন্তু তিনি এখন অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন যে, প্রসন্ন বা তাহার গোয়াল-
ঘর দিকে তাঁহার মন নাই!—মনের সন্ধানে কাঁদিয়া কাঁদিয়া পথে ফিরিতে ফিরিতে
কটি যুবতীকে দেখিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, সেই তাহার মনচোর। তিনি
হার অনুসরণ করিলে এবং সে প্রশ্ন করিলে তিনি তাহাকে তাঁহার মন চুরি
রিয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় সে তাঁহাকে গালি দিয়াছিল। সেই হইতে তিনি
নের সন্ধানে রসিকতা করিতে পারেন না।

তবে তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এ সংসারে তাঁহার মনই নাই; শারীরিক
খ-স্বচ্ছন্দতা, রহস্যালাপ, গ্রন্থপাঠ—কোনো কিছুতেই তাঁহার মন নাই। তিনি
ছুতেই মন বাঁধেন নাই বলিয়া তাঁহার মন উড়িয়া গিয়াছে! তাঁহার বোধ হয়,
ই সংসারে মানুষ মন বাঁধা দিতে আসে। পরের জন্য না ভাবিয়া কেবল নিজেকে
ইয়া থাকায় তাঁহার সুখও নাই। যাহারা আত্মপ্রিয় তাহারাও সংসারী হইয়া
পুত্রের কাছে আপনাকে সঁপিয়া দেয়। তিনি বুঝিয়াছেন, "পরের জন্য আত্ম-
সর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল্য নাই" ধন, মান, যশ—কোনো
ছু সুখই চিরস্থায়ী হয় না। বরং একবার এইগুলির আহ্বান পাইলে এইগুলির
ভাবে অশেষ দুঃখই হয়। যাহা সুখকর বলিয়া মনে হয় তাহার সঙ্গে দুঃখ জড়িত
কে। এমন কি বিদ্যাও শেষ পর্যন্ত তৃপ্তি দেয় না। ধন, যশ প্রভৃতি লাভ করিয়া
হ চিরসুখী হইয়াছে এমন কথা বলিতে পারে না। মানুষ যে এইগুলির জন্য
গলের মতো ছুটিয়া বেড়ায় তাহার একমাত্র কারণ এই যে, মানুষ শিশুকাল হইতেই
ইগুলিকে সুখ বলিয়া মনে করে। কিন্তু পরের সুখ সাধন করা ছাড়া অন্য কোনো
ছুতেই মানুষের যথার্থ সুখ নাই। এখন লোক নিজের সুখসাধন করিবার জন্য
ন্মত্তের মতো ছুটিতেছে; কিন্তু কমলাকান্তের এই বিশ্বাস যে, মানুষ একদিন পরের
খবিধান করিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইবে। তাঁহার এই আশা কবে সফল
ইবে তাহা তিনি জানেন না।

পরের সুখ সাধনের কথা আড়াই হাজার বৎসর আগে বুদ্ধদেব বলিয়া গিয়াছেন,
াহার পর আরও অনেক মনীষী এই কথা বলিয়াছেন। কিন্তু লোকে এখনও কেবল
াপনার কথাই ভাবে। সম্প্রতি এ দেশে যে ইংরেজী শাসন এবং ইংরেজি শিক্ষা ও
ভ্যতার প্রসার হইয়াছে তাহাতে বাহ্যসম্পদ বৃদ্ধির দিকে অনুরাগই প্রবল হইয়া
ঠিতেছে। বাহ্যসম্পদের প্রীতি ইংরেজের সভ্যতার একটা বড়ো লক্ষণ—তাঁহারা
দেশের বাহ্যসম্পদের উন্নতি করিবার জন্যই চেষ্টা করিতেছেন। ভারতের অন্য

আদর্শগুলি বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে! রেলপথ, টেলিগ্রাফ—কতো কী হইতেছে কিন্তু তাহাতে মনের সুখ বাড়িতেছে কি? বাহ্যসম্পদ মানুষের মনের দুঃখ ঘুচাইতে পারে না।

বাংলাদেশের সংবাদপত্র, বক্তৃতাদি সব কিছুর মধ্যে কেবল বাহ্যসম্পদের কথা স্থান পাইয়াছে। চারিদিকে অর্থের জয়গান দেখিয়া কমলাকান্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছেন টাকাই এখন দেশের সর্বস্ব, টাকাই চতুর্বর্গ। যাহাতে দেশের টাকা বাড়ে তাহার জন্যই চারিদিকে অশেষ প্রচেষ্টা। ইংরেজ এই টাকার পূজার পুরোহিত। ইংরেজি বাংলা সংবাদপত্র, শিক্ষা, উৎসাহ সকলই ইহার পূজার অংশ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু অর্থপূজায় বঞ্চনা, মিথ্যাচার, স্বার্থপরতাই প্রধান উপকরণ। কমলাকান্ত ব্যঙ্গ করিয়া এই নূতন অর্থপূজার সাড়ম্বর বর্ণনা করিয়াছেন।

এই বাহ্যসম্পদ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা যত ব্যাপক হোক না কেন, ইহাতে দেশের কতটুকু কল্যাণ হইয়াছে! বাহ্যসম্পদ বৃদ্ধিতে ভদ্রতা, শিষ্টতা, ধার্মিকতা—কোনো কিছু হয় নাই। তবে ইহাতে কী লাভ হইয়াছে?

জীবনধারণের জন্য প্রত্যেককেই চেষ্টা করিতে হয়—প্রত্যেককেই উদর পূরণ করিতে হয়। কিন্তু কমলাকান্ত বলেন যে, কেবল উদর পূরণের জন্য চেষ্টা করিয়া কোনো লাভ নাই—আর সকল দিক ভুলিয়া গেলে চলিবে না। উদর পূরণ আর মনের সুখের মধ্যে পার্থক্য আছে। উদর পূরণের জন্য এত প্রয়াস আর মানসিক সুখ সাধনের জন্য কি কিছু করিতে হইবে না? মানুষের সহিত মানুষের প্রীতির সম্পর্ক বৃদ্ধি করিবার উপায় না করিলে চলিবে কেন?

কমলাকান্ত চিরকাল আপনার উদর পূরণ করিয়া আসিয়াছেন, কখনও পরের জন্য ভাবেন নাই। পরের জন্য কখনও ভাবেন নাই বলিয়া এখন সংসারে তাঁহার সুখ নাই, পৃথিবীতে তাঁহার থাকিবার কোনো প্রয়োজন আছে বলিয়াও তিনি বোধ করেন না। পরের বোঝা ঘাড়ে করিতে হইবে বলিয়া তিনি সংসারী হন নাই। এখন কোনো কিছুতে তাঁহার মন নাই—পরের দায় গ্রহণ না করায় সুখে তাঁহার অধিকার নাই।

অবশ্য বিবাহ করিয়া সকলেই যে সুখী হইয়াছে এমন নয়। বিবাহের পর স্নেহ নিবন্ধন আত্মপ্রিয়তা লুপ্ত হইয়া চিত্ত মার্জিত না হইলে, স্বজনকে ভালোবাসিয়া সমস্ত মানুষকে ভালোবাসিতে না পারিলে বিবাহের উদ্দেশ্য ব্যর্থ। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা পুত্রোৎপাদনের জন্য বিবাহ নয়। চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন না হইলে বিবা

নিষ্প্রয়োজন। মানুষ ইন্দ্রিয়জয়ী হইয়া পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইলে ক্ষতি নাই—প্রীতি-শিক্ষাহীন বিবাহে প্রয়োজন নাই।

পরিশেষে কমলাকান্ত সকলের নিকট তাঁহার একটি বিবাহ দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

পাঠ প্রসঙ্গে—সাত পৃথিবী—সপ্ত স্বর্গের অনুকরণে কমলাকান্ত সাত পৃথিবী বলিয়াছেন। সপ্তদ্বীপের কল্পনার প্রভাবও থাকিতে পারে।

ডেকচি সমারূঢ়া অন্নপূর্ণা—ডেকচিতে চাপানো ভাত। ভাতকে সচরাচর লক্ষ্মীরূপে কল্পনা করা হইয়া থাকে। 'অন্ন' শব্দটির সূত্রে কমলাকান্ত অন্নপূর্ণা শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

অন্যে যাহা বলে বলুক ইত্যাদি—সাধারণতঃ বিষ্ণু বা গুরুকে 'অখণ্ড মণ্ডলাকার' বলা হইয়া থাকে। কোনো কোনো রসিক টাকারও এই বিশেষণটি প্রয়োগ করেন। কমলাকান্ত লুচি গোল করিয়া তাহারই বিশেষণরূপে ব্যবহার করিয়াছেন।

অধিষ্ঠাত্রী দেবগণ—'অধিষ্ঠাত্রী' এই বিশেষণটি স্ত্রীলিঙ্গ; বিশেষ্য দেবগণ পুংলিঙ্গ। শুদ্ধরূপ 'অধিষ্ঠাতা'।

প্রণয়টা কেবল গব্যরসাত্মক—প্রসন্ন গোদুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য দিত বলিয়া কমলাকান্ত প্রসন্নর সহিত প্রণয়কে গব্যরসাত্মক বলিযাছেন।

তাহাতে আমার কলঙ্ক গেল না—বাস্তবিকপক্ষে কমলাকান্তের পক্ষে প্রসন্নর প্রতি প্রসক্ত হওয়া সম্ভবপর তাহা কেহ বিশ্বাস করিত বলিয়া মনে হয় না। সম্ভবতঃ প্রসন্নের চরিত্র বিবেচনা করিয়াই লোকে অন্যরূপ কথা বলিত। কমলাকান্ত তাহা নিজের কলঙ্ক বলিয়া মনে করিতেন।

এত গুণে কোন লিপি ব্যবসায়ী ইত্যাদি—কমলাকান্তের রচনা প্রসন্নর ভালো লাগিয়াছিল। ইহাই প্রসন্নর প্রতি তাঁহার আকর্ষণের সবচেয়ে বড়ো কারণ বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া, লেখক বা সাহিত্যিকের হৃদয় অপেক্ষাকৃত কোমল হওয়াই স্বাভাবিক।—সুতরাং প্রসন্ন সহজেই কমলাকান্তের মন টানিয়াছে।

গাইয়ের প্রতিও তদ্রূপ—বাস্তবিকপক্ষে মঙ্গলা গাই-ই দুধ দিত বলিয়া কমলাকান্ত তাহার প্রতি অনুরাগ পোষণ করিয়াছেন। 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী' অংশে মঙ্গলা গাইকে লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র যে কৌতুকরস সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

উভয়েই সুন্দরী ইত্যাদি—নারী ও গাভীতে কমলাকান্তের সমদৃষ্টি লক্ষ্যণীয়।

তাহার মুখের উপর ইত্যাদি—নারীর রূপ বর্ণনায় প্রৌঢ় লেখকের প্রৌঢ়

রসিকতা উপভোগ্য। দুর্গেশনন্দিনী হইতে আরম্ভ করিয়া সীতারাম পর্যন্ত প্রায় সব উপন্যাসেই বঙ্কিমচন্দ্র নারীর রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। প্রত্যেক স্থলেই একটি অভিনব রস সৃষ্ট হইয়াছে।

আমার মন কোথাও নাই—ইহার পূর্ব পর্যন্ত কমলাকান্ত তাঁহার মন কোথায় হারাইয়াছে বলিয়া রসিকতা করিতেছিলেন—এখানে রসিকতা ছাড়িয়া তাঁহার জীবনের একটি সত্য কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছেন। পৃথিবীর কোনো বিষয়েই তাঁহার বিন্দুমাত্র অনুরাগ নাই। তাঁহার মন পৃথিবীর কোনো জিনিসেই তৃপ্তি বোধ করিতে চাহে না। তাঁহার চিত্ত সকল আকর্ষণে বিমুখ হইয়াছে।

কতকগুলি ছেঁড়া পুঁথি ছিল—কমলাকান্ত অধ্যয়নপ্রিয় ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের গভীর ও ব্যাপক অধ্যয়ন ছিল। তিনি স্বদেশ ও বিদেশের অজস্র গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন।

লঘুচেতাদের মনের বন্ধন ইত্যাদি—যাঁহাদের চিত্তের স্থৈর্য আছে তাঁহারা কোনো বিশেষ বিষয়ে মনকে ন্যস্ত করিয়া রাখিতে পারেন। যাহাদের চিত্ত স্থির নয়, তাহাদের মন চিরকাল কোনো বিষয়ে বাঁধা পড়িয়া থাকে না। তাহা সহজেই বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে সঞ্চালিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত কোনো বিষয়েই আকৃষ্ট হইয়া থাকে না।

মন বাঁধা দিতেই আসি—সংসারে আত্মীয়স্বজনের বন্ধনে আমাদের মন বাঁধা পড়িয়া যায়। যাঁহারা অশেষ শক্তিধর পুরুষ তাঁহারা সংসার ব্যতীতই কোনো কিছুতে চিত্তকে নিবিষ্ট করিতে পারেন। কিন্তু সাধারণ লোকের মন যাহাতে স্বাভাবিক চাঞ্চল্যবশত উড়িয়া না যায় এইজন্য সংসারের বন্ধন প্রয়োজন। সংসার লঘুচিত্তের মন বাঁধিয়া রাখে।

আমি চিরকাল আপনার রহিলাম ইত্যাদি—কমলাকান্ত বিবাহ করেন নাই। তিনি সংসারের আকর্ষণেও কোনোদিন বাঁধা পড়েন নাই। পরের জন্য তিনি কোনোদিন সামান্য চিন্তাও করেন নাই। এইজন্য তাঁহার মন কোনো কিছুতে বাঁধা না পড়ায় কোনো কিছুতেই তিনি সুখ পাইতেছেন না।

যাহারা স্বভাবতঃ নিতান্ত ইত্যাদি—যাহারা আত্মপরায়ণ, তাহারা সংসারী হইলে আর কিছু না হোক তাহাদের স্ত্রীপুত্রের কাছে মন বাঁধা রাখে—তাহাদের জন্য চিন্তা করে। সেইজন্য তাহারাও সুখী হইতে পারে। স্ত্রীপুত্র প্রভৃতির প্রতি আকর্ষণ না থাকিলে তাহারা কোনো কিছুতেই সুখ পাইত না।

পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন ইত্যাদি—ইহাই এই রচনাটির নীতি। মানুষ নিজের

জন্য যে সুখ আহরণ করে তাহা ক্ষণস্থায়ী। সে পরের জন্য যাহা করে তাহাই চিরকাল সুখের নিদান হয়।

কিন্তু তাহা স্থায়ী নহে—ধন, মান, যশ প্রভৃতি লাভ করিয়া বা ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিয়া যে সুখ লাভ করা যায় তাহা ক্ষণিক। তাহাতে মানুষের চিত্ত পরিতৃপ্ত হয় না। পরবর্তী অংশে বাহ্যসুখ কেন যে স্থায়ী নয় লেখক তাহা বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ঐ কারণগুলি সংক্ষেপে এই—এইগুলি প্রথমে যতটা সুখকর বলিয়া মনে হয়, পরে কতটা অভ্যস্ত বা পরিচিত হইয়া গেলে আর তেমন সুখকর বলিয়া মনে হয় না; এই সুখগুলির উপাদান চিরস্থায়ী না হওয়ায় এইগুলি চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুখ চলিয়া যায়; এইগুলির সুখ পরিমিত। এই সব সুখের বিন্দুমাত্র অভাব হইলে দারুণ দুঃখ।

মানসম্ভ্রম মেঘমালার ন্যায় শরতের পর আর থাকে না—সুখের সময় মানসম্ভ্রম থাকিতে পারে। কিন্তু যখন অবস্থা খারাপ হইয়া পড়ে তখন মানসম্ভ্রম লুপ্ত হইয়া থাকে। লেখক শরতের পর হেমন্ত বা শীতকালকে দুরবস্থার সহিত তুলনা করিয়াছেন।

বিদ্যা তৃপ্তিদায়িনী নহে ইত্যাদি—পৃথিবীতে জ্ঞাতব্য বিষয়ের সীমা নাই। মানুষ যতই জ্ঞান আহরণ করে তাহার কাছে ততই জ্ঞানের সীমা দূরতর বলিয়া মনে হয়। বিদ্যা অর্জন করিবার সঙ্গে সঙ্গে যাহা অজ্ঞাত তাহা যে অপরিমিত ও অসীম এই বোধ জন্মে। সুতরাং জ্ঞান অর্জন করিয়া কেহ পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। যতই বিদ্যার সাধনা করা যায়, ততই অসীম অজ্ঞাত বিষয়ের জন্য পরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া যায়। বিদ্যা সম্পর্কে যদি এই কথা, তাহা হইলে বাহ্য অন্য বিষয় যে তৃপ্তি বা স্থায়ী সুখ দিতে পারিবে না সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

যেই এই কয় ছত্র পড়িবে ইত্যাদি—কমলাকান্ত তথা বঙ্কিমচন্দ্র উপলব্ধ সত্য সম্পর্কে স্থির-নিশ্চয়। মানুষ যে ধন, বিদ্যা, যশ প্রভৃতি অর্জন করিয়া স্থায়ী সুখ লাভ করিতে পারে না ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস।

ধনমানাদির অকার্যকারিতার ইত্যাদি—ধন, মান প্রভৃতি লাভ করিয়া স্থায়ী সুখ লাভ করা যায় না। সুতরাং ধন বা মান যে বিশেষ কার্যকরী নয় ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এ কেবল সুশিক্ষার গুণ—কমলাকান্ত 'সুশিক্ষা' শব্দটি ব্যঙ্গার্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। সংসারে ধন, মান প্রভৃতির প্রতি আকর্ষণের আদর্শ প্রচলিত। মানুষ শিশুকাল হইতেই এইগুলিকেই কাম্য বলিয়া দেখিয়া আসিতে থাকায় এইগুলি সম্পর্কে সেই মনোভাবই পোষণ করে।

আমি মরিয়া ছাই হইব ইত্যাদি—বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাসের দৃঢ়তা লক্ষণীয়। তিনি ঘোরতর আশাবাদী। বর্তমান পৃথিবীসুদ্ধ লোক ধন, মান প্রভৃতি অসার বস্তুর দিকে উন্মত্তভাবে ছুটিয়া গেলেও মানুষের চিত্তে যে স্থায়ী সুখের মূল অনুসন্ধান করিতে ভবিষ্যতে উৎসুক হইবে তাহা তিনি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। তবে মানুষের ইতিহাসে সেদিন কবে আসিবে তাহা তিনি সাগ্রহে প্রশ্ন করিয়াছেন। এই অংশে তাঁহার অন্তরের আকুল আবেগ ব্যক্ত হইয়াছে।

শাক্যসিংহ এই কথা ইত্যাদি—বুদ্ধদেব দুঃখ নিবৃত্তির কথা বলিয়াছেন। বাহ্য সম্পদের আধার সংসারে যাতায়াতের মধ্যে দুঃখ ছাড়া আর কিছুই নাই—সংসারের আকাঙ্ক্ষার নির্বাণ হইলে মানুষের দুঃখ ঘুচিবে ইহা তাঁহার বাণীর মূল কথা। তিনি সেইসঙ্গে অহিংসা ও মৈত্রীর কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মৈত্রী ভাবনা এবং বঙ্কিমের পরসুখচিন্তা একই বস্তু।

ভারতবর্ষের অন্যান্য দেবমূর্ত্তি সকল ইত্যাদি—ভারতবর্ষে অন্য যে সকল আদর্শ ছিল, তাহা পাশ্চাত্ত্য বাহ্য উন্নতির প্রয়াসের প্রাবল্যে উপেক্ষিত ও বিলুপ্ত হইয়াছে।

কতটুকু মনের সুখ বাড়িবে—কেবলমাত্র বাহ্য সম্পদের সাধনা করিলে তাহাতে মনের তৃপ্তি সাধিত হইতে পারে না। বাহ্য সম্পদ কিছুটা আরাম বা ক্ষণিক সুখ দেয় এইমাত্র—মনের তৃপ্তিসাধন করিবার শক্তি তাহার নাই। সুতরাং ইংরেজী সভ্যতার প্রসারের ফলে দেশের মধ্যে বাহ্য সম্পদের বৃদ্ধি হইয়াছে বটে, কিন্তু মানস শান্তি সুদূর পরাহত হইয়া উঠিয়াছে। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বাহ্য সম্পদ-সর্বস্বতার ফলে আমাদের জীবনে যে ঘোরতর অশান্তি আসিয়াছে তাহা একাধিক রচনায় প্রকাশ করিয়াছেন।—অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রকে এখানে প্রাচীনপন্থী বা প্রতিক্রিয়াশীল মনে করা সংগত হইবে না। 'সাম্য', 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি ইংরেজ আমলে যে সাধারণ লোকের অবস্থা আগের চেয়ে কিছুটা ভালো হইয়াছে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। বস্তুত, প্রাচীন ভারতবর্ষ বাহ্যসম্পদ ও আন্তর শান্তি দুইয়ের সামঞ্জস্য বিধানের কথা বলিয়াছে। বর্তমানে, ইংরেজী সভ্যতার বাহ্য আড়ম্বরের দিকটাই দেশের মধ্যে ব্যাপক প্রসারলাভ করায় মানুষের অন্তরের দিকটি উপেক্ষিত হইতেছে। ইহার ফলেই সারা দেশ জুড়িয়া ঘোরতব অশান্তি দেখা দিয়াছে।

হর হর বম্ বম্ ইত্যাদি—এই অংশে বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের মুখ দিয়া বর্তমান ধনপ্রীতিকে তীব্র ভাষায় ব্যঙ্গ করিয়াছেন।

হৃদয় ইহাতে ছাগবলি—এই ধনের সাধনায় হৃদয় বলিয়া মানুষের যে একটি পদার্থ আছে তাহা ভুলিয়া যাইতে হয়। অর্থের ক্ষেত্রে হৃদয় উপেক্ষিত হয়। ইহার

পূর্বেই বঙ্কিমচন্দ্র এডাম স্মিথ ও মিলের উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহাদের রচনায় অর্থনীতি বা শৃঙ্খলাবিধির স্থানই সর্বোচ্চ—হৃদয়বৃত্তিকে ইঁহারা প্রশ্রয় দেন নাই। পরেই তিনি বাহ্যিকতাসর্বস্ব হিতবাদকেও ব্যঙ্গ করিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁহার 'উদব-দর্শন' রচনাটিও স্মরণীয়।

মনের সুখ স্বতন্ত্র সামগ্রী—আহারাদি বাহ্যসুখ ও মনের সুখ আলাদা জিনিস। ঐহিক সুখসাধনের উপকরণ থাকিলেও মনের সুখ না থাকিতে পারে। বাহ্যসুখ বৃদ্ধি হইলেই মনের সুখ হইবে বঙ্কিমচন্দ্র এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিতে বলিয়াছেন।

আমি পরের জন্য ইত্যাদি—যে পরের সুখ সাধন করিতে চেষ্টা করে নাই, সুখে তাহার অধিকার নাই বঙ্কিমচন্দ্র এই মতটি নীতিবিদ্‌সুলভ দৃঢ়তার সহিত স্থাপন করিয়াছেন। কমলাকান্তের সরসোজ্জ্বল স্নিগ্ধ মূর্তির সঙ্গে চিন্তাবীর, আদর্শবাদী বঙ্কিমচন্দ্রের দৃঢ়তার সংমিশ্রণ দপ্তরের মধ্যে বহুস্থলেই হইয়াছে।

যদি পারিবারিক স্নেহের গুণে ইত্যাদি—পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা,—ইহা এদেশের প্রাচীন মত। পাশ্চাত্ত্য আদর্শে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিই বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য। বঙ্কিমচন্দ্র এই দুইটিকে অস্বীকার করিয়া প্রীতি-শিক্ষাকেই বিবাহের চরম উদ্দেশ্য বলিয়াছেন। বিবাহ করিয়া মানুষ প্রথমে স্ত্রী-পুত্রকে ভালোবাসে। সেই ভালোবাসাই ক্রমে পরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডি পার হইয়া পরের প্রতি প্রীতিতে পরিণত হইলেই বিবাহ সার্থক হইবে। এই আদর্শ উপেক্ষিত হইলে পৃথিবী হইতে মানুষ নাম মুছিয়া যাওয়াই উচিত—ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত।

কমলাকান্তের একটি বিবাহ দিতে পার—বঙ্কিমচন্দ্র এখানে কৌতুকের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন বটে, কিন্তু পূর্বের সুগম্ভীর কণ্ঠের পর এই উক্তিটির সুর যেন বেসুরা বাজিয়াছে। কমলাকান্ত যেমন শেষকালে করুণ মিনতি জানাইতেছে বলিয়া মনে হয়।

ষষ্ঠ সংখ্যা

চন্দ্রালোকে

দপ্তরের এই সংখ্যাটি অক্ষয়চন্দ্র সরকারের রচনা। অক্ষয়চন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরঙ্গ সাহিত্যিকমণ্ডলীর মধ্যে অন্যতম ছিলেন। অনেক বিষয়েই তাঁহাদের দুইজনের মত অভিন্ন ছিল। কমলাকান্তের দপ্তর বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইবার সময় বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ের অপ্রতুলতাবশতঃ বা অক্ষয়চন্দ্রের আগ্রহবশতঃ এই সংখ্যাটি

রচিত ও প্রকাশিত হয়। অক্ষয়চন্দ্র এমন নিপুণভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার ভাব। ভঙ্গি অনুসরণ করিয়াছেন যে, মূলগ্রন্থ হইতে এটিকে সহজে পৃথক করা যায় না- বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার সহিত ইহা প্রায় বেমালুমভাবে মিশিয়া গিয়াছে।

তবে ভালো করিয়া পর্যবেক্ষণ করিলে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার সহিত এই সংখ্যাটি পার্থক্য অনুভব করা যায়। সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই পত্র কাল্পনিকতার আতিশয্যের জন্য ভীষ্মদেব খোসনবীশের মন্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আক করিয়াছেন।—বাস্তবিকপক্ষে এই সংখ্যাটিতে যে ভাব ব্যক্ত হইয়াছে তা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবের সহিত প্রায় ষোলো আনাই মিলিয়া যায়—কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রে রচনার ভঙ্গির দুই এক আনা কম পড়িয়া গিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রৌঢ় বয়সের রচনা বর্ণনার মধ্যে উপকরণের বাহুল্য নাই। কমলাকান্তের দপ্তরে অনতিদীর্ঘ বাক্য ও বর্ণনার ঋজুভঙ্গি লক্ষ্যণীয়। যেখানে দীর্ঘ বাক্য আছে সেখানে বক্তব্য বিষয় তীব্রত ভঙ্গিতে প্রকাশিত হইয়াছে এইমাত্র। অক্ষয়চন্দ্র যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা অলংকৃ করিয়া, বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করিয়া পরিবেশন করিয়াছেন। যেমন—'উচ্চশিক্ষার ফ কি? ছাপরখাট—রূপার কলসী, গরদের কাচা এবং স্বর্ণালঙ্কারভূষিতা পট্টবসনাবৃত একটি বংশখণ্ডিকা। হরি হরি বল ভাই! তৃণগ্রাহী পাণ্ডিত্যাভিমানী, বি. এ. উপাধি ধারী উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত নব বঙ্গবাসীর, কলসী-বস্ত্র বংশখট্টাসমেত সজ্ঞানে গঙ্গালাভ হইল!!! প্রথমে উপাধি পাইয়াছিলেন, এখন সমাধি পাইলেন। তিনি বিলাতী ব্রহ্মে লীন হইলেন। বঙ্গীয় যুবক সংসারী হইলেন। তাঁহার উচ্চশিক্ষা তাঁহাকে তাঁহার চরমধামে পৌঁছিয়া দিয়াছে।'—এই ধরণের বিশ্লেষণের ফলে বর্ণনার রস তরল হইয়া পড়িয়াছে।—তাহা ছাড়া প্রাচীন সাহিত্য বা পুরাণের বিষয়াদি উল্লেখও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার তুলনায় সুপ্রচুর।—ইহা সত্ত্বেও অনেকস্থলেই ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণনাভঙ্গিও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার অনুরূপ হইয়াছে। মোটের উপর সমগ্র দপ্তরটি পাঠ করিবার সময় প্রথম হইতে জানা না থাকিলে এটিকে অপর হাতের লেখা বলিয়া মনে হয় না—গ্রন্থের মূল রস ইহাতে অব্যাহত আছে।

কমলাকান্ত চন্দ্রালোকোদ্ভাসিত রজনীতে প্রাচীন কাব্যের নায়ক-নায়িকাদের স্মরণ করিয়াছেন। কিন্তু এখন জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে কেহ কমলাকান্তের অভিসারিণী হয় না। চন্দ্রের সাতাশটি পত্নী আর কমলাকান্তের একটিও জোটে না। তিনি চন্দ্রের নিকট অশ্লেষা ও মঘা এই দুইটিকে পত্নীরূপে চাহিয়াছেন। অপর অনেকের মতো যখন তিনি কোনো কাজে অকৃতকার্য হইবেন, তখন এই দুইজনের উপর দো চাপাইয়া সাফাই গাহিতে পারিবেন।

এখন এদেশে নূতন কৌলীন্য-প্রথা প্রচলিত হইযাছে—বি. এ. পাস না হইলে বিয়ে হয় না। বিযের বাজারে বি. এ. পাস বরের অনেক দাম—তিনি দানরাশির সঙ্গে একটি বংশখণ্ডিকা পত্নীরূপে উপহার পান। ইহারই জন্য তিনি কামস্কাটকা দেশের নদীর নাম বা সালিমানের কুলজী মুখস্থ করিয়াছেন এবং টাউনহলে বক্তৃতাকে জীবনের সার বলিয়া জানিযাছেন। কমলাকান্ত এইরূপ বংশখণ্ডিকাকে বিবাহ করিতে উৎসুক নন। তাঁহার মতে বংশবৃদ্ধির জন্য বিবাহ করিতে হইলে মৎস্যাদিকে, টাকার জন্য বিবাহ করিতে হইলে টাকশালের অধ্যক্ষকে এবং সৌন্দর্যের জন্য বিবাহ করিতে হইলে চাঁদকেই বিবাহ করিতে হয।

গঙ্গা মর্ত্যে নামিযা আসিযাছে বলিযাই সগরবংশের উদ্ধার হইযাছে; মলয বাতাস মলয পর্বতে বা নন্দনকাননে আবদ্ধ হইযা থাকিলে কেহ তাহার প্রশস্তি করিত না, চাঁদ যদি ক্ষীরোদসমুদ্রে বা শ্বশুরগৃহে দক্ষালযে থাকিত তাহা হইলে কমলাকান্ত তাহার দর্শন চাহিত না। চাঁদ তাহার অমল জ্যোৎস্নারাশি অনাথার কুটির হইতে সুরু করিয়া কুঞ্জভূমি ও নদীর জলধারায ছড়াইয়া দেয়; শিশু, বালিকা, নববধূ প্রভৃতি সকলের সহিত তাহার সখিত্ব; সে পাপীর পাপের সাক্ষী। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই তাহাকে নানাভাবে সম্ভোগ করে। সারা আকাশের শোভাস্বরূপ চাঁদ কমলাকান্তের সহধর্মিণী—সে তাহাকেই বিবাহ করিতে চাহে।

সহসা কমলাকান্তের মনে পড়িযাছে যে, চাঁদ পুরুষ।—তবে আর্যমতে পুরুষ হইলেও ইংরাজীতে চাঁদের পরিবর্তে শী ব্যবহৃত হয—বিলাতী মতে চাঁদ স্ত্রী।—বাস্তবিকপক্ষে কে পুরুষ আর কে স্ত্রী সে সম্পর্কে কমলাকান্তের ঘোরতর সন্দেহ আছে। যে নবাব প্রমোদোদ্যানে পোষা পাখিদের লইযা খেলা করেন তিনি পুরুষ আর যে মহিষী দেশপ্রেমের বশবর্তী হইয়া সর্বসুখ বিসর্জন দিযা নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তিনি নারী। যে জোয়ান ফরাসী দেশের পুনরুদ্ধার করিযাছিল আর যে বেডফোর্ড তাহাকে বিপদে ফেলিয়াছিল ইহাদের মধ্যে কে পুরুষ? যে বা যাহারা বলীয়ান তাহারা পুরুষ আর যে বা যাহারা দুর্বল তাহারা স্ত্রীলোক একথাও অনেকে বলেন। কিন্তু কোমতের মতো নীতিবিশারদ এক নারীর প্রতাপে অবনত হইযা-ছিলেন; রোমের তিনজন মহাবীর ক্লিওপেত্রার অধীন হইয়াছিলেন।—কমলাকান্তের মনে হয় যে, বাঙালী যুবকরা কোথাও পুরুষ আর কোথাও স্ত্রী। তিনি নিজেই পুরুষ কি স্ত্রী সে বিষযে সন্দেহ আছে। সুতরাং চন্দ্র পুরুষ হইলে তিনি স্ত্রী। আর তিনি পুরুষ হইলে চন্দ্র স্ত্রী—বিলাতী মতে চন্দ্র স্ত্রী হওযায় তিনি বিলাতী মতে চন্দ্রের পাণিগ্রহণ করিবেন!

বর্তমানে চারিদিকে নানা মত দেখা দিয়াছে। দশাবতার নূতন মূর্তি ধারণ করিয়াছে। নূতন সাধকদের নূতন বিধিও দেখা যাইতেছে। সুতরাং কমলাকান্ত বিলাতী মতে চাঁদকে বিবাহ করিলেন—এখন হইতে কবিপ্রসিদ্ধি লঙ্ঘন করিয়া কমল চন্দ্রকে দেখিয়া আনন্দিত হইবে।

কমলাকান্ত চাঁদকে কিছু কিছু উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, চাঁদ যেন ব্যথিতের কাছে তাহার সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে—চাঁদের অপরিসীম সৌন্দর্যও অনেকের কাছে নিতান্ত অপ্রীতিকর বলিয়া মনে হয়। চন্দ্র এবার হইতে পূর্ণিমা রাত্রে কেবল কমলাকান্তর কাছে আসিবে। কমলাকান্ত চন্দ্রকে মেঘের জাল ছিন্ন করিয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করিতেছেন—সে তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হউক। চন্দ্রকে বিবাহ করিয়া তিনি lunatic আখ্যা স্বীকার করিলেন। বৈজ্ঞানিকেরা চাঁদকে পাষাণী বলিয়াছেন, তাহা হইলেও তিনি তাহাকে বিবাহ করিবেন।

চন্দ্র অভিমান করিলে কমলাকান্ত শত সহস্র বিবাহ করিবে। বিবাহের রীতিনীতি এখন তাহার সুপরিজ্ঞাত হইয়া গিয়াছে। শাখা হইতে আবির্ভূত নব-মল্লিকা, সরসীর পদ্ম, রামধনুর সহিত ক্রীড়ারতা নির্ঝরিণী, কুঞ্জলতা—সকলকেই তিনি বিবাহ করিবেন। কমলাকান্ত ঘটকালিও শিখিয়াছেন—এখন তিনি তাঁহার অনুরূপ বিবাহ অপরকে দিয়া দিতেও পারেন।

পাঠ প্রসঙ্গে—ট্রৈলস শর্ম্মা ট্রয়ের উচ্চ প্রাচীরে ইত্যাদি—ট্রয়লাস ও ক্রেসিডার প্রসঙ্গ।

অভিসারিণী শব্দটিতে ইত্যাদি—কমলাকান্ত অভিসারিণী শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। অভি—সৃ + ঘঞ্ = অভিসার + অস্ত্যর্থে ইন্ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈ!

ধাতু ছাড়িল গড়িল—জন্মমৃত্যু হইল।

কমলাভিসারিণী—কমলাকান্তের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে এমন।

অনেক অভিসারিণী দেখিয়াছি—কমলাকান্ত এখানে প্রসন্ন গোয়ালিনীর প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

সাতাইশ ইনী -পুরাণে কথিত আছে যে, চন্দ্র প্রজাপতি দক্ষের সাতাশটি কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই সাতাশটিই তারা। ইহাদের নাম অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্বফাল্গুনী, উত্তর-ফাল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতী।

আমার সহধর্ম্মিণীদের স্কন্ধে ইত্যাদি—অশ্লেষা ও মঘা এই দুইটি তারা অযাত্রা বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুতরাং কমলাকান্ত যদি কোনো কাজ করিতে গিয়া ব্যর্থ মনোরথ হন, তাহা হইলে তিনি এই দুইটি তারার নামে দোষ দিবেন!

উলুবনে মুক্তা ইত্যাদি—চন্দ্র তাহার মুক্তাশুভ্র জ্যোৎস্নারাশি উলুবনে ছড়াইয়া দেয়। কমলাকান্ত তাহার মুক্তার মতো মূল্যবান্ বাণী যত্রতত্র বিতরণ করিতেছেন।

বল্লালসেনের প্র-পরা-অপ পৌত্রেরা—বল্লাল সেন বাংলায় সম্প্রদায়ের গুণানুসারে কৌলীন্য প্রথা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে কৌলীন্য প্রথা কেবলমাত্র বিবাহের ব্যাপারে একটা সহায়কমাত্র হইয়াছিল। সকলেই কুলীনের হাতে কন্যা সম্প্রদান করিতে চাওয়ায় অকুলীনের বিবাহ কোনো কোনো সময় দুর্ঘট হইয়া উঠিত। এখন নূতন কৌলীন্য প্রথা স্থাপিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি সেই কৌলীন্য।

ছাপরখাট রূপার কলসী—বিবাহে পাত্র যে দান পণস্বরূপ পায় কমলাকান্ত তাহাকে শ্রাদ্ধের'দানের সহিত তুলনা করিয়াছেন!

একটি বংশখণ্ডিকা—বাঁশের টুকরায় প্রাণের স্পন্দন নাই। যাহার সহিত বিবাহ হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রাণ-স্পন্দনের বিশেষ লক্ষণ না থাকায় কমলাকান্ত সেই নির্জীব বা নির্বোধ নববধূকে বংশখণ্ডিকা বা বংশদণ্ডিকা বলিয়াছেন।

সজ্ঞানে গঙ্গালাভ হইল—কমলাকান্ত শিক্ষিত নব্যযুবকের বিবাহকে মৃত্যুর সহিত তুলনা করিয়াছেন। তাঁহার কল্পনার আতিশয্যের জন্য ভীষ্মদেব পাদটীকায় এই রাত্রে কমলাকান্তের বাড়াবাড়ি হইয়াছিল বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

কামস্কাটকা দেশের নদী ইত্যাদি—পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার অসার ও নিষ্প্রয়োজন অংশের দিকে লেখক কটাক্ষ করিয়াছেন। এই শিক্ষার ফলে অনেকেই বিভিন্ন দেশের নানা বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করিয়াছেন, কিন্তু স্বদেশ সম্পর্কে তাঁহারা একেবারেই অজ্ঞ।

সার্লিমান—মধ্যযুগের ফরাসী সম্রাট সার্লেমান।

টাউন হলে বক্তৃতা ইত্যাদি—লেখক তথাকথিত বক্তাদের অসারতাকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি নিজেদের দেশসেবী বা রাজনীতিবিদ্ বলিয়া মনে করে; কিন্তু তাহাদের বাগ্‌জাল বিস্তার মাত্রই সার।

যদি জীবপ্রবাহ বৃদ্ধি ইত্যাদি—কমলাকান্তের উক্তির তীব্রতা লক্ষ্যণীয়। অক্ষয়চন্দ্র কমলাকান্তের মুখ দিয়া 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা' এই পুরাতন আদর্শ ও এ যুগের অর্থের জন্য বিবাহের আদর্শ দুইটিকেই ব্যঙ্গ করিয়াছেন।

অঞ্জনার অঞ্চল লইয়া ইত্যাদি—পবনদেব বানরী অঞ্জনার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত বিহার করিয়াছিলেন। হনূমান অঞ্জনারই পুত্র। চন্দন বৃক্ষ ও এলালতায় সমাচ্ছন্ন মলয় পর্বত হইতে দক্ষিণ বাতাস প্রবাহিত হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

যদি তোমার ব্যাকরণ পড়া থাকে ইত্যাদি—'শশিন্' শব্দের প্রথম একবচনে 'শশী' আর সম্বোধনে 'শশিন্'। কমলাকান্ত শশীকে ঈ-ভাগান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার সম্বোধনে 'শশি' পদটি কল্পনা করিয়াছেন।

আবার সেই তুমিই ইত্যাদি—চাঁদ যে দুষ্কর্মের সাক্ষী এই মতটি বঙ্কিমের আদর্শের প্রতিকূল না হইলেও ইহা বঙ্কিমের উচ্চ কবিকল্পনার উপযুক্ত নয়। বঙ্কিমচন্দ্র নীতিবিদ্ হইলেও তাঁহার নীতিবোধ গভীরতর অনুভূতি ও কল্পনা হইতে উদ্ভূত।

তুমি ক্রীড়াশীল শিশুর ইত্যাদি—এই অংশে বর্ণনার বাহুল্য রচনার পক্ষে কিছুটা ভারস্বরূপ হইয়াছে।

বিলাতীয় শর্ম্মাদের মতে—ইংরেজী ব্যাকরণে চাঁদ স্ত্রীলিঙ্গ—ইহার পরিবর্তে সর্বনামে স্ত্রীলিঙ্গবাচক শী (she) ব্যবহৃত হয়।

যে ওয়াজিদ আলি শাহ ইত্যাদি—এই অনুচ্ছেদটির রচনা-নৈপুণ্য লক্ষ্যণীয়। এখানে ভাবে ও ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের ছাপ পড়িয়াছ। অক্ষয়চন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন—সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব তাঁহার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে পড়া স্বাভাবিক। আবার এমনও হইতে পারে যে, রচনাটি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইবার সময় বঙ্কিমচন্দ্র সমগ্র অনুচ্ছেদটি বা ইহার কিছু অংশ নিজে সংযোজন করিয়াছেন।

ওয়াজিদ আলি শাহ—অযোধ্যার শেষ নবাব। ইংরেজ গবর্ণর জেনারেল ডালহৌসি ইঁহার নিকট হইতে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যা রাজ্য গ্রহণ করিয়া বার্ষিক বারো লক্ষ টাকা ভাতা নির্দিষ্ট করিয়া দেন। ইহার পর ইনি কলিকাতার নিকটস্থ মুচিখোলায় বসবাস করেন।

যে মহিষী দেশবাৎসল্যে ইত্যাদি—কমলাকান্ত এখানে পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের পত্নী ঝিন্দনকুমারীর কথা বলিতেছেন। ইংরেজদের কবল হইতে শিখদের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্ত ইনি প্রাণপণ চেষ্টা করেন। ইনি নেপালরাজের আশ্রয় ও সহায়তা প্রার্থনা করিতে নেপালে যান, কিন্তু নেপালের মন্ত্রী জঙ্গ বাহাদুর তাঁহাকে বৃটিশ রেজিমেণ্টের হাতে সমর্পণ করেন।

জোয়ান অর্লিয়ান্স—ফরাসী দেশের অর্লিয়ান্স প্রদেশের কৃষককন্তা জোয়ান ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ লাভ করিয়া নিজে পুরুষের বেশ ধারণ করিয়া যুদ্ধ করিয়া ইংরেজ

সৈন্য বিতাড়িত করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করেন। ইংরেজরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া ডাইনী অপবাদ দিয়া হত্যা করে।

কোমৎ—আগস্ট কোমৎ; প্রখ্যাত ইউরোপীয় দার্শনিক।

রোমকপত্তনের কৈসরগণ—রোমের সর্বাধিনায়ক সীজার এই উপাধিতে পিরচিত ছিলেন—কৈসর ইহার অপর উচ্চারণ। প্রাচীন ইউরোপে রোমক সাম্রাজ্যই সব চেয়ে শক্তিশালী ছিল এবং সীজারই প্রধান পুরুষ ছিলেন।

মৈসরী রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা ইত্যাদি—মিশরের রাণী ক্লিওপেত্রা নিজে দেশশাসন করিতেন। তিনি নিরতিশয় বিলাসপরায়ণা ছিলেন। রোমের একাধিক প্রধান পুরুষের সহিত তাঁহার প্রণয়-সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল।

বিকল্পে ইট্—ইট (it) শব্দটি ক্লীবলিঙ্গ বাচক। নব্যযুবকেরা অনেক সময় নির্জীবতা প্রাপ্ত হন বলিয়া কমলাকান্ত তাহাদের বিকল্পে 'ইট' হওয়ার কথা বলিয়াছেন। কৌতুকটি ব্যাকরণের ব্যাখ্যার ধরণে করা হইযাছে।

দশাবতার—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি।

প্রথম রামের স্থানে ইত্যাদি—পরশুরাম কুঠার দিযা মাতৃহত্যা করিয়াছিলেন, রামচন্দ্র বিনা দোষে গর্ভবতী পত্নীকে ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং বলরাম বারুণী অর্থাৎ সুরা পান করিতেন।

কল্কিমতে সংহার মূর্ত্তি—কল্কি ম্লেচ্ছ সংহার করিবেন। নব্যযুবকরা সব কিছু সংহার করিতে উদ্যত।

শাক্তমতে ভোজ্য—শাক্তমতে মাংসাদি আহার প্রস্তুত করা হয়। শক্তিপূজায় মাংসাদি বিহিত।

শৈব ত্রিশূল—খাদ্য বিঁধিয়া তুলিবার ত্রিশূলাকৃতি কাঁটা।

সৌর পান—মদ্য পান। সৌর শব্দটি সূর্য হইতে বিশেষণ হয়, এখানে 'সুরা' হইতে বিশেষণ হইয়াছে।

প্রথম গৌরাঙ্গ—যীশুখৃষ্ট।

মেজো গৌরাঙ্গ—চৈতন্যদেব।

রাধানগরের ছোট গৌরাঙ্গ—রাজা রামমোহন রায়। রামমোহন উপনিষদের উপর ভিত্তি করিযা বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্মপ্রচার করেন। তিনি যে উপাসনার প্রবর্তন করেন, সংস্কৃত শ্লোক বা স্তোত্রাদি পাঠ তাহার অঙ্গ।—রামমোহনের ব্রহ্মসভা হইতেই পরবর্তী কালে ব্রাহ্মসমাজের উদ্ভব হয়। বঙ্কিমগোষ্ঠী ব্রাহ্মসমাজের

উপর কিছুটা কিরূপ মনোভাবাপন্ন ছিলেন। এখানে তাহার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষীয় কবিগণের কবিত্ব লোপ হইল—কবিপ্রসিদ্ধি এই যে, কমল সূর্যের প্রিয়া। সূর্য অস্ত গেলে কমলের দলগুলি মুড়িয়া যায়—অর্থাৎ কমল বিরহে মুহ্যমান হইয়া পড়ে। সূর্য অস্ত গেলেই চাঁদ ওঠে; সুতরাং চাঁদ উঠিলেই কমল আঁখি মুদে। কিন্তু চাঁদ উঠিলে এই কমল অর্থাৎ কমলাকান্ত আনন্দিত হইবে।

তুমি তোমার রূপগৌরবে ইত্যাদি—এই উপদেশটির মূলে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবাদর্শের প্রভাব আছে। যে শোকাহত, দগ্ধহৃদয় বা যে ব্যক্তি সব কিছুতে বীতরাগ তাঁহার সৌন্দর্যের কোনো প্রয়োজন নাই।

ধর্ম্মযাজকতার ভাণ হয়—খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজক বা ব্রাহ্ম ধর্মোপদেষ্টাদের প্রতি কটাক্ষ লক্ষ্যণীয়।

ক্ষীরোদ সাগরজা—কথিত আছে যে, সমুদ্র মন্থন করিয়া চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। তুমি পাষাণী—বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, চাঁদে জল বা মৃত্তিকা নাই—চাঁদ কেবল পাথর দিয়া গড়া।

বৈতরণীর নবীন বৎস—চান্দ্রায়ণাদি করিলে গোবৎসের লেজ ধরিতে হয়—ইহাতে মৃত্যুর পর স্বর্গপূর্ববর্তী বৈতরণী নদী সহজে পার হওয়া যায় বলিয়া বিশ্বাস।

যখন দেখিব শাখাস্কন্ধ হইতে ইত্যাদি—কমলাকান্ত সৌন্দর্যের পিপাসু। যেখানে সে সৌন্দর্য দেখিবে সেখানেই সে বিবাহ করিবে। প্রকৃতিতে এই ধরণের মানবত্ব কল্পনা বঙ্কিমের রচনায় বিশেষ দেখা যায় না। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের রচনায় ইহার প্রাচুর্য আছে; অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কল্পনার মূলে কালিদাসের প্রভাব আছে।

সপ্তম সংখ্যা

বসন্তের কোকিল

পরিচয়—এই রচনাটিকে মোটামুটিভাবে তিনটি অংশে ভাগ করা যায়। কমলাকান্ত প্রথমে কোকিলকে কেবল সুখের ভাগী ও অকারণ নিন্দক বলিয়াছেন; দ্বিতীয় অংশে বলিয়াছেন যে, কোকিলের স্বর সুন্দর বলিয়া সে যাহা বলে তাহাই সুন্দর—কোকিলের মতো অনেকেই সুকণ্ঠের জন্য জিতিয়া গিয়াছে; তৃতীয় অংশে কমলাকান্ত নিজেই কোকিলের মতো মিষ্টস্বরে ডাকিতে চাহিয়াছেন।

বসন্তের কোকিল সুখের বসন্ত মাসে আসে—কিন্তু শীত কি বর্ষায় তাহার সন্ধান

পাওয়া যায় না। কমলাকান্ত দেখিয়াছেন যে, সংসারে এমন লোক অনেক আছে। নসীবাবুর তালুক হইতে খাজনার টাকা যখন আসে তখন তাঁহার বাড়িতে লোক ভাঙিয়া পড়ে—অসংখ্য লোক তাঁহার বাগানবাড়ির সঙ্গী হয়। কিন্তু যখন তাঁহার ছেলেটি অকালে মারা গেল তখন আর কাহারও দেখা পাওয়া গেল না।

বসন্তের কালো কোকিল রঙিন ফুলের মধ্যে বসিয়া কু-উঃ বলিয়া ডাকে—এই ডাক কমলাকান্তের ভালো লাগে। তাহার চোখে সকলই কু। সুন্দর কোনো কিছু দেখিলেই সে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া কু-উঃ বলিয়া ডাকিবে। পুষ্পকুঞ্জে সৌন্দর্যের হিল্লোল বহিয়া যাইতেছে দেখিলে সে কু-উঃ বলিবে। নবশ্যামল পত্র ও প্রস্ফুটিত পুষ্পরাজিতে পরিপূর্ণ বকুলেব ডালে বসিয়া, বিকশিত নবমল্লিকাকে দেখিয়া, গৃহপ্রাঙ্গণস্থ দাড়িম্ব-বৃক্ষের শাখায় বসিয়া গৃহবালিকাদের অপরূপ সৌন্দর্য দেখিয়া কোকিল পঞ্চমস্বরে কু-উঃ বলিয়া ডাকিয়া তাহার মনের জ্বালা জুড়াইবে। পঞ্চমস্বরেই কোকিলের জিত —তাহা না হইলে কেহ তাহার ডাক শুনিতে চাহিত না। গ্ল্যাডস্টোন, ডিস্রেলি প্রভৃতির মতো কোকিলও গলাবাজিতে জিতিয়া গিয়াছে—গলাবাজি না থাকায় জন স্টুয়ার্ট মিল পার্লিয়ামেণ্টে স্থান পান নাই।

কোকিল যদি প্রকৃতির অঙ্গনে পঞ্চমস্বরে ডাকিয়া উঠে, তাহা হইলে সকলে কাঁপিয়া উঠে। কোকিল কু বলিলে সব কু, সু বলিলে সু। কু যে আছে কমলাকান্ত তাহা স্বীকার করেন। লতায় কাঁটা, কুসুমে কীট, গন্ধে বিষ, রূপের বিকার, স্ত্রী-জাতির বঞ্চনা—সবই কু-র পরিচয় দেয়। কোকিল না বলিয়া মোরগ 'কু-কু-কু-কু' বলিলে তাহাকে কু বলিয়া মানা চলিবে না। কেবল চেঁচাইলে চলে না—পঞ্চমসুর লাগানো চাই। দর্শনের কড়িমধ্যম লাগাইয়া সার জেম্‌স্ ম্যাকিণ্টশ হারিয়া গিয়াছেন —অলঙ্কারে পঞ্চম লাগাইয়া মেকলে জিতিয়াছেন। আদিরস পঞ্চমে ধরিয়া ভারতচন্দ্র জয়ী - কবি কঙ্কণের ঋষভসুর উপেক্ষিত। বৃদ্ধ পিতামাতার কথা বেসুরা লাগে, গৃহিণীর পঞ্চমসুরে সব হার মানে।

কোকিলের স্বরকে কেন যে পঞ্চম বলে কমলাকান্ত তাহা বুঝিতে পারেন না। যাহা মিষ্ট তাহাকেই তিনি পঞ্চমসুর বলিয়া জানেন। আলতা-পরা ছোটো পায়ের গুজরী পঞ্চমও পঞ্চমসুরের মতোই মিষ্ট। সুরকে প্রাণী-বিশেষের ডাক বলিলে তিনি বুঝিতে পারেন না। কোনো কালোয়াত যখন তাম্বুরা লইয়া তাঁহাকে সুর চেনাইতে আসে, তখন তাহার কণ্ঠস্বর তাঁহার কাছে মঙ্গলা গাইয়ের বাছুরের আওয়াজ বলিয়া মনে হয়।

কমলাকান্ত একসঙ্গে পঞ্চম গাহিতে কোকিলকে আহ্বান করিতেছেন। কোকিল গাছে গাছে আপনার মনের আনন্দে গাহিয়া বেড়ায়, কমলাকান্তও মনের আনন্দে তাঁহার দপ্তর লেখেন। দুইজনেই নিঃসঙ্গ হইয়াও আনন্দের অধিকারী। কোকিলের সম্বল গলা আর কমলাকান্তের সম্বল আফিঙের ডেলা। দুইজনেই পঞ্চম-স্বর ভালোবাসে। কোকিল বা কমলাকান্ত পঞ্চমস্বরে কাহাকেই বা আহ্বান করেন ?

কমলাকান্ত বলিয়াছেন যে, তিনি এই পৃথিবীতে সুন্দরকেই আহ্বান করেন। যে তাঁহার ডাক শোনে তাহাকেই ডাকেন। এই পরম বিস্ময়কর ব্রহ্মাণ্ড, ইহার সুন্দর দেহের আত্মা—তাহাকেই দুইজনে ডাকেন। কাহাকে যে ডাকিতেছেন তাহা দুই-জনেই জানেন না। কিন্তু দুইজনের ডাকই পৌঁছাইবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন। যদি এমন কোনো কান থাকে যাহাতে সব ডাক পৌঁছায়, তাহা হইলে তাঁহাদের দুইজনের ডাকই পৌঁছাইবে।

কমলাকান্ত কোকিলকে সাধা গলায় কুহুধ্বনি করিতে বলিতেছেন। সুকণ্ঠ না থাকায় তিনি কখনও তাঁহার মনের কথা বলিতে পারেন নাই। কোকিলের মতো স্বর পাইলে হয়তো বলিতেন। কোকিল তাঁহার মনের কথাটি তাহার পঞ্চম-স্বরে চারিদিকে ঘোষণা করিয়া দিক। তিনি যদি একবার কোকিলের মতো কণ্ঠ ও অমানুষী ভাষা পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার মনের কথা নীল আকাশের নক্ষত্রদের কাছে ব্যক্ত করিতেন। তিনি যদি তাহা না পারিলেন তাহা হইলে কোকিলই একবার তাঁহার হইয়া ডাকুক।

মানুষ-কোকিলে ইত্যাদি—এখানে কমলাকান্ত কোকিল যে কেবল বসন্ত-বিহারী সেই কথা বলিতেছেন। বস্তুতঃ, ইহা রচনাটির মূল বিষয় নয়—রচনাটির সূত্রপাতে তিনি একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন। পৃথিবীর অনেকেই যে কেবল সুসময়ের বন্ধু এবং অসময়ের কেহ নয় তাহা এই অনুচ্ছেদটিতে নসীরামবাবুর প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে।

টিকি ফোঁটা তেড়ি চশমার হাট—প্রাচীনপন্থী লোকেরা বিশেষতঃ ব্রাহ্মণপণ্ডিতরা টিকি রাখেন ও ফোঁটা কাটেন ; আধুনিক যুবকরা চুলে তেড়ি কাটেন ও কেহ কেহ চশমা পরেন। নসীবাবুর সুদিনে সকলেই ভিড় জমায়।

হেটো ইংরেজী ইত্যাদি—ইংরেজী ভাষা সম্পর্কে বিশদ্ জ্ঞান বাঙালীর পক্ষে সহজ নয়—সেযুগে শিক্ষার প্রসার কম হওয়ায় তাহা নিতান্তই কম ছিল। অথচ

অনেকেই কিছু কিছু ইংরেজী বলিয়া বাহাদুরি লইবার চেষ্টা করিত। বঙ্কিমচন্দ্র এই ধরণের ইংরেজীকে কটাক্ষ করিয়াছেন।

মাত্রা চড়ায়—অতিরিক্ত মদ্যপান করে।

টেবিলের নীচে গড়ায়—মাতাল হইয়া মাটিতে শুইয়া পড়ে।

কাহারও অসুখ ইত্যাদি—বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার বাঁধুনি ও স্নিগ্ধ কৌতুকরসের আবরণে তীব্র ব্যঙ্গ লক্ষ্যণীয়।

জ্বলন্ত আগুনের মধ্যগত কালো বেগুনের মতো—উপমাটি মনোজ্ঞ হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র অপূর্ব দক্ষতার সহিত ভাবাবেগময় রচনার মধ্যে এইরূপ অদ্ভুত একটি উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন।

পরান্ন প্রতিপালিত—কোকিল ডিম পাড়িয়া কাকের বাসায় রাখিয়া দেয়। কাক সেই ডিম হইতে বাচ্চা ফুটাইয়া তাহাকে লালন-পালন করে।

বকুলের অতি ঘন-বিন্যস্ত ইত্যাদি—এই অংশে বর্ণনার প্রসাদগুণ ও মাধুর্য উপভোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাকৌশলে বসন্তের স্নিগ্ধ-মধুর সৌন্দর্য প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। বকুলের পাতার স্পর্শে শরীর শীতল করিয়া কোকিলের কু-উঃ বলিয়া ডাকের কল্পনা লক্ষ্যণীয়।

শুভ্রমুখী শুদ্ধশরীরা ইত্যাদি—বঙ্কিমচন্দ্র এখানে জীবন্ত ছবির মতো বর্ণনা করিয়াছেন। পরবর্তী বাক্যে বালিকাদের পুষ্পের সহিত তুলনা ও তাহাদের মধ্যে লতা-পুষ্পের গুণরাজি আরোপ সুন্দর হইয়াছে। বঙ্কিমের এই স্নিগ্ধ-সৌন্দর্য প্রেমের পরিচয় অন্যত্র বিশেষ পাওয়া যায় না।

গ্ল্যাডস্টোন (১৮০৯-১৮৯৮)—ইংলণ্ডের অন্যতম প্রধান রাজনীতিবিশারদ্। ইনি প্রথমে রক্ষণশীল দলের সভ্য ছিলেন—পরবর্তী কালে উদারনৈতিক দলে যোগদান করেন। ইনি প্রায় ষাট বৎসরকাল ইংলণ্ডের রাজনীতিক্ষেত্রে অতিবাহিত করেন এবং একাধিকবার উদারনৈতিক দলের নেতৃরূপে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গ্ল্যাডস্টোন তাঁহার বক্তৃতাশক্তির জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার কয়েকটি ভাষাতে ব্যুৎপত্তিও ছিল।

ডিস্রেলি—ইনিও ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন।

জন স্টুয়ার্ট মিল—ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও নৈয়ায়িক; এক সময় ইঁহার অভিমত বঙ্কিমচন্দ্রকে অত্যন্ত প্রভাবিত করিয়াছিল।

সিংহাসন হইতে হেস্টিংস পর্য্যন্ত—সিংহাসনের অধীশ্বর সম্রাট্ হইতে প্রতিনিধি

হেস্টিংস্ পর্যন্ত। হেস্টিংস্ ভারতবর্ষের প্রথম গবর্ণর জেনারেল। এডমণ্ড বার্ক পার্লিয়ামেণ্টে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। কোকিলও তাহার কুহুধ্বনিতে অনুরূপ আলোড়ন সৃষ্টি করিবে ইহাই কমলাকান্ত বলিতে চাহেন।

মেকলে—ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ কবি ও ইতিহাস লেখক। ভাষার ওজোগুণে ইঁহার রচনা জনপ্রিয় হইয়াছিল। বঙ্কিম এই কথা বলিতে চাহেন।

ভারতচন্দ্র (১৭১২—১৭৬০)—ভারতচন্দ্র রায় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ কবি। অল্পবয়সেই ইনি প্রতিভার পরিচয় দেন। দুর্ভাগ্য-তাড়িত হইয়া ইনি বহুস্থানে ঘুরিবার পর অবশেষে কৃষ্ণনগরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাকবি হন। ইঁহার রচিত 'অন্নদা-মঙ্গল' কাব্য সুপ্রসিদ্ধ—'বিদ্যাসুন্দর' এই কাব্যেরই একটি অংশ। 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে আদিরসের প্রাবল্য দেখা যায়।

কবিকঙ্কণ (ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী)—মুকুন্দরাম চক্রবর্তী মেদনীপুরের বাঁকুড়া দেবের আশ্রয়ে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়া 'কবিকঙ্কণ' উপাধি লাভ করেন। ইনি প্রাচীন বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে অন্যতম। ইঁহার কাব্যের সরল মাধুর্য ও করুণ-রস উপভোগ্য। ভারতচন্দ্রের কাব্যের ঔজ্জ্বল্যের তুলনায় কবিকঙ্কণের কাব্য আপাতদৃষ্টিতে নিষ্প্রভ বলিয়া মনে হয়।

গুজরী পঞ্চম—গুজরী অঙ্গুরীর মতো একপ্রকার পদাভরণ—চলিলে ঝমঝম করিয়া বাজে। পায়ের পাঁচ আঙ্গুলের জন্য পঞ্চম শব্দটি যুক্ত হইয়াছে।

এটি হাতীর ডাক ইত্যাদি—সংগীতশাস্ত্রে ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ এই সাতটি স্বর যথাক্রমে ময়ূর, বৃষভ, ছাগ, ক্রৌঞ্চ, কোকিল, ঘোটক ও হস্তী এই সাতটি প্রাণীর ডাক হইতে উদ্ভূত বলা হইয়াছে।

তাহার গর্জ্জন শুনিয়া ইত্যাদি—কালোয়াতী সংগীত-সাধকদের মধ্যে অনেকে কণ্ঠে কৃত্রিম গাম্ভীর্য আরোপ করেন—কমলাকান্ত তাহাকেই কটাক্ষ করিতেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সংগীতের অনুরাগী ছিলেন—তবে বিশুদ্ধ কালোয়াতী গানের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ ছিল বলিয়া মনে হয় না।

তোতে আমাতে একবার পঞ্চম গাই—কোকিল পঞ্চমসুরে গান গাহিয়া সারা পৃথিবী ভুলায়। কমলাকান্তও পঞ্চমস্বরে কথা কহিয়া পৃথিবীশুদ্ধ সকলকে যেন ভুলাইতে চাহেন। প্রথম অংশের তুলনায় এই অংশের ভাবান্তর লক্ষ্যণীয়। কমলাকান্ত প্রথমে কোকিলকে কেবল সুখের দিনের পাখি বলিয়া অনুযোগ করিয়াছেন; তাহার

পব তাহাকে বিশ্বনিন্দক বলিযা অভিযোগ করিযাছেন ; ইহার পর কোকিল যে কেবল তাহার পঞ্চমস্বরের জন্যই বিশ্বজয করিয়াছে তাহা বলিয়াছেন ; সবশেষে তিনি কোকিলের সহিত আপনার সাজাত্যের কথা ব্যক্ত করিযাছেন। কোকিলের মতোই সাহিত্যিকও অকারণ আনন্দে গান গাহিযা ওঠেন। কোকিল পঞ্চমস্বরে গান করে—সাহিত্যিকও হৃদযগ্রাহী ভাষায নানা কথা বলেন। কমলাকান্ত দুইজনেরই একই উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিযাছেন।

বল দেখি পাখি, কাকে—কমলাকান্তের মুখ দিযা বঙ্কিমচন্দ্র এই যে প্রশ্নটি কবিযাছেন ইহাই সাহিত্য-জিজ্ঞাসার শেষ প্রশ্ন। আমাদের সমস্ত সৌন্দর্য ও শিল্প-সাধনার লক্ষ্য যে কি তাহার শেষ মীমাংসা হয নাই। বঙ্কিমচন্দ্র পববর্তী অনুচ্ছেদে এই প্রশ্নটির একটি উত্তর দিতে চেষ্টা করিযাছেন।

যে সুন্দর তাকেই ডাকি ইত্যাদি—এই অংশে সাহিত্য সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের যথার্থ বোধটি ব্যক্ত হইয়াছে। অনেকে তাঁহাকে মুখ্যতঃ নীতিবাগীশ বলিযা মনে করেন। এই ধারণাটি ভ্রান্ত। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলিযাছেন, 'কাব্যের মূল উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে, কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য—অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি।' বস্তুতঃ, "কাব্যের রসাস্বাদন সমযে সেই মুহূর্তের জন্যও চিত্তশুদ্ধি ঘটে।" [মোহিতলাল]—বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন বলিযা তাঁহার রচনায় জীবনের রহস্য ও গূঢনীতি দেখা যায বটে, কিন্তু সৌন্দর্যের উপাসনাকেই তিনি কাব্যের একমাত্র না হইলেও প্রধান লক্ষ্য বলিযা স্বীকার করিযাছেন।

এই যে আশ্চর্য্য ব্রহ্মাণ্ড ইত্যাদি—বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-প্রকৃতি বিশ্বের অপূর্ব সৌন্দর্য ও রহস্য দেখিয়া আকুল হইযা উঠিযাছে। এই সুন্দর ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যিনি চরমতম সত্য, তাহার সন্ধানের জন্যও তাঁহার চিত্ত উৎসুক। এই অংশটি বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর অধ্যাত্মানুভূতির পরিচয দান করে। এখানে তিনি পাণ্ডিত্য পরিহার করিযা জীবনের গভীর সত্য অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

জানিযা ডাকি ইত্যাদি—মানুষের সকল সাধনা তাহার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে পরম পুরুষের অভিমুখী হইযাছে।

অষ্টম সংখ্যা

স্ত্রীলোকের রূপ

পরিচয়—কমলাকান্তের দপ্তরের এই সংখ্যাটির লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম অন্তরঙ্গ সাহিত্যসেবক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। 'চন্দ্রালোকে' রচনাটির মতোই ইহার মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবাদর্শ ও রচনাভঙ্গির নিকট সাদৃশ্য আছে। সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন তাহা স্মরণ করা যাইতে পারে—"বঙ্কিম তাঁহার চতুর্দিকে এমন এক প্রতিবেশমণ্ডলী রচনা করিয়াছিলেন, এমন একটি লেখক-সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন, যাঁহারা তাঁহার প্রতিভার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার ভাবোচ্ছ্বাস ও রচনারীতি সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করিতে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। অথচ এই অনুকরণের মধ্যে অক্ষমতার চিহ্ন নাই, ইহা মৌলিক গুণে সমৃদ্ধ। খুব সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে এইটুকুমাত্র প্রভেদ ধরা পড়ে যে, বঙ্কিমের শিষ্যদের উচ্ছ্বাসের মধ্যে একটু অসংযম ও আতিশয্যের লক্ষণ আবিষ্কার করা যায়; বঙ্কিমের ন্যায় নিখুঁত ভাবসংযম ও সূক্ষ্ম পরিমিতি-বোধ হয়তো ইঁহারা আয়ত্ত করিতে পারেন নাই।··· 'স্ত্রীলোকের রূপ' প্রবন্ধে অসাধারণ ভাষানৈপুণ্য ও শব্দসমৃদ্ধি থাকিলেও মোটের উপর বিদ্রূপাত্মক কৌতুকরস হইতে নারীর গুণ-মাহাত্ম্য-কীর্তনের সুর পরিবর্তনের মধ্যে যেন একটু ওস্তাদির অভাব—এই উভয় সুরের মধ্যে বিচ্ছেদ-রেখা বেমালুম ঢাকা পড়িয়া যায় নাই।"

কমলাকান্ত দেখিয়াছেন যে, অনেক রমণী রূপের গর্বে চারিদিককে তুচ্ছ বলিয়া মনে করে। তাহাদের রূপের প্রভাবে পুরুষের ধর্মকর্ম-বুদ্ধি সবই বিলুপ্ত হইয়া যায়। নারীর রূপের গৌরব বাড়াইবার জন্য পুরুষেরা বিশ্বশুদ্ধ জিনিসকে টানিয়া আনিয়া সেগুলিকে তুচ্ছ করিয়া দেন। তাঁহাদের মতে রূপসীর মুখের কাছে পূর্ণচন্দ্র ম্লান, তাহার ললাটের সিন্দুরবিন্দুর কাছে প্রভাতসূর্য নিষ্প্রভ, হাস্যের কাছে পদ্ম হার মানে, কণ্ঠহারের কাছে তারকা তুচ্ছ, শরীরের লাবণ্যের তুলনায় সিন্ধুর হিল্লোল সাধারণ এবং চোখের কাছে নীলকমল কিছুই নয়।

পুরুষেরা নারীর সৌন্দর্য বুঝাইবার জন্য অদ্ভুত উপমা কল্পনা করে। তাঁহাদের কল্পনায় নারীর চক্ষু খঞ্জনাদি, পক্ষী সফরী প্রমুখ মৎস্য, পদ্ম প্রমুখ উদ্ভিজ্জ দ্রব্য এবং আকাশের তারার মতো জড় পদার্থের সহিত তুলনীয়। চাঁদ কখনও নারীর মুখ কখনও পায়ের নখ। স্তনের তুলনা পুষ্পকোরক হইতে কৈলাস শিখর—দাড়িম্বাদিও এই সঙ্গে তুলনীয়। নারীর চলন জলচর পক্ষী হংসী ও স্থলচর পশু হস্তী দুইয়ের সহিতই তুলনা করা হইয়া থাকে।

কমলাকান্ত একসময় রমণীকুলের ভক্ত ছিলেন। তখন নারীর রূপের কাছে প্রকৃতির তাবৎ বস্তু তুচ্ছ বলিয়া মনে হইত। কিন্তু এখন দিব্যজ্ঞান হওয়ায় তিনি নারীর রূপজাল ছিঁড়িয়া পলাইয়াছেন এবং সে কেবল আফিমের প্রসাদে। তিনি এখন দুই চার কথা বলিতে চাহেন—অবশ্য তাহা শুনিযা স্ত্রীলোক তো বটেই অনেক পুরুষও তাঁহাকে পাগল বলিবেন। তবে যে নূতন কথা বলে তাহাকে সকলেই পাগল বলিয়া মনে করে—পৃথিবী ঘুরিতেছে বলায় গ্যালেলিওকেও ইতালীবাসীরা পাগল বলিয়াছিল।

বিদ্যাবুদ্ধিতে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া সকলে স্ত্রীলোককে রূপের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেন। কমলাকান্ত নারীর রূপকে পুরুষের রূপের তুলনায় হীন বলিয়া মনে করেন। এই উক্তি করার জন্য রমণীমণ্ডলী যে তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইবে এই ভয়ে তিনি সশঙ্ক—রমণী যে বহু অনর্থের সৃষ্টি করিতে পারে তাহা তাহার অজ্ঞাত নাই। কমলাকান্ত রমণীদের ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়া দিতে চাহেন। তাঁহার যুক্তি এই যে, যাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য আছে সে আর রূপ বাড়াইবার জন্য বাহ্য কোনো প্রক্রিয়া করে না। রমণীরা সৌন্দর্যে হীন বলিয়া রূপবৃদ্ধির জন্য নানা প্রয়াস করে, অঙ্গে অলংকারাদি ধারণ করে। অলংকার পরিয়া তাহারা আপনাদের রূপের খর্বতা ঢাকিয়া ফেলিতে চায়। সুতরাং তাহারা পুরুষের চেয়ে রূপে হীন। প্রকৃতির মধ্যেও পুরুষের সৌন্দর্যের আধিক্য দৃষ্ট হইবে। ময়ূরের কলাপ আছে, সিংহের কেশর আছে, কুকুটের চূড়া আছে—ময়ূরী, সিংহী বা কুকুটীর কিছুই নাই। 'বিদ্যাসুন্দর' আখ্যানে দেখা যায় যে, নারী অশেষ বিদ্যাবতী হইয়াও সুন্দর পুরুষের কাছে হার মানিয়াছে।

যৌবনেই সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা—কিন্তু নারীর যৌবন কয় দিনের? চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৎসরের পুরুষের যে সৌন্দর্য, কুড়ি-পঁচিশ বৎসরের ঊর্ধ্ব বয়স্কা নারীর সে সৌন্দর্য নাই। নারীর রূপ দেখিতে দেখিতে চলিয়া যায়। কমলাকান্ত প্রশ্ন করিয়াছেন যে, নারীর রূপ ক্ষণস্থায়ী বলিয়াই কি তাহার এত আদর। তাহা ভোগ করিয়া তৃপ্ত হইবার পূর্বেই শেষ হইয়া যায় বলিয়াই কি পুরুষ তাহার জন্য এত উন্মত্ত! অবশ্য এ পর্যন্ত পুরুষেই নারীর সৌন্দর্য সবচেয়ে বেশি করিয়া বর্ণনা করিয়াছে। নারীর প্রতি অনুরাগই ইহার কারণ, অনুরাগের অঞ্জন পরিয়া পুরুষ নারীকে সুন্দর দেখিয়াছে।

পাশ্চাত্ত্য কবিগণ প্রণয়দেবতাকে যে অন্ধ বলিয়াছেন ইহার মূলে সত্য আছে। প্রেমের প্রভাবে দোষ ঢাকা পড়িয়া যায়—গুণগুলি অসাধারণ বলিয়া প্রতীয়মান

হয়। এই জন্যই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরণের সৌন্দর্যের এত আদর। নারীগণ যদি মনের কথা মুখে বলিত তাহা হইলে বলিত যে, পুরুষের কাছে রমণীর রূপ কিছুই নয়। বস্তুতঃ, রমণী রমণীর রূপের পক্ষপাতী হয় না—পুরুষের রূপেরই পক্ষপাতিনী।

রূপের নামে রমণীর সর্বনাশ হইয়াছে। পুরুষ নারীর কেবল রূপই খোঁজে। কমলাকান্ত নারীর কেবল রূপের প্রশংসা শুনিতে চাহেন না। তিনি শুনিতে চাহেন যে, রমণীর আরও অনেক গুণ আছে। নারী—'মূর্তিমতী সহিষ্ণুতা, ভক্তি ও প্রীতি'। জননীর সন্তান স্নেহে, পীড়িত আত্মীয়বর্গের সেবাশুশ্রূষায়, পতিপুত্রের জন্য জীবন-বিসর্জনে, ধর্মের জন্য বাহ্যসুখ-বিসর্জনে নারীর গৌরব।

নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের কথা চিন্তা করিতে গেলে কমলাকান্তের মনে সহমরণোদ্যতা নারীর চিত্র ফুটিয়া উঠে। স্বামীর চরণ ধরিয়া সতী সানন্দে অগ্নিতে পুড়িতেছেন—তাঁহার বাহ্য বিকার নাই। তাঁহাদের এই আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়া কমলাকান্ত মনে করেন যে, আমাদের মধ্যেও মহত্ত্বের বীজ আছে। তাঁহাদের এত গুণ থাকিতে তুচ্ছ রূপের গৌরবে প্রয়োজন নাই।

পাঠপ্রসঙ্গে—রূপের গৌরবে—কমলাকান্ত ইতিপূর্বে স্ত্রালোকের রূপ সম্পর্কে 'মনুষ্যফল' রচনাতে বলিয়াছেন, 'ছোবড়া স্ত্রীলোকের রূপ। যেমন নারিকেলের বাহ্যিক অংশ, রূপও স্ত্রীলোকের বাহ্যিক অংশ। দুই বড় অসার; পরিত্যাগ করাই ভাল।'

অপমানিত করিয়া পাঠান—অর্থাৎ তাহাদের রূপে হীন বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন।

কমল-কুমুদে কীট পতঙ্গের অধিকার—ভ্রমর প্রভৃতি পতঙ্গ কমলের সহিত প্রণয় সম্পর্ক স্থাপন করে।

স্বর্ণকারের বিদ্যায় মন দিবেন—কারণ তাহা হইলে তারকামালা হইতে সুন্দরতর স্বর্ণহার গড়িতে পারিবেন।

পায়ের নখ—তুলনীয় 'কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা। চরণ নখরে পড়ে আছে কতগুলা।'

উচ্চ কৈলাসশিখর ইত্যাদি—নারীর স্তন তাহার কোমলতার জন্য কুসুমকোরকের সঙ্গে তুলনীয়। ইহাকে উচ্চতার জন্য পর্বতশৃঙ্গের সহিতও তুলনা করা হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া, সুন্দর গঠনের জন্য দাড়িম্ব, কদম্ব এমন কি বিশালতার জন্য করিকুম্ভের সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে। লেখক 'স্তন' শব্দটি ব্যক্ত না

করিয়া শালীনতার পরিচয় দিয়াছেন। এই শালীনতাবোধ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের অনেক লেখকের রচনায় দেখা যায়।

উভয়েই রমণীকুলচরণবিন্যাসের অনুকারী—হংস ও হস্তী দুলিয়া দুলিয়া অপেক্ষাকৃত ধীরমন্থর গতিতে গমন করে—রমণীদের সেইরূপ গতি মনোজ্ঞ বলিয়া মনে করা হয়। কবিরা তুলনামূলক কল্পনার আতিশয্যে হংস ও হস্তীকেই রমণীর গতির অনুকরণকারী বলিয়া মনে করেন।

গজেন্দ্রগামিনী মেয়ের ডাক—কৌতুকের সুরটি লক্ষ্যণীয়।

চীনদেশে পূজা পাইতে যাও—ইংরেজ প্রমুখ কয়েকটি পাশ্চাত্ত্য জাতি জোর করিয়া চীনদেশে আফিম চালাইতে চেষ্টা করে। ইহার ফলে চীনদেশ আফিমের বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। চীন সরকার আফিমের ব্যাপক প্রচলনের বিরোধী ছিলেন—ফলে, ইংরেজদের সহিত তাহার যুদ্ধ হয়। কমলাকান্ত আফিমের প্রতি কোনো বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না—সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে ইহার নৈতিক বা রাজনৈতিক দিকটি স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। রবীন্দ্রনাথ ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে 'চীনাম্যানের চিঠি' নামে একটি প্রবন্ধে এ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন।

কুটিল কটাক্ষে ইত্যাদি—কমলাকান্ত নারীর শক্তির যে পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে প্রাচীন কবিজনোক্তি এবং তাঁহার স্বকীয় রসিকতা মিশিয়াছে। কুটিল কটাক্ষে কালকূট-বর্ষণ, বেণী দ্বারা বন্ধন ও ভ্রূ-ধনুতে শর আরোপের কল্পনা প্রাচীন কবিদের রচনায় পাওয়া যায়। নথের ফাঁদে হস্তীর বন্ধন, নোলকের আঘাতে মানুষ খুন হওয়া বা চন্দ্রহারের চন্দ্রের আঘাতে হাত-পা ভাঙার কল্পনা মৌলিক।—লেখক এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের রসিকতার ভঙ্গিটি সুনিপুণভাবে পরিবেশন করিয়াছেন। এই গ্রন্থ ছাড়া অনেক উপন্যাসেও বঙ্কিমের অপরূপ কৌতুকের পরিচয় পাওয়া যায়।

কুসংস্কারাচ্ছন্ন পৌত্তলিক—যাহারা প্রতিমানির্মাণ করিয়া তাহাকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করে তাহাকেই পৌত্তলিক বলা হয়। যাহারা স্ত্রীজাতির প্রকৃত মূর্তির পরিচয় না পাইয়া তাহার বিকৃত মূর্তির উপাসনা করে কমলাকান্ত তাহাদের পৌত্তলিক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।—কবিকুল তাহার রূপময়ী মূর্তিকে পূজা করে।

যাহার হৃদয় ভাল নহে ইত্যাদি—এখানে হৃদয় অর্থে বাহ্যত বক্ষোভাগ বুঝাইলেও অন্তঃকরণের প্রতি ইঙ্গিত আছে। পুরুষেরা সাতনরী হার দেখিয়া আতঙ্কিত—পাছে ঐ হারের ফাঁসে আবদ্ধ হইতে হয়। শিশুরা স্তন্যপান করিতে গিয়া বক্ষের উপর লম্বমান সাতনরী হার দেখিয়া ভীত হয়।

উচ্চ শ্রেণীর জীবগণের মধ্যে—কমলাকান্ত ময়ূর, সিংহ, বৃষভ ও কুক্কুটকে উচ্চশ্রেণীর জীব বলিয়া মনে করেন। তিনি মানুষকেও এইরূপ উচ্চশ্রেণীর জীব-গুলির পর্যায়ভুক্ত করিতে চাহিয়াছেন।

স্ত্রীলোক যতই বিদ্যাবতী ইত্যাদি—বিদ্যাসুন্দরের নায়িকা বিদ্যা বিদ্যার অধিকারিণী ছিল—কিন্তু সে নায়ক সুন্দরের সৌন্দর্যে ও বুদ্ধিতে মজিয়াছিল কমলাকান্ত এখানে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীটিকে রূপক-রূপে গ্রহণ করিয়া পুরুষের সৌন্দর্য ও বুদ্ধির নিকট নারীর পরাজয়ের তত্ত্বটি স্থাপন করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

কুড়ি হইলেই তোমরা বুড়ী হইলে—অধুনা অনেকে বলেন যে, বাংলাদেশে অল্প বয়সে বিবাহিতা ও পুত্রকন্যাদি-সমন্বিতা রমণীর স্বাস্থ্য অযত্নে এবং সংসারের অতিরিক্ত চাপে খুব শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া পড়ে।

বেশ ভূষারূপ তেঁতুল ইত্যাদি—অর্থাৎ স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য যখন আর থাকে না তখন বেশভূষা ও প্রসাধনের প্রাচুর্যে সে দর্শনযোগ্য হয়।

এইরূপ ক্ষণস্থায়ী ইত্যাদি—যাহা অল্পক্ষণস্থায়ী, যাহা দুর্লভ তাহার জন্য মানুষের একটি সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকে। কমলাকান্ত অনুমান করিতেছেন যে, স্ত্রীলোকের রূপ অচিরস্থায়ী বলিয়া পুরুষ তাহা ভোগ করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া ওঠে।

অপর কারণেও—পুরুষেরা স্ত্রীজাতির প্রতি অনুরাগপরায়ণ বলিয়া তাহাদের রূপের অত্যধিক প্রশংসা করে।

অন্ধ বলিয়াছেন—বাস্তবিকপক্ষে পাত্র-অপাত্র বিবেচনা করে না—এ সম্পর্কে সে একেবারে অন্ধ। সুতরাং প্রণয়দেবতা কিউপিডকে অন্ধ বলিয়া কেহ কেহ কল্পনা করিয়াছেন।

বাঙ্গালা দেশে—কমলাকান্ত এখানে পূর্ববঙ্গের প্রতি কটাক্ষ করিতেছেন।

পরস্পরের সৌন্দর্য স্বীকার করিতে চাহেন না—কমলাকান্ত এখানে অনেক নারীর স্বাভাবিক দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। অনেক স্ত্রীলোকই অপরকে সুন্দরী বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না।

ইহাতেই পরিবার মধ্যে স্ত্রীলোকের দাসীত্ব—এই সিদ্ধান্তটি যুক্তি-পরম্পরায় আসে নাই। রূপকে স্ত্রীলোকের দাসীত্বের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিবার উপযুক্ত যুক্তি লেখক দেন নাই।

তাঁহারা মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতা, ভক্তি ও প্রীতি—নারীসম্পর্কে ইহাই উনবিংশ শতাব্দীর আদর্শবাদীদের মনোভাব। নারীর সেবাপরায়ণা মূর্তিই তাঁহাদের চোখে

আদর্শ বলিয়া মনে হইয়াছিল। তাঁহারা ইহাকেই ভারত নারীর প্রকৃত আদর্শ মূর্তি বলিয়া মনে করিতেন।

আমি যখন উৎকৃষ্টা যোষিদ্বর্গের বিষযে ইত্যাদি—বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং এই মত পোষণ করিতেন কি না সেবিষযে সন্দেহ আছে। সহমরণেই নারীত্বের শ্রেষ্ঠ গৌরব—এই প্রতিক্রিয়াশীল মত বঙ্কিমচন্দ্র পোষণ করিতেন বলিয়া মনে হয না। এই অংশটিতে কমলাকান্তের স্বাভাবিক রসিকতা অন্তর্হিত হইয়া একটা গুরুগম্ভীর ভাব আসিয়া গিয়াছে।

তখন আমার বিশ্বাস হয় যে ইত্যাদি—ইহা জীবনযুদ্ধে পরাজিত জাতির আশাবাদ। পরবর্তী কালে 'মাভৈঃ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ কথা বলিয়াছেন—তবে তাহার সুর স্বতন্ত্র।

নবম সংখ্যা

ফুলের বিবাহ

পরিচয়—কমলাকান্তের দপ্তরের কয়েকটি সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের খেয়ালী কল্পনার (fancy) পরিচয় পাওয়া যায়। সেগুলির মধ্যে কয়েকটিতে কৌতুকরসের আবরণে ব্যঙ্গ পরিবেশন করা হইয়াছে। কিন্তু এই সংখ্যাটি স্বতন্ত্র জাতীয়। এই রচনাটিতে কটাক্ষ হয়তো যৎসামান্য আছে, কিন্তু লিরিক রসই প্রধান হইযা উঠিয়া সব কিছুকে ঢাকিয়া দিযাছে। রচনাটির ঘটনা যৎসামান্য। একদিন বৈশাখ মাস অপরাহ্নে কমলাকান্ত নসীবাবুর বাগান হইতে কয়েকটি ফুল তুলিয়াছিলেন; নসীবাবুর কন্যা কুসুমলতা সেই ফুলগুলি লইয়া মালা গাঁথিয়াছে। এই সাধারণ ঘটনাটির অন্তরালে একটি মধুর দৃশ্য কল্পনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র কল্পনার সরসতার পরিচয দিয়াছেন। কমলাকান্তের দপ্তর ছাড়াও অন্যত্র এইরূপ দুই একটি লিরিকধর্মী বচনার পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুতঃ, বঙ্কিমচন্দ্রের কবিচিত্ত ক্লাসিকধর্মী হইলেও তাহার উপরে যে লিরিকের আস্তরণ ছিল তাহার পরিচয় বহুস্থলে ব্যক্ত হইয়াছে।

এখানে কমলাকান্ত মল্লিকাফুলের বিবাহ দিয়াছেন। বৈশাখ মাস। গাছে যে মল্লিকাফুল ফুটিতেছে সেগুলি এক একটি পাত্রী। কন্যাকর্তা গাছটি উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করিতেছে—স্থলপদ্ম, গন্ধরাজ—ইহাদের সহিত নানাকারণে সম্বন্ধ স্থির করা গেল না। ঘটক ভ্রমর কন্যা দেখিতে আসিল। মল্লিকা প্রথমে লজ্জায় মুখ

দেখাইতে চাহিল না, পরে সন্ধ্যা-ঠাকুরাণীর অনুরোধে মুখ দেখাইল। ঘটক কন্যা পছন্দ করিয়া কন্যাকর্তাকে বলিল যে, পাত্র গোলাব। সম্বন্ধ স্থির করিয়া সে গোলাবের বাড়ি খবর দিতে গেল; গোলাব কন্যার বয়স জিজ্ঞাসা করিলে ভ্রমর বলিল যে, সে দুই এক দিনেই ফুটিবে।

গোধূলি লগ্নে বিবাহের উৎসবে সকলে যাত্রা করিল। জবাগোষ্ঠী, করবী, বেলা, চাঁপা, গন্ধরাজ প্রভৃতি সব ফুল আসিল—সেঁউতি নীতবর হইল। একপাল পিপীলিকাও আসিয়াছিল। কমলাকান্তেরও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। তিনি গিয়া দেখিলেন যে, বাতাস বাহক হইবে বলিয়াছিল, কিন্তু সে কোথায় লুকাইয়াছে। সকলে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে দেখিয়া তিনি নিজেই বর ও বরযাত্রদের লইয়া মল্লিকাপুরে গেলেন। সেখানে যূথী, রজনীগন্ধা, বকুল, মালতী প্রভৃতি স্ত্রী-আচার করিল, নসী-বাবুর কন্যা কুসুমলতা স্থচ-স্থতা লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

বিবাহ হইয়া গেলে কমলাকান্ত বাসরঘরে টগর, রঙ্গন প্রভৃতির রসিকতা ও হাসি দেখিতেছিলেন, এমন সময় কুসুম তাঁহাকে ডাকিলে চমকাইয়া দেখিলেন যে, কোথাও কিছু নাই। কুসুমের প্রশ্নের উত্তরে তিনি ফুলের বিবাহ দিতেছেন বলিলে কুসুম দেখাইল যে, সে ফুলের বিবাহ দিয়া মালা গাঁথিয়াছে।

পাঠ প্রসঙ্গে—ভবিষ্যৎ বরকন্যাদিগের শিক্ষার্থ—বঙ্কিমচন্দ্র এখানে ঠিক শিক্ষাপ্রদ কিছু বলেন নাই। তিনি বিবাহের প্রসঙ্গে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা ভবিষ্যৎ বরকন্যাদের কিছুটা কৌতুক উদ্রেক করিতে পারে এইমাত্র। এই রচনাটি বঙ্কিমচন্দ্রের গীতিরস-প্রীতিরই পরিচয় দান করে—ইহার মধ্যে শিক্ষাদানের দায় নাই।

কন্যার পিতা বড়লোক নহে ইত্যাদি—ফুলের বিবাহ দিতে গিয়া কমলাকান্ত বাংলার সমাজের রীতিনীতি প্রভৃতির দিকেও কটাক্ষ করিয়াছেন। বাংলাদেশে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা ধনী না হইলে এবং তাহার কন্যার সংখ্যা বেশি হইলে বিশেষ ভাবনার কথা। বঙ্কিমচন্দ্র যখন এই প্রবন্ধটি রচনা করিয়াছিলেন তখন পণপ্রথার প্রচলন পুরামাত্রায় ছিল।

বড় উঁচু—কমলাকান্ত এখানে উঁচু কুলের কথা বলিতে চাহিয়াছেন। বিবাহের সময় কৌলীন্যসম্পন্ন লোকেরা বা অন্য উচ্চ কুলজাত পাত্ররা অপেক্ষাকৃত নিম্নবংশে বিবাহ করিতে চাহিত না।

ভ্রমররাজ ঘটক—ভ্রমরের ফুলে ফুলে গতি। কমলাকান্ত সেইজন্যই তাহাকে ঘটকরূপে কল্পনা করিয়াছেন।

লজ্জাশীলা কন্যা কিছুতেই ঘোমটা খোলে না—কুমারী বাঙালী মেয়ে ঘোমটা দেয় না—তবে বাংলার বাহিরে অন্যত্র কুমারীর ঘোমটা দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। বঙ্কিমচন্দ্র মল্লিকার কুঁড়ির অর্ধস্ফুটতার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া তাহার ঘোমটা দেওয়ার কল্পনা করিয়াছেন।

সন্ধ্যা-ঠাকুরাণী দিদি আসিয়া ইত্যাদি—সন্ধ্যা হইলে মল্লিকা ফুলটি ফুটিল। কমলাকান্ত কল্পনা করিয়াছেন যে, সন্ধ্যা মুখ দেখাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে বলিয়াই মল্লিকা মুখ খুলিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র সুন্দরভাবে প্রকৃতির ঘটনাবলী তাঁহার কল্পনার সঙ্গে মিলাইয়াছেন। ইহা খেয়ালী কল্পনার নিপুণতার নিদর্শন।

ঘরে মধু কত—বিবাহের সম্বন্ধ করিবার সময় কন্যাপক্ষের অর্থব্যয় করিবার সামর্থ্য সম্পর্কে বরপক্ষ নানা প্রশ্ন করেন। কমলাকান্ত সামাজিক সেই রীতিটি অনুসারেই কন্যাপক্ষের ঘরে কত মধু সে প্রশ্ন করাইয়াছেন।

গোলাবলাল গঙ্গোপাধ্যায়—কমলাকান্ত জাতি পদবী প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন।

রাতকাণা বলিয়া ইত্যাদি—ভ্রমর আর মৌমাছি একই। ভ্রমর ঘটক হওযায তাহার পক্ষে সানাইয়ের বায়না লওয়া ও রাতকানা বলিয়া বিবাহে যাইতে না পারার কল্পনাটি সঙ্গত হয় নাই। মৌমাছি কৃষ্ণপক্ষের রাত্রে বাহির হয না।

খাদ্যোতেরা ঝাড় ধরিল—এ অনুচ্ছেদটিতে উনবিংশ শতকের একটি ধনীপুত্রের বিবাহের শোভাযাত্রার বর্ণনা পাওয়া যায়। জোনাকিরা ইতস্ততঃ আলো জ্বালিতে জ্বালিতে চলিয়াছে—কমলাকান্ত মনে করিয়াছেন যে, তাহারা ঝাড় বহিয়া লইয়া চলিয়াছে।

রাজকুমার স্থলপদ্ম দিবাবসানে অসুস্থকায়—সূর্য অস্ত যাইবার পর পদ্ম ম্লান হইয়া পড়ে—কমলাকান্ত তাহাকে অসুস্থ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন।

জরদ—হলদে রঙের।

সেকালে রাজাদের মত ইত্যাদি—রাজারা হাতী, ঘোড়া, রথ প্রভৃতি উচ্চ আসনে চড়িয়া যাইত। করবী উচ্চ শাখায় উচ্চ আসনে চড়িয়াছে এই কল্পনা করা হইয়াছে।

বেলা ব্রাণ্ডি টানিয়া আসিয়াছিল—বেলফুলের গন্ধ উগ্র বলিয়া কমলাকান্ত, সে ব্রাণ্ডি খাইয়া আসিয়াছে বলিয়াছেন। এই উক্তিটি ধনীমহলে সুরাপানের প্রচলনের প্রতি কটাক্ষ।

এক পাল পিঁপড়া ইত্যাদি—অনেক গাছে কাঠপিঁপড়া থাকে—কমলাকান্ত সে-

গুলিকে মোসাহেব বলিয়াছেন। মোসাহেবরা প্রভু ছাড়া অপরকে আঘাত করে—পিঁপড়াও দংশন করিতে ছাড়ে না। বিবাহের সময় আত্মীয়-বন্ধু সকলকে আমন্ত্রণ করিবার রীতি আছে। সুতরাং বিবাহের বরযাত্র হইবার জন্য অনভিপ্রেত দুই চারিজনও জুটিয়া যায়।

হু-হুম করিয়া ইত্যাদি—বাতাসের শব্দ পাল্কি-বাহকদের শব্দের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। বাতাসে গন্ধ বহিয়া লইয়া যায়—এইজন্যই সে বাহক হইবে এই স্থির হইয়াছিল। কিন্তু সন্ধ্যার সময় বাতাস হঠাৎ পড়িয়া যাওয়ায় সকলে স্থিরভাবে থাকিতে বাধ্য হইয়াছে।

বর বরযাত্র সকলকে তুলিয়া ইত্যাদি—কমলাকান্ত বাস্তবিকই গাছ হইতে ফুল তুলিয়াছেন।

দেখিলাম পাতায় পাতায় জড়াজড়ি ইত্যাদি—বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনার সরসতা লক্ষ্যণীয়। ভাবগম্ভীর রচনাতেও যেমন, এইরূপ অপেক্ষাকৃত লঘু ও মাধুর্যপূর্ণ রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত।

কুসুমলতা সূচ সূতা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে—বাস্তবিকপক্ষে কুসুম ফুলগুলি লইয়া মালা গাঁথিবে। কমলাকান্ত কল্পনা করিয়াছেন যে, সে বর ও কন্যার বন্ধনকে দৃঢ়তর করিবার জন্য সূচ-সূতা লইয়াছে। সম্ভবতঃ কুসুমই বিবাহের পুরোহিত হইয়াছে।

প্রাচীনা ঠাকুরাণী দিদি টগর সাদাপ্রাণে ইত্যাদি—কমলাকান্ত সুন্দরভাবে ফুলের রূপের সহিত তাহার প্রকৃতির সাদৃশ্য কল্পনা করিয়াছেন।

মনে করিলাম, সংসার অনিত্যই বটে ইত্যাদি—কমলাকান্ত এখানে সহসা দার্শনিকতার অবতারণা করিয়াছেন। এই দার্শনিকতার মধ্যে কৌতুকের ছদ্মবেশ থাকিলেও সত্যানুসন্ধানের প্রয়াস আছে, বিশ্বের সব কিছুই স্মৃতির অতলে ডুবিয়া যায়—অতীতের মধ্যে লুপ্ত হইয়া যায়। কেবলমাত্র কোনো বিষয়ের ভোগ থাকে অর্থাৎ আমার সুখ হইয়াছিল বা দুঃখ হইয়াছিল এই বোধটি থাকে বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু কমলাকান্ত বলিতেছেন যে, ভোগ্য বস্তু লয় পাইয়া যায়, সুতরাং ভোগও থাকে না। কেবল স্মৃতি থাকে কিনা তিনি সেই প্রশ্নে কতকটা আত্মগতভাবে করিয়াছেন।

দশম সংখ্যা

বড়বাজার

পরিচয়—কমলাকান্ত কয়েকটি সংখ্যায় প্রতীকের সহায়তা অবলম্বন করিয়া মানব-সমাজের কয়েকটি বিভাগের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। এইগুলির মধ্যে 'মনুষ্যফল' এবং 'বড়বাজার' এই দুইটি রচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেবল কমলাকান্তের দপ্তরেই নয়, 'লোকরহস্যের' অন্তর্গত কোনো কোনো রচনার মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্র অনুরূপ কল্পনার পরিচয় দিয়াছেন। তবে এখানে কমলাকান্তের আফিমের সহায়তায় তাঁহার কল্পনা একেবারে নিরঙ্কুশ হইতে পারিয়াছে।

কমলাকান্ত যে বিশ্বসংসারকে বড়বাজার অর্থাৎ আর্থিক বিনিময়ের কেন্দ্ররূপে কল্পনা করিয়াছেন ইহার মূলে আছে প্রসন্ন গোয়ালিনীর সহিত তাঁহার মনোমালিন্য। প্রসন্ন কমলাকান্তকে দুধ খাওয়াইত, কমলাকান্তের ধারণা ছিল যে, প্রসন্ন তাহার নিজের পারলৌকিক সদ্‌গতির জন্য বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দুধ খাওয়াইত। তিনি প্রসন্নর সদ্‌গতি প্রার্থনা করিতেন, কিন্তু একদিন প্রসন্ন দুধের দাম চাওয়ায় তাঁহার সেই ধারণা আমূল পরিবর্তিত হইয়া গেল তিনি বুঝিলেন যে, পৃথিবীতে ভক্তি, প্রীতি প্রভৃতি সবই মিথ্যা—সকলেই স্বার্থপর। এ সংসারে সকল জিনিসই মূল্য দিয়া কিনিতে হয়—দুধ, দই হইতে আরম্ভ করিয়া, বিদ্যা, ধর্ম, যশ, মান এমন কি বিষের মতো জিনিসও অর্থের বিনিময়ে পাইতে হয়। সুতরাং বিশ্বসংসার একটি বাজার—সকলেই কিছু-না-কিছু বেচিতে চায়। কমলাকান্তের মতে 'সস্তা খরিদের অবিরত চেষ্টাকে মনুষ্যজীবন বলে।'

আফিমের মাত্রা চড়াইতেই কমলাকান্ত ভবের বাজার প্রত্যক্ষ করিলেন। প্রথমেই তিনি রূপের দোকানে গেলেন—সেটিকে তাঁহার মেছোহাটা বলিয়া মনে হইল। পৃথিবীর রূপসীরা মাছরূপে ঝুড়ি-চুপড়ির মধ্যে ঢুকিয়াছে এবং মেছনীরা মাছের কুল, ধন বা রূপের গর্ব করিয়া খরিদ্দার ডাকিতেছে। এই মাছ কিনিবার জন্য কমলাকান্ত পুরোহিত নামক দালালের সহায়তা গ্রহণ করিলেন, কিন্তু শুনিলেন যে, ইহার দর জীবনসর্বস্ব এবং ইহা দুই চারিদিন পরেই পচিয়া যাইবে। সুতরাং তিনি রূপের মেছোহাটা হইতে পলায়ন করিলেন।

কমলাকান্ত তখন বিদ্যার বাজারে প্রবেশ করিলেন। সেখানে কয়েকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঝুনা নারিকেল বেচিতেছেন। তাঁহারা ন্যায়শাস্ত্রের নানা প্রমাণ-প্রয়োগের সহায়তা লইয়া নারিকেলের গুণগান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বাগ্‌বাহুল্য

দেখিয়া কমলাকান্ত দয়ার্দ্রচিত্তে নারিকেল কী করিয়া ছোলা হইবে তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিলেন যে, এই নারিকেলের ছোবড়া কামড়াইয়া ছিঁড়িতে হইবে। শুনিয়া কমলাকান্ত ভঙ্গ দিলেন।

পাশেই প্রয়োগ বিজ্ঞানের দোকান—বিক্রেতা কয়েকজন সাহেব। তাঁহারা ঝুনা নারিকেল, বাদাম, পেস্তা, সুপারি প্রভৃতি বিক্রয় করিতেছেন। তাঁহাদের বিক্রেয় বস্তুগুলিতে দন্তস্ফুট করিতে গিয়া ভারতীয় যুবকগণের যে দন্তহানি ঘটিবে তাহা তাঁহাদের বিজ্ঞাপনেই প্রকাশ। তাঁহারা বিদ্যার কাঠিন্য পরীক্ষার জন্য মস্তক চাহেন। তাঁহারা সহসা ব্রাহ্মণদের ঝুনা নারিকেলের দোকানে লাঠি হাতে গিয়া পড়িলে ব্রাহ্মণেরা পলায়ন করিলে তাঁহারা সেই নারিকেলগুলি বিলাতী অস্ত্রে ছেদন করিয়া খাইতে লাগিলেন। কমলাকান্ত ইহার তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা জানাইলেন যে, ইহাই এশিয়া সম্পর্কিত গবেষণা। স্বদেহে এইরূপ গবেষণার আশঙ্কায় কমলাকান্ত সেখান হইতে পলায়ন করিলেন।

ইহার পর তিনি সাহিত্যের বাজারে গেলেন। সেখানে দেখিলেন যে, বাল্মীকিপ্রমুখ ঋষি সংস্কৃত সাহিত্যরূপ অমৃত ফল বেচিতেছেন। পীচ, পেয়ারা, আঙ্গুর প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যরূপ ফলও বিক্রয় হইতেছে। একটি দোকানে শিশু ও নারীগণের ভিড়—সেটি কিসের দোকান জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে, সেটি বাংলা সাহিত্যের দোকান—সেখানে যাহারা বিক্রেতা তাহারাই ক্রেতা। তিনি দেখিলেন যে, খবরের কাগজে জড়ানো কতকগুলি অপক্ব কদলী বিক্রয় হইতেছে।

কমলাকান্ত কলুপটিতে গিয়া দেখিলেন যে, উমেদার ও মোসাহেবেরা কলু সাজিয়া বসিয়া আছে। চাকরি বা অন্য কোনো প্রসাদের আশায় তাহারা পায়ে তেল দিতেছে। পাছে আফিমের প্রার্থনায় পায়ে তেল দেয় এই আশঙ্কায় কমলাকান্ত পলায়ন করিলেন।

ইহার পর কমলাকান্ত যশের ময়রাপটিতে প্রবেশ করিলেন। সেখানে সংবাদপত্র-লেখকরা ময়রা সাজিয়া গুড়েসন্দেশরূপ দুর্গন্ধ যশ গছাইয়া দিয়া মূল্য আদায়ের চেষ্টা করিতেছে। কেহ বা বিনা গুড়েই কেবল প্রসাদের বিনিময়ে যশ বিতরণ করিতেছে। রাজপুরুষরা চাঁদা, সেলাম, খোসামোদ, রাস্তাঘাট প্রভৃতি মূল্যের বিনিময়ে রায় বাহাদুর, রাজা বাহাদুর প্রভৃতি খেতাব বিক্রয় করিতেছেন—তবে বিক্রয়ের কোনো সুবন্দোবস্ত নাই, কেহ বা অল্প মূল্যে বেশি পাইতেছে, কেহ বা সর্বস্ব দিয়াও কিছু পাইতেছে না। সর্বত্রই এইরূপ পচামাল বিক্রয় হইতেছে।

কেবল একটি দোকান অন্ধকার, সেখানে দোকানদার নাই—কেবল একটি ফলক পাঠ করিয়া তিনি জানিলেন যে, কাল সেখানে জীবনমূল্যে অনন্ত যশ বিক্রয় করিতেছে।—প্রাণ বাঁচাইলে অনেক যশ হইবে মনে করিয়া তিনি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

কমলাকান্ত বিচারের বাজারে গিয়া দেখিলেন যে, সেখানে ছোটো বড়ো কসাই টুপি বা শামলা মাথায় দিয়া ছুরি হাতে লইয়া গরু কাটিতেছে। মহিষাদি বড়ো পশু শিং নাড়িয়া ছুটিয়া পলাইতেছে—ছোটো পশুরাই ধরা পড়িতেছে। একটি কসাই তাঁহাকে গরু বলিয়া ধরিতে গেলে তিনি পলায়ন করিলেন।

আর বড়বাজারে বেড়াইবার সাধ না থাকিলেও কমলাকান্ত প্রসন্নর উপর রাগ ছিল বলিয়া দইয়েহাটা দেখিতে গেলেন এবং দেখিলেন যে, কমলাকান্ত চক্রবর্তী নামক গোয়ালা দপ্তরের পচা ঘোল নিজ খাইতেছে, অপরকেও খাওয়াইতেছে। চমক ভাঙিয়া যাইতে তিনি দেখিলেন যে, প্রসন্ন তাঁহাকে এক হাঁড়ি ঘোল আনিয়া খাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছে।

পাঠ প্রসঙ্গে—বড়বাজার চিরদিনই অর্থনৈতিক লেনদেনের জন্য প্রসিদ্ধ। কমলাকান্তের দৃষ্টি দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র পৃথিবীকে লেনদেনের একটা ক্ষেত্ররূপে দেখিয়াছেন। প্রত্যেকে কিছু-না-কিছু চায়—কিন্তু কিছুই বিনা মূল্যে পাওয়া যায় না। সুতরাং কেনাবেচার মতো একটা ব্যাপার চলিতে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র এই রচনাটিতে এই কেনাবেচা লইয়া তীব্র কটাক্ষ করেন নাই—বিশুদ্ধ কমলাকান্তীয় ভঙ্গিতে স্মিত কৌতুকরস সৃষ্টি করিয়াছেন মাত্র। অবশ্য রচনাটির মধ্যে ব্যঙ্গই প্রধান উপজীব্য বিষয়—কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ব্যঙ্গকে শাণিত না করিয়া কৌতুকরসে সিক্ত করিয়াছেন। সমালোচনাবৃত্তিও এখানে অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে। বর্ণনার সরসতা ও কল্পনার অভিনবত্বই এখানে প্রধান আকর্ষণ।

পুণ্যরূপ মৃগ ধরিবার জন্য ইত্যাদি—সংসারে এমন কয়েকজন পুণ্যলোভাতুর আছেন যাঁহারা কোনো মতে শাস্ত্রনির্দিষ্ট উপায়ে পুণ্য সঞ্চয় করিতে চেষ্টিত। ব্রাহ্মণভোজন বা অনুরূপ সহজসাধ্য উপায়ে পুণ্য অর্জনের প্রয়াস তাঁহারা করিয়া থাকেন। উত্তীর্ণযৌবনা প্রৌঢ়াদের মধ্যেই সচরাচর এই ধরণের পুণ্যসঞ্চয়ের প্রচেষ্টা দেখা যায়।—রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে এইরূপ সস্তায় ধর্মসাধনার দ্বারা পারলৌকিক কোম্পানীর কাগজ তৈয়ারির আদর্শকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিয়াছেন। বঙ্কিমের কটাক্ষের মধ্যে তীব্রতা নাই। হিন্দুধর্মের অনেক বিষয় সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিষ্ণুতা ছিল।

হায় মনুষ্যজাতির কি হইবে ইত্যাদি—প্রসন্নর ব্যবহারই কমলাকান্তকে ব্যথিত করিয়াছে। কিন্তু তিনি তাহার ব্যবহারকেই বিশ্বশুদ্ধ সকলের ব্যবহারের প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়া মানব জাতির লোভের কথা স্মরণ করিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। প্রসন্নর গোরু-চুরি যাইবার প্রসঙ্গটি কৌতুকাবহ হইয়াছে।

গোরু গোরুর নিজের ইত্যাদি—কমলাকান্তের যুক্তি তাঁহার স্বকীয় কল্পনার পরিচায়ক। কমলাকান্ত মঙ্গলা গাইকে প্রসন্নর বলিয়া স্বীকার করেন নাই। জুনিয়ার খোসনবীশ-দৃষ্ট কমলাকান্তের জবানবন্দীতে দেখা যায় যে, কমলাকান্ত বিচারালয়েও অনুরূপ যুক্তি দেখাইয়াছেন।

বিদ্যাবুদ্ধিও মূল্য দিয়া কিনিতে হয়—এই স্থান হইতে রচনাটির মূল সূত্রটি দেখা দিয়াছে। বিদ্যা অর্জন করিতে গেলে গুরুকে বা বিদ্যালয়কে অর্থমূল্য দিতে হয়। বুদ্ধি অর্জন করিতে হইলে যে কী মূল্য দিতে হয় কমলাকান্ত তাহা ভাষায় প্রকাশ করেন নাই।

হিন্দুরা সচরাচর মূল্য দিয়া ধর্ম কিনিয়া থাকেন—দেবতা-ব্রাহ্মণকে অর্থদান ধর্ম অর্জনের উপায় বলিয়া কল্পিত হয়। কোনো কোনো ব্রতও আবার কাঞ্চনমূল্যে পালিত হয়। স্মার্ত বিধানে নানা বিষয়ে কাঞ্চনমূল্য ধরিয়া দিবার ব্যবস্থাও আছে!—বাস্তবিকপক্ষে ধর্ম অর্থ দ্বারা ক্রয় করিবার বস্তু নয়—তাহা জীবন দ্বারা সাধ্য। অর্থ দিয়া ধর্ম অর্জনের ব্যবস্থাকে কমলাকান্ত কটাক্ষ করিয়াছেন।

যশ মান প্রভৃতি অল্প মূল্যেই ক্রীত হইয়া থাকে—কমলাকান্ত বড়বাজারে যশের লেনদেনের একটি চিত্রও অঙ্কন করিয়াছেন। ইহা অল্পায়াসলভ্য ক্ষণস্থায়ী যশ—ইহা নিতান্তই অসার।

খরিদ্দারের চোখে ধূলা দিয়া ইত্যাদি—সকলেই অপরকে ঠকাইয়া নিজে লাভবান হইতে চায়। 'উদর-দর্শন' সংখ্যাটিতে কমলাকান্ত দোকানদারকে প্রতারক বলিয়াছেন কারণ, 'দোকানদার জিনিস বেচিয়া আবার মূল্য চাহিতে থাকে। মূল্যদাতা মাত্রেরই মত যে, তিনি ক্রয়কালীন প্রতারিত হইয়াছেন।'

সস্তা খরিদের অবিরত চেষ্টাকে মনুষ্যজীবন বলে—কমলাকান্ত মানব-জীবনের এই যে সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন, ইহা কৌতুককর হইলেও ইহার মূলে জীবনের অভিজ্ঞতা বর্তমান। সাধারণ মানুষ ফাঁকি দিয়া জীবনে সিদ্ধিলাভ করিতে চেষ্টা করে। শ্রম করিয়া জীবনে সিদ্ধিলাভ করিতে চায় এমন লোকের সংখ্যা বিরল। উক্তিটির মধ্যে যে কৌতুকের ভাব আছে তাহা তিক্ততার সুর চাপা দিয়াছে।

ানব-জীবনের ব্যবসায়িকতার জন্য গোপন ক্ষোভ থাকিলেও বঙ্কিমচন্দ্র এখানে তাহা ্যক্ত করেন নাই।

রূপের দোকানে গেলাম—কমলাকান্ত রূপসীর সন্ধানে রূপের দোকানে গিয়াছেন। কমলাকান্ত অবিবাহিত, সুতরাং তাঁহার বিবাহার্থ রূপবতীর প্রয়োজন। —রূপের বাজারকে মেছোহাটা কল্পনা বার্ণাড শ'র বিরসতা (anti-romanticism)-কও হার মানাইযাছে। তবে বঙ্কিমচন্দ্র অতি নিপুণভাবে কল্পনার সূত্রটি বয়ন করিযাছেন, কোথাও বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি ঘটে নাই।

খরিদ্দারের জন্য লেজ আছড়াইযা ধড়ফড় করিতেছে—বঙ্কিমচন্দ্র যে সময় লেখনী ধারণ করিযাছিলেন সেকালে এবং কতক পরিমাণে একালেও বাঙালীর ঘরে কন্যার বিবাহ একটা সমস্যা। মেযে বড় হইলে তাহাকে পাত্রস্থা করিবার জন্য যে আযোজন চলিতে থাকে, তাহাতে ধড়ফড় করার কল্পনা অনুপযুক্ত হয় নাই।

কুল পুকুরের সস্তা মাছ—কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যার জন্য কুলীন পাত্র জোটা ভার ছিল। কুল-গৌরব বজায রাখিবার জন্য অযোগ্য পাত্রেই অনেক সময় কন্যা সমর্পণ করা হইত। গঙ্গাযাত্রীর সহিত কন্যার বিবাহের প্রবাদ স্মরণীয়।

ধন-সাগরের মিঠা মাছ ইত্যাদি—ধনীর কন্যার সহিত বিবাহের ফলের ইঙ্গিতটি মনোজ্ঞ হইযাছে। পত্নীকে সর্বস্ব বলিয়া জ্ঞান করা, লাঞ্ছনা এড়াইবার জন্য শাশুড়ীর শরণাপন্ন হওযা প্রভৃতি লেখকের সাংসারিক অভিজ্ঞতার ফল।

সরম পুঁটি ইত্যাদি—এখানে সাধারণ বঙ্গললনার কথা বলা হইযাছে। বঙ্গবধূ গৃহস্থালীর সব কাজেই আগাইযা যায—সে-ই গৃহস্থের সাংসারিক সুখের মূল।

কাদা ছেঁচে চাঁদা—অপ্রত্যাশিত স্থানে জাতা রূপসী বা গুণবতী।

দর "জীবন-সর্বস্ব"—পত্নীকে জীবনতুল্য কল্পনা নিছক পাশ্চাত্ত্য আদর্শে করা হয নাই। কমলাকান্ত তৎকালীন জীবন হইতেই এই কল্পনাটি গ্রহণ করিযাছেন। প্রায সকল পুরুষই পত্নীকে জীবনের সর্বস্ব বলিযা মনে করে। সুতরাং কমলাকান্ত পত্নীকে জীবনমূল্যে ক্রযের কথা বলিযাছেন।

পচিয়া গন্ধ হইবে—এখানে রূপের প্রতিই কটাক্ষ করা হইযাছে।

ঝুনা নারিকেলের দোকান—সংস্কৃতশাস্ত্র দুষ্প্রবেশ্য। তাহাতে দন্তস্ফুট করা কঠিন। সেইজন্য তাহাকে ঝুনা নারিকেলরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এ যুগে সংস্কৃতের প্রাণশক্তি কমিযা আসায় তাহা প্রায় পুরাপুরিই স্থবিরত্ব লাভ করিয়াছে। বিশেষ করিয়া ন্যায ও স্মৃতিতেই বাঙালী অগ্রগণ্য ছিল; ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই শাস্ত্র দুইটি নূতন সৃষ্টির অভাবে জড় হইয়া পড়িয়াছে।

ঘটত্ব-পটত্ব-বত্ব-ণত্ব—ন্যায় ও ব্যাকরণকে কটাক্ষ করা হইয়াছে। এই অংশে কমলাকান্ত সংস্কৃতশাস্ত্রের কয়েকটি তথ্য বা তত্ত্ব উপকরণরূপে গ্রহণ করিয়া কৌতুকরস সৃষ্টি করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিষয়গুলির উপর অধিকার ছিল বলিয়া তিনি এইগুলি কৌতুকরসের মধ্যে নিপুণভাবে বিন্যস্ত করিতে পারিয়াছেন। তৎকালীন ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের বিদ্যাসর্বস্বতা, অর্থলোভ, স্ত্রৈণতা, তার্কিকতা প্রভৃতি লইয়া তিনি কৌতুক করিয়াছেন। এই ব্রাহ্মণপণ্ডিত সমাজের প্রতি কটাক্ষে তাঁহার উষ্মা ব্যক্ত হয় নাই। এই সংখ্যাটিতে তাঁহার অন্তরের ক্ষোভের পরিচয় পাওয়া যায় না।

কামড়াইয়া ছোবড়া খাই—সংস্কৃতশাস্ত্র গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে নিতান্ত অল্প ছিল। প্রবেশক গ্রন্থ বা সহজবোধ্য বিশ্লেষণের পরিবর্তে একেবারেই দুর্বোধ্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করার রীতি ছিল। পরবর্তী কালে কোনো কোনো সংস্কৃত গ্রন্থের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণাদি প্রকাশিত হওয়ায় সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইয়াছে।

Sufficient to break the jaws—ইত্যাদি—অনেক পাশ্চাত্ত্য গবেষক গবেষণা বা আলোচনা প্রসঙ্গে যে বুদ্ধির কৌশল দেখাইয়াছেন তাহাতে এদেশের ছাত্র-পাঠকদের বিভ্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা যথেষ্ট পরিমাণে আছে। তাঁহাদের বুদ্ধি-প্রদর্শনের চোটে অনেক সত্য মিথ্যা বলিয়া এবং অনেক মিথ্যা সত্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

আয় কালা বালক—শ্বেতকায় ইউরোপীয়েরা কালা আদমিদের শিক্ষার জন্য অনেক সময় অতিমাত্রায় উৎসাহ দেখাইয়াছেন—অনেকে কৃষ্ণকায়দের শিক্ষাদান ‘শ্বেতাঙ্গদের ভার’ বলিয়া মনে করিতেন।—এই অংশে শিক্ষাদানের যে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহার স্থূল মর্ম এই যে, পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানাদি এদেশে কেবল বুদ্ধির উপর একটা অত্যাচারে পর্যবসিত হইয়াছে। যে সকল ইউরোপীয় শিক্ষাদানকার্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এ দেশীয়দের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন না।

ইংরেজ দোকানদারেরা লাঠি হাতে ইত্যাদি—পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি আগ্রহশীল হইয়াছেন। তাঁহারা পাশ্চাত্ত্য বিশ্লেষণাত্মক রীতিতে সংস্কৃত শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যা করিয়া ঐগুলির মর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের হস্তক্ষেপের ফলে অনেক বিষয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। কমলাকান্ত পাশ্চাত্ত্য বিশ্লেষণাত্মক ব্যাখ্যার রীতি লইয়া কৌতুক করিয়াছেন।

অমৃতফল বেচিতেছেন—সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি কমলাকান্ত তথা বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রদ্ধা, অনুরাগ লক্ষ্যণীয়।

নীচু, পীচ, পেয়ারা ইত্যাদি—কমলাকান্ত বিদেশজাত কয়েকটি ফলের উল্লেখ করিয়া সেগুলিকে বিদেশী সাহিত্যরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। অবশ্য উল্লিখিত ফলগুলির প্রায় সবকটিই এখন এদেশেও ফলে।

শিশুগণ এবং অবলাগণ ক্রয় বিক্রয় করিতেছে ইত্যাদি—তৎকালীন বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে কমলাকান্তের এই কটাক্ষ একটু অতিরঞ্জিত হইলেও ভিত্তিহীন নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে অনেক অক্ষম লেখক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিবার চেষ্টা করিযাছিলেন। তাঁহাদের অনেকেই বুদ্ধির দিক দিয়া নিতান্ত অপরিণত ছিলেন। কমলাকান্ত তাঁহাদের শিশুরূপে কল্পনা করিয়াছেন। যাঁহারা পাঠক তাঁহাদের অনেকেও শিশুবৎ অল্পবুদ্ধি। কোন কোন মহিলা লেখিকারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন এবং মহিলারাই বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র একাধিক রচনায় মহিলা পাঠিকাদের বাংলা গ্রন্থে অনুরাগের কথা বলিযাছেন।

পশ্বাবলী নামক গ্রন্থে পাইবেন—অপর লেখকদের গাধা বা গোরু বলিয়া ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

বিনা গুড়ে আশ্চর্য্য সন্দেশ—কোনো ভালো কাজ করিলে বা কোনো বিষয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিলে কীর্তির সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু বিনা কাজেই যশ বিতরণের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। কোন কিছুর প্রত্যাশায় যশ কীর্তন করিতে অনেকে পটু।

দোকানের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার ইত্যাদি—কমলাকান্ত এখানে লঘু কৌতুকের ভঙ্গি ত্যাগ করিয়া ভাবগম্ভীর কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। যথার্থ যশ অনন্ত-কালে পরীক্ষিত এবং জীবনমূল্যেই লভ্য।

প্রাণ বাঁচিলে যশ হইবে—ইহাই সুবিধাবাদী সাধারণ লোকের মনোভাব। মহৎ কর্মে জীবন উৎসর্গ করিয়া যশোলাভ করিতে অনেকেই পরাঙ্মুখ।

দেখিলাম, সেই কসাইখানা—বঙ্কিমচন্দ্র নিজে বহু বিচার করিযাছিলেন; সুতরাং বিচারবিভাগে সাধারণ লোকের যে কী দুর্ভোগ হয় তাহা তাঁহার অজানা ছিল না। ব্যবহারজীবিগণ অনেকেই মক্কেলদের প্রচুর অর্থ আত্মসাৎ করিতে দ্বিধাবোধ করেন না। বঙ্কিমচন্দ্র একাধিক প্রবন্ধে বিচারবিভাগের নানা ত্রুটির কথা বলিয়াছেন।

দপ্তররূপ পচা ঘোলের হাঁড়ি লইয়া ইত্যাদি—কৌতুক সৃষ্টি করিতে গিয়া কমলাকান্ত নিজেকেও বাদ দেন নাই।

একাদশ সংখ্যা

আমার দুর্গোৎসব

পরিচয়—বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবজীবনের একটি প্রধান অবলম্বন তাঁহার স্বদেশপ্রেম। কমলাকান্তের দপ্তরের দুইটি প্রবন্ধে এই বৃত্তিটির পরিচয় পাওয়া যায়—একটি 'আমার দুর্গোৎসব' অপরটি 'একটি গীত।' 'আমার দুর্গোৎসব' প্রবন্ধটিতে তাঁহার স্বদেশের প্রতি নিবিড় অনুরাগ, বঙ্গভূমিকে দুর্গা প্রতিমারূপে কল্পনা, বাংলার সর্বাঙ্গীণ গৌরব স্মরণ, সেই গৌরবের অবসানজনিত ক্ষোভ এবং বঙ্গমাতাকে তাঁহার গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য একটি কামনা ব্যক্ত হইয়াছে। 'একটি গীত' প্রবন্ধটিতে তিনি বাংলার ইতিহাসের দিকে ভাবাকুল দৃষ্টিপাত করিয়াছেন—ভাবের আবেগ সেখানে তীব্র হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

'আমার দুর্গোৎসব' প্রবন্ধেও কমলাকান্ত আফিম চড়াইয়াছেন—আফিমই কমলাকান্তের অসাধারণ দর্শনের মূল। আফিম চড়াইবার পর কেন যে তিনি প্রতিমা দেখিতে গেলেন—যে দৃশ্য তিনি কখনও দেখিবেন বলিয়া মনে করেন নাই তাহা তিনি কেন দেখিলেন—কে তাহাকে সে দৃশ্য দেখাইল।

কমলাকান্ত দেখিয়াছেন যে, কালস্রোত দ্রুতবেগে ধাবমান—সেই তরঙ্গমধ্যে কত নক্ষত্রের উদয় ও বিলয় হইতেছে—তাহাতে তিনি ভেলায় করিয়া একা ভাসিয়া যাইতে যাইতে 'মা, মা' বলিয়া ডাকিতেছেন। সেই কালসমুদ্রে বঙ্গজননীর খোঁজ করিতে করিতে সহসা তিনি স্বর্গীয় বাদ্য শুনিলেন, স্বর্গীয় আলোক উদ্ভাসিত ও মন্দ পবনে মুখরিত সেই তরঙ্গিত জলরাশির উপরে সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা দ্যুতিতে চারিদিক আলোকিত করিয়া ভাসিতেছে দেখিলেন। তিনি চিনিলেন, এই তাঁহার মৃন্ময়ী মা—এখন কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজ দশদিক—তাহাতে আয়ুধরূপে কত শক্তি, পদতলে শত্রুবিমর্দনরত বীরকেশরী। কমলাকান্ত কালস্রোত পার হইয়া একদিন এই মূর্তি দেখিতে কামনা করেন—এই শত্রুমর্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠশোভিনী—দক্ষিণে ভাগ্যরূপিনী লক্ষ্মী, বামে বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্তিময়ী বাণী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, সিদ্ধিদাতা গণেশ। সেদিন তিনি কালস্রোতে পার হইয়া সেই বঙ্গভূমির প্রতিমা দর্শন করিলেন।

কমলাকান্ত কোথায় ফুল পাইলেন জানেন না, তিনি প্রতিমার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া বলিলেন—মঙ্গলময়ী সন্তানপালিকা সর্বসিদ্ধিদায়িনী মা। আমি ভক্তি, প্রীতি

শক্তি পুষ্পাঞ্জলি দিতেছি। তুমি এই জলরাশি ত্যাগ করিয়া তোমার সুন্দর মূর্তি প্রকাশ কর। নবরূপময়ী মা, তুমি গৃহে এস—ছয় কোটি সন্তান একসঙ্গে করজোড়ে তোমার পূজা করিব আর তোমার নাম করিয়া ডাকিব—জননী, ধাত্রী, ধনধান্য-দায়িনী তুমি। তুমি শৈলজা, সিন্ধুপূজিতা, তুমি শক্তি ও শ্রীর অধীশ্বরী, তুমি আমাদের শক্তি দাও। আমরা ছয় কোটি সন্তান তোমার পদপ্রান্তে লুটাইব, তোমার জয়গান করিব। তোমার জন্য এই ছয় কোটি দেহ পাতন করিব—না পারিলে বারো কোটি চোখে তোমার জন্য কাঁদিব। মা গৃহে এস—যাঁহার ছয় কোটি সন্তান, তাঁহার ভাবনা কী?

কমলাকান্ত সহসা আর কিছু দেখিতে পাইলেন না—সেই প্রতিমা কালসমুদ্রে ডুবিয়া গেল। চারিদিকে ঘোর অন্ধকার নামিয়া আসিল। কমলাকান্ত তখন কাঁদিতে কাঁদিতে করজোড়ে বলিলেন—উঠ মা বঙ্গভূমি—এবার সকলে সুসন্তান হইয়া তোমার মুখ চাহিব। উঠ মা, এবার পরের মঙ্গল সাধন করিব, অধর্ম ও আলস্য ত্যাগ করিব—একা কাঁদিতেছি—কাঁদিতে কাঁদিতে চোখ গেল মা।

মা উঠিলেন না—তিনি কি উঠিবেন না?

কমলাকান্ত সকল বঙ্গবাসীকে ডাকিয়া বলিতেছেন—এস ভাই, এই অন্ধকার কালসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া বারো কোটি হাতে ঐ প্রতিমা তুলিয়া ছয় কোটি মাথায় বহিয়া আনি। এই অকূল অন্ধকারে নক্ষত্রের আলোকে পথ দেখিয়া সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সেই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় লইয়া আসিব। না হয় ডুবিব। প্রতিমা আনিলে পূজার ধূম হইবে। সৎকীর্তি-খড়্গে দ্বেষক ছাগকে বলি দিব—পুরাবৃত্তকার ঢাক্ বাজাইয়া বঙ্গের বাজনায় আকাশ পূরিবে। কত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত কত দেশী-বিদেশী মায়ের কাছে ছুটিয়া আসিবে, কত ভক্ত মায়ের জয়গান করিয়া গাহিবে—

জয় জগজ্জননী সুখদা, অন্নদা, বরদা, শর্মদা বঙ্গমাতা। শুভংকরী, শান্তিময়ী, ক্ষেমংকরী, সন্তান-পালিনী, দুর্গতিনাশিনীর জয়! জয় লক্ষ্মী, জয় ভক্তিশক্তি-দায়িনী, পাপতাপভয়শোকনাশিনী, মৃদুগম্ভীরভাষিণী। জয় মা করালী, হিমালয়-দুহিতা, পূর্ণচন্দ্রভালিকা, সর্বার্থসাধিকা, কমলাকান্তপালিকা। বরপ্রদা দেবী, তোমাকে নমস্কার। দেবি, তুমিই ব্রহ্মাণী, তুমিই ইন্দ্রাণী ও রুদ্রাণী, যশস্বিনী তুমিই ভূতভবিষ্যতের অধীশ্বরী। ভয়ংকরি, তুমি সমস্ত দুঃখ হইতে রক্ষা কর। জগদীশ্বরি, তুমি জগতের জননী, তুমি সর্বপ্রিয়বস্তুদাত্রী, তুমি শৈলবালিকা, তুমি বসুন্ধরা; তোমাকে নমস্কার। তুমি ভক্তের আর্তি বিনাশ কর—তুমি ত্রাণ কর। মাথা লুটাইয়া প্রণাম করিতেছি, তুমি বন্ধন অপসারণ কর।

পাঠ প্রসঙ্গে—যাহা কখনও দেখিব না—এই রচনায় কমলাকান্ত বাংলাদেশের শ্রীসম্পন্নময়ী মূর্তি কল্পনা করিয়াছেন। বঙ্গভূমির সেই পূর্ণৈশ্বর্যময়ী মূর্তি তিনি দেখিবেন বলিযা মনে করেন না। বাংলা যে দুর্দশায় পতিত হইয়াছে তাহা হইতে উদ্ধার হইবার সম্ভাবনা তাঁহার জীবদ্দশায় নাই।

কালের স্রোত দিগন্ত ব্যাপিযা প্রবলবেগে ছুটিতেছে—কমলাকান্ত এখানে ইতিহাসের পথ বাহিযা অতীতের দিকে ফিরিয়া যান নাই, তিনি ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। এই ছত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের আশাবাদ ব্যক্ত হইয়াছে।

ভেলায় চড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছি—বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে যে গৌরবময ভবিষ্যৎ ফুটিয়া উঠিযাছে তাহা সহজলভ্য নয়। বাংলাদেশে যে অধঃপতন ঘটিয়াছিল তাহা হইতে উদ্ধার সুকঠিন। বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে সাধনা করিযাছিলেন তাহা অকূল সমুদ্রে ভেলা ভাসানোরই অনুরূপ।

উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ—দেশের মহান সন্তানবর্গ, অথবা অন্যান্য স্বাধীন দেশ।

আমি নিতান্ত একা—বঙ্কিমচন্দ্র যে স্বদেশপ্রেমের ব্রত গ্রহণ করিযাছিলেন তাহাতে তাঁহার সঙ্গী বিশেষ ছিল না—তিনি নিতান্ত একাই ছিলেন। এ প্রসঙ্গে দপ্তরের প্রথম সংখ্যা 'একা' স্মরণীয। . অবশ্য এখানে তাঁহার অনুভূতির দিক দিযা একাকিত্ব ব্যক্ত হইয়াছে।

কালসমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি—বঙ্গজননীর গৌরবদীপ্ত মূর্তি প্রত্যক্ষ করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র কালস্রোত বাহিযা আসিয়াছেন।

কোথায় কমলাকান্তপ্রসূতি বঙ্গভূমি—কমলাকান্ত যে বঙ্গভূমিকে আপনার জননী বলিয়া মনে করেন সেই বঙ্গভূমি কোথায়! বঙ্গমাতার যে মূর্তি কমলাকান্তের কল্পনানেত্রে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইতেছে না।

স্বর্গীয বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পূর্ণ হইল ইত্যাদি—কমলাকান্ত বঙ্গজননীর যে মূর্তি কল্পনা করিয়াছেন তাহা দিব্য মূর্তি। সুতরাং তাহা দর্শন করিবার পূর্বে স্বর্গীয় বাদ্য ও দিব্য আলোক কল্পিত হইযাছে। বঙ্গভূমি যখন সুবর্ণমূর্তি হইবে তখন সারা দেশে যে অপূর্ব সমৃদ্ধি দেখা যাইবে এই ছত্রে তাহাই আভাসিত হইয়াছে।

সুবর্ণমণ্ডিতা এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা—বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গজননীকে দুর্গাপ্রতিমার সহিত একাত্মরূপে কল্পনা করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার 'বন্দে মাতরম্'.সংগীতের মূল কল্পনা। হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার করিয়া তাঁহার স্বদেশকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবেন—এরূপ কোনো কল্পনা বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরে ছিল না। তিনি স্বদেশের গৌরবোজ্জ্বল মূর্তি কল্পনা করিয়া তাহাকে হিন্দুর একটি পরিচিত মূর্তির

সহিত অভিন্নরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। দুর্গাপ্রতিমার সহিত শক্তিউপাসক বাঙালীর চিত্তের যোগ আছে ; সুতরাং এই কল্পনা স্বতঃই বাঙালীর পক্ষে হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই কল্পনা অবশ্য গোঁড়া হিন্দুকে তৃপ্ত করিবে না ; কিন্তু বাঙালীর সংস্কৃতির ধারায় দেশমাতৃকার এই মূর্তি কল্পনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যে জাতির সম্মুখে একটি উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপনা করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মৃন্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—দেশ মাটিতে গড়া ; দুর্গাপ্রতিমাও মৃন্ময়ী।

এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা—কালক্রমে বঙ্গভূমির সেই রত্নমণ্ডিতা সুবর্ণময়ী মূর্তি অন্তর্হিতা হইয়াছে। এখন বাংলাদেশ তাহার গৌরব হারাইয়াছে।

রত্নমণ্ডিত দশভুজ ইত্যাদি—বঙ্কিমচন্দ্র অতি নিপুণভাবে বঙ্গজননী ও দুর্গা-প্রতিমার অভেদ কল্পনা করিয়াছেন। দুর্গাপ্রতিমাকে দেশমাতৃকার প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়া নানাদিক দিয়া উভয়ের অভেদ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। দশ হাত দশ দিক রূপে কল্পিত হইয়াছে ; তাহাতে নানা আয়ুধ নানা শক্তির দ্যোতক। দক্ষিণে লক্ষ্মী দেশের শ্রীর প্রতীক, বামে সরস্বতী দেশের জ্ঞানের প্রতীক। কার্তিকেয় দেশবাসীদের শক্তি ও গণেশ কার্যসিদ্ধির প্রতীক। অসুর দেশের শত্রু এবং সিংহ দেশের বলশালী পুরুষবৃন্দ।

কিন্তু একদিন দেখিব—ভবিষ্যতে একদিন যে বাংলার সুদিন আসিবে ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের ধ্রুব বিশ্বাস।

ভক্তি, প্রীতি, বৃত্তি, শক্তি করে লইয়া—দেবীর চরণে যে পুষ্প অঞ্জলি দেওয়া হয় কমলাকান্ত তাহাকে মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণগুলির প্রতীকরূপে কল্পনা করিয়াছেন। ভক্তি, প্রীতি, বৃত্তি ও শক্তি এই চারিটি উপাদানই মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ—দেবীর পূজায় এই কয়টির প্রয়োজনই সবচেয়ে বেশি।

জগৎ সমীপে প্রকাশ কর—বাংলাদেশ একসময় শ্রী ও সমৃদ্ধি লাভ করিয়া জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিয়াছিল। বর্তমানে তাহার সেদিন নাই। বাংলাদেশ আবার গৌরব লাভ করিয়া বিশ্বসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করিবে, সমগ্র বিশ্ব তাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিবে, ইহাই বঙ্কিমের বাসনা।

নবরাগরঙ্গিণী, নববলধারিণী ইত্যাদি—উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে নবজাগরণ হইয়াছিল। বঙ্কিমের কল্পনায় তাহাই প্রতিফলিত হইয়াছে। দেশে যে এক নবযুগ আসিয়াছে, জাতির প্রাণে যে নূতন শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, নূতন স্বপ্ন যে তাহাকে জীবনের প্রেরণা দান করিতেছে তাহা বঙ্কিমচন্দ্র অনুভব করিয়াছিলেন।

নগাঙ্কশোভিনি নগেন্দ্রবালিকে—বাংলাদেশ পূর্বে সমুদ্রে ঢাকা ছিল। হিমালয় হইতে কয়েকটি নদী দিয়া পলিমাটি নামিয়া আসায় ক্রমে বাংলাদেশ গড়িয়া উঠিয়াছে। এইজন্য বাংলাদেশকে হিমালয়ের কন্যারূপে কল্পনা করা হইয়াছে। তাহার অবস্থানের জন্য তাহাকে হিমালয়ের ক্রোড়ে শোভিত বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে।

শরৎসুন্দরী চারুপূর্ণচন্দ্রভালিকে—বাংলার প্রকৃতির প্রশস্তি।

সিন্ধুসেবিতে ইত্যাদি—বাংলাদেশ সম্পর্কে এই বিশেষণ কয়টি উপযুক্ত হইযাছে —দুর্গার বিশেষণ হিসাবে এগুলি অসার্থক।

যাঁহার ছয় কোটি সন্তান ইত্যাদি—বন্দে মাতরম্ গানের মধ্যেও এই সুরটি ব্যক্ত হইয়াছে।

দেখিতে দেখিতে আর দেখিলাম না—কমলাকান্তের স্বপ্নদৃষ্টি সহসা অপসারিত হইযাছে—তিনি রূঢ় বাস্তবলোকে নামিয়া আসিয়াছেন। কল্পনায় তিনি যে সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা দেখিয়াছিলেন তাহা শূন্যে মিলাইয়াছে।

এবার সুসন্তান হইব ইত্যাদি—ইহাই দেশপ্রেমিকের স্বদেশব্রত সাধনার শপথবাণী। এদেশ যে ডুবিযাছে তাহার কারণ অন্বেষণ করিতে গিয়া ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, দেশাত্মবোধের অভাব, স্বার্থপরতা, আলস্য ইন্দ্রিয়াসক্তি ও অধর্মাচরণই এই জাতির অধঃপতনের কারণ।

কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা—ইহাই মনেপ্রাণে দেশসেবকের আর্তি।

এস ভাই সকল—একটা দেশের, একটা জাতির উদ্ধার ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় হইবার নয; তাহার জন্য অসংখ্য মানুষের সহায়তা প্রয়োজন। সেইজন্য কমলাকান্ত বঙ্গজননীকে কালসমুদ্র হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহার স্বদেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছেন।

অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে এই কালসমুদ্র তাড়িত মথিত ব্যস্ত করিয়া—দেশসেবার সাধনায় বঙ্কিমের কল্পনার সবল রূপটি লক্ষ্যণীয়।

মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি—যে জাতির গৌরব গিয়াছে তাহার জীবন বিফল বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তির জীবনকে জাতির জীবনের উর্ধ্বে স্থান দেন নাই। ব্যক্তির জীবনকে উন্নত করিতে হইলে জাতির জীবনকে প্রথমে উন্নত করিতে হইবে ইহাই ছিল তাঁহার ধারণা। ব্যক্তির জীবনকে বড়ো করিয়া তুলিবার জন্য তিনি প্রথমে সারা দেশকে উন্নত করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। উচ্চ শ্রেণীর শিল্পপ্রতিভার অধিকারী হইয়াও এইজন্যই বঙ্কিমচন্দ্র লেখনীকে রসসাহিত্যের ক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিয়া গঠনমূলক কর্মে নিয়োগ করিয়াছিলেন।

মেষক ছাগকে বলি দিয়া ইত্যাদি—বঙ্কিমের প্রতীক কল্পনার নিপুণতা লক্ষ্যণীয়। দুর্গাপূজার সময় যে সমারোহ হয় তাহাকে তিনি বঙ্গের গৌরবের দিনের সমারোহ রূপে কল্পনা করিয়াছেন।

জগদাত্রি—শব্দটি জগদ্ধাত্রি হওয়াই সম্ভব।

শর্ম্মদে—সুখদাত্রি।

কমলাকান্ত যে স্তবটি গাহিয়াছেন তাহার প্রথমাংশ বঙ্কিমচন্দ্রের স্বরচিত। বঙ্কিমচন্দ্রের সংস্কৃত সংগীত রচনার বিশিষ্ট নিদর্শন 'বন্দে মাতরম্' গান। বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃত গান লিখিতে গিয়া সংস্কৃত ছন্দোবিধি অনুসরণ করেন নাই।

দ্বাদশ সংখ্যা

একটি গীত

পরিচয়—এই সংখ্যাটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবজীবনের পরিচয় ব্যক্ত হইযাছে। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে কমলাকান্তের মুখ দিয়া যেন লঘুভাবে সংখ্যাটি সুরু করিযাছেন—কিন্তু কয়েক ছত্র অগ্রসর হইতে না হইতেই কৌতুকের ভাবটি বিলুপ্ত হইয়া গিযাছে, বঙ্কিমচন্দ্রের আবেগ-গম্ভীর মূর্তিটি প্রকাশিত হইয়াছে। কমলাকান্তের দপ্তরেই বঙ্কিম-চন্দ্রের ব্যক্তিমানসের সবচেযে বেশি পরিচয ব্যক্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই। এখানে উপন্যাসের কাহিনীর দায় নাই—বাঁধা প্রবন্ধের তথ্যভার-সমাবেশের দাযও নাই—বঙ্কিমচন্দ্র সহজভাবেই আপনার মনের কথা খুলিয়া বলিতে পারিয়াছেন। সৃষ্টিধর্মী রচনা হওয়ায় তাঁহার মনের যথার্থ ভাবনাগুলি স্বতঃই প্রকাশিত হইবার অবকাশ পাইয়াছে; তাহার উপর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়ায় তাঁহার চিন্তাধারাও এখানে পরিস্ফুট হইয়াছে। এই রচনাটিতে কৌতুকের ছদ্ম আবরণটুকু উন্মোচিত হওয়ায় আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের নগ্ন হৃদয়ের ভাবনা ও বেদনা যেন প্রত্যক্ষই করি।

কমলাকান্ত প্রসন্ন গোয়ালিনীকে 'এসো এসো বঁধু এসো' এই কীর্তনটি শুনাইয়াছেন। এই গানটি তিনি যখন প্রথম শুনিয়াছিলেন, তখন কবির দৈববংশী লইয়া এই গান গাহিতে তাঁহার ইচ্ছা করিয়াছিল—এই গান তাঁহার মনে চির-জাগরূক হইয়া আছে।

কমলাকান্ত ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিতে সুখের সন্ধান পান নাই। তিনি বুঝিয়াছেন যে, 'এসো এসো বঁধু এসো' এই ছত্রটি মানুষের সহিত মানুষের, হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের মিলনের জন্য লিখিত হইয়াছিল। হৃদয়ের মিলনই মানুষের সবচেয়ে বড়ো কামনা।

মানুষের সমস্ত বড়ো প্রবৃত্তি অপরের হৃদয়ের জন্ত। কমলাকান্ত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই 'এসো এসো বঁধু এসো' এই ডাক শুনিতে পাইতেছেন—গ্রহে, উপগ্রহে, সৌর-পিণ্ডে, জগতে জগতে, প্রকৃতি-পুরুষে এই ধ্বনি অহরহ জাগিতেছে। কমলাকান্তের বঁধু কি আসিবে ?

কমলাকান্ত তাঁহার বঁধুকে তাঁহার শ্রেষ্ঠ আসন, তাঁহার হৃদয়াবরণের অর্ধাংশ দিতে পারেন—তিনি তাঁহাকে আপনার দেহমনের একেবারে কাছে পাইতে চাহেন। এই আবরণ স্থূল বসন নয়—জ্ঞানের যে আবরণ মন ঢাকিয়া আছে তাহার অর্ধাংশ দিয়া হৃদয় ঢাকিয়া দিয়া বাকি অর্ধাংশে বঁধুকে বসিতে দিতে হইবে।

গানের মধ্যে বঁধুকে নয়ন ভরিয়া দেখিবার কথা আছে। কিন্তু কে কবে কোন্ জিনিস নয়ন ভরিয়া দেখিয়াছে, ধন, যশ,—কোনো কিছুই দুই চোখ ভরিয়া দেখা যায় না : রূপ—তাহা প্রকৃতিরই হোক বা শিশু বা নারীরই হোক না কেন—তাহা দেখিতে দেখিতে শেষ হইয়া যায়। এই পৃথিবীতে কেহ নয়ন ভরিয়া রূপ দেখিতে পায় না—ইহাই সংসারের নিয়ম। হয়তো এই জন্যই সংসারে সুখ আছে। জগৎসংসার পরিবর্তিত হয়, নয়ন অতৃপ্ত থাকিয়া যায়—এই জন্যই নয়ন ভরিয়া দেখিবার এত বাসনা। কমলাকান্ত হৃদয়ের সহিত সংযুক্ত রূপকে কাছে আসিতে বলিতেছেন—কাছে আসিলেই মনের সংস্পর্শ হইতে পারে, মন না মিলিলে তো নয়ন ভরিতে পারে না। পলক থাকায় নয়নও যে ভরিতে পারে না।

গীতটিতে রাধা অনেকদিন পরে তাঁহার নিধিকে ফিরিয়া পাইয়াছেন। কমলাকান্ত মনে করেন যে, দুঃখের সীমা টানিবার জন্যই দিনের বিভাগ হইয়াছে—তাহা না হইলে দুঃখের ভোগ পরিমিত সময়ে না হইয়া অনন্তকাল ধরিয়া হইত। তাহা হইলে মানুষের দুঃখাবসানের আশা থাকিত না। সুখের আশায় দুঃখের দিন গণনা করা হয়। কিন্তু সুখহীন, আশাহীন, উদ্দেশ্যহীন কমলাকান্ত কেন দিবস গণনা করিবেন!

কমলাকান্তের এক দুঃখ এক ভরসা আছে। ১২০৩ সালে যেদিন সতেরোটি অশ্বারোহী বাংলা জয় করিয়া হিন্দু নাম বিলোপ করিয়াছে, সেই দিন হইতে তিনি দিন গণিতেছেন। কিন্তু মনের মানসে তাঁহার ধন মিলিতেছে না। মনুষ্যত্ব, এক-জাতীয়ত্ব, ঐক্য, বিদ্যা কোথায়—শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ, হলায়ুধ, লক্ষ্মণসেন কোথায়!

রাধা বলিয়াছেন যে, কৃষ্ণ মণিমাণিক্য হইলে হার করিয়া গলায় পারিতেন। রূপকে বিধাতা জড়পদার্থ করিয়াছেন। কমলাকান্ত ভাবিতেছেন যে, রূপ যদি অশরীরা হইত, তাহা হইলে তিনি রূপকে আপনার শরীরে রাখিতে পারিতেন। আর বঙ্গভূমি যদি মণি কি মাণিক্য হইত, তাহা হইলে তিনি তাহাকে আপনার কণ্ঠে

ধারণ করিয়া দেশে দেশে ফিরিতেন। তাহা হইলে কত দেশে তিনি এই উজ্জ্বল মণিটি দেখাইতে পারিতেন।

রাধা বলিয়াছেন যে, বিধাতা যদি তাঁহাকে নারী না করিতেন, তাহা হইলে তিনি কৃষ্ণকে লইয়া দেশে দেশে ফিরিতেন। গানে প্রথমে আহ্বান, তাহার পর আধ আঁচরে বসাইয়া আদর, তাহার পর নয়ন ভরিয়া দেখিয়া ভোগ, তাহার পর পূর্বস্মৃতি—অবশেষে গলায় পরার অসম্পূর্ণ সুখ এবং দেশে দেশে ফেরার পরিপূর্ণ সুখ, সম্পূর্ণ সুখের লক্ষণ শারীরিক চাঞ্চল্য ও মানসিক অধৈর্য। এই সুখের ভার লাইয়াই দেশে দেশে ফিরিতে হয়—সারা বিশ্বকে আপনার সুখের সাগরে ভাসাইয়া দিতে হয়। এই সুখ হইতে কমলাকান্ত বঞ্চিত—বাঙালী জাতি বঞ্চিত।

বাঙালীর সুখে অধিকার না থাকিলেও দুঃখে আছে। সুগভীর আর্তি বাঙালীর মর্মের উক্তি। কাতরোক্তি সর্বত্রই আছে। সুখের সময়ও পূর্বদুঃখ স্মরণে কাতরোক্তি থাকে—তাহা না হইলে সুখ সম্পূর্ণ হয় না। সুখের মধ্যেও দুঃখ আছে। এইজন্য রাধা বলিয়াছেন যে, যখন তিনি কৃষ্ণের কথা মনে করেন তখন তাঁহার কেশদাম বিস্রস্ত হইয়া যায়।

সুখ দুঃখের সীমারেখা। নষ্টসুখের স্মৃতি জাগিলে যে সুখ দেখিতে পায় সে এখনও সুখী—প্রিয় গেলেও তাহার নিদর্শন আছে। কিন্তু যাহার সুখ গিয়াছে, সুখের নিদর্শন গিয়াছে, যাহার আর চাহিবার কোনো স্থান নাই, সে অনন্ত দুঃখে দুঃখী।—বাংলা-দেশের সুখের স্মৃতি যদিও বা আছে, সুখের নিদর্শন নাই। বাংলার রাজকুলের নাম, গৌড়ী রীতি—ইহাদের স্মৃতি আছে, কিন্তু গৌরবের নিদর্শন নাই। সে গৌড় নাই—তাহার যবনলাঞ্ছিত যে ভগ্নাবশেষ আছে তাহার মধ্যে অতীতের সে সুখের চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নাই। কমলাকান্তের—বাঙালীর চাহিবার আর স্থান নাই।

একমাত্র শ্মশানভূমি নবদ্বীপ আছে। সপ্তদশ যবন এইখানে বাংলা অধিকার করিয়াছিল। বঙ্গজননীকে স্মরণ করিলে কমলাকান্ত নবদ্বীপের দিকে চাহেন। এখন একটি গ্রামের পাশ দিয়া গঙ্গা বহিতেছেন—সে রাজলক্ষ্মী কোথায়! যে রাজলক্ষ্মীর জন্য গঙ্গার ধারা বাহিয়া দেশ-দেশান্তর হইতে ধন আসিত সেই বঙ্গজননী কোথায়! তিনি কি যবনভয়ে কিংবা কু-পুত্রগণের মুখ দেখিবেন না বলিয়া গঙ্গাজলে ডুবিয়া আছেন। কাল পূর্ণ হইলে, অশ্বারোহী যবন সৈন্যদল নবদ্বীপে আসিতেছিল—চারিদিকে অমঙ্গলের চিহ্ন প্রকট হইল। কমলাকান্ত কল্পনানেত্রে দেখিতেছেন যে, বাংলার রাজলক্ষ্মী সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইলেন। তাহা না হইলে জননী কোথায় গেলেন!

পাঠ প্রসঙ্গে—এসো এসো বঁধু এসো—পদটি চণ্ডীদাসের রচনা।

নীলাকাশতলে ক্ষুদ্র পক্ষী হইয়া ইত্যাদি—এই কল্পনাটি বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ প্রিয়। 'বসন্তের কোকিল' নামক সংখ্যাটিতেও অনুরূপ কল্পনা আছে।

একা এই গীত গাই—আপনার অন্তরে ভালো করিয়া এই গীতের তাৎপর্য অনুভব করিবার জন্য বিজনে একা বসিয়া গান গাহিবার কল্পনা করা হইয়াছে। বস্তুত এই একাকিত্ব প্রতিভার স্বধর্ম।

কমলাকান্ত চক্রবর্তী বুঝিতে পারিল না ইত্যাদি—বঙ্কিমচন্দ্র ইন্দ্রিয় সুখকে সুখ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ইন্দ্রিয়কে কোথাও প্রাধান্য দেন নাই—এমন কি ইন্দ্রিয়-সংযমকেও তিনি খুব বড়ো কাজ বা বড়ো আদর্শ বলিয়া স্বীকার করেন নাই—চিত্তশুদ্ধিকে তাহার বহু উর্ধ্বে স্থান দিয়াছেন। সুতরাং ইন্দ্রিয়জ সুখকে তুচ্ছ-জ্ঞান করিয়া তিনি মানস সুখ ও হৃদযের পরিতৃপ্তিকেই গ্রাহ্য করিয়াছেন। হৃদযের সংঘাত ও হৃদয়ে হৃদয়ে মিলনই তাঁহার কাছে মানব-জীবনের সবচেয়ে বড়ো সত্য বলিয়া প্রতিভাত করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র বহুস্থলে উপদেশচ্ছলে অনেক কথা বলিযাছেন, কিন্তু 'ইহজন্মে মনুষ্যহৃদয়ে একমাত্র তৃষা—অন্যহৃদয়ে কামনা' এই বাণীটিতে তাঁহার জীবনের সুগভীর সত্যবোধ প্রকাশিত হইয়াছে।

জড় জগতের নিয়ম আকর্ষণ—বঙ্কিমচন্দ্র আধ্যাত্মিক সত্যকে স্থূল প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যেও প্রত্যক্ষ করিতেছেন। বাস্তবিকপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র জড় জগতে আকর্ষণের যে দৃষ্টান্তগুলি দিয়াছেন তাহা হৃদয়ে হৃদয়ে আকর্ষণ প্রতিপাদন করে নাই—তাহা বঙ্কিমের কল্পনাকে কতকটা তৃপ্ত করিয়াছে এইমাত্র।

এই তৃণশষ্প সমাচ্ছন্ন ইত্যাদিতে—এই সংখ্যাটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনা বর্ণনার মাধুর্যে ও আবেগের প্রাবল্যে কাব্যের শ্রী ও গভীরতা লাভ করিয়াছে। এই অংশে তাহার কিছুটা পরিচয় ব্যক্ত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম জীবনের গদ্যে সাধারণত দীর্ঘ বাক্য দেখা যায়। পরিণত বয়সের রচনায় হ্রস্ব অথচ আবেগ-গভীর বাক্যে মনোভাবকে সংহত রূপ দিবার প্রয়াস লক্ষ্যণীয়। বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে এতটা সংহতির পরিচয় আর কাহারও রচনায় পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

যাহাতে আমার লজ্জারক্ষা ইত্যাদি—আদর দেখাইবার জন্য ইহার চেয়ে বড়ো জিনিষ আর কী আছে?

তুমি মূর্খ—তথাপি ইত্যাদি—এই আবেগময় অংশেও বঙ্কিমচন্দ্র কৌতুকের সরসতা সঞ্চার করিয়াছেন।

যেখানে ফুলটি ফুটে ইত্যাদি—বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনা করিয়া

তাহার পর বালক, যুবতী ও প্রৌঢ়ার সৌন্দর্যের কথা বলিয়াছেন। তাঁহার সৌন্দর্যগ্রাহী চিত্ত বিশ্বের সকল বিষয়ের মধ্যেই সৌন্দর্যের সন্ধান পাইতে চাহিয়াছে—ইহাই যথার্থ সৌন্দর্যবোধের নিদর্শন।

গতিই সৌন্দর্য্যের সুখ—সৌন্দর্য যদি চিরস্থায়ী হইত তাহা হইলে তাহা আমাদের চিরকাল আকর্ষণ করিত না। সৌন্দর্য সম্ভোগ করিতে করিতে আমাদের অন্তর তৃপ্তিলাভ করিয়া সুপ্ত হইয়া পড়িত। সৌন্দর্য চিরপলাতক বলিয়াই তাহার জন্য মানুষ এত পাগল। বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবত এই কল্পনাটি ইংলণ্ডের রোমাণ্টিক কবিকুলের ভাবাদর্শ হইতে আহরণ করিয়াছিলেন। ভারতীয় সাহিত্যে চলিষ্ণু সৌন্দর্যের কল্পনা কচিৎ থাকিলেও অক্ষয় সৌন্দর্যই ভারতীয় কল্পনায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এমন কি বৈষ্ণবরা শ্রীরাধার বয়স পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। সৌন্দর্য অপ্রাপনীয় বলিয়া তাহার জন্য আকুলতা পাশ্চাত্ত্য কাব্যেই বহুভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

হে অন্তঃপ্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট—রূপ বাহ্য—কিন্তু মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির সহিত তাহার সম্বন্ধ আছে। কেবল চোখেই রূপ ভালো লাগে না; তাহার পিছনে যে অন্তর আছে তাহার জন্যই রূপ ভালো লাগে।

সংস্পর্শ বা নৈকট্য ব্যতীত মনের বৈদ্যুতী বহে না—দূরে থাকিলে একজনের মন আর একজনের মনকে তেমন ভাবে দোলা দেয় না। একজন আর একজনের কাছে আসিলে তবেই দুইজনের হৃদয়-বিনিময় হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের আমলে তাড়িত বিজ্ঞান তেমন উৎকর্ষ লাভ করে নাই; তবুও তিনি বিজ্ঞান হইতে উপমা গ্রহণ করিয়া মনের ভাবটি প্রকাশ করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন।

নয়নে যে পলক আছে—একবার চোখের পলক পড়িলে দৃষ্টির অন্তরায় হইবে। কল্পনাটি সংস্কৃত সাহিত্যে বহুস্থানে পাওয়া যায়।

কাল অপরিমেয় ইত্যাদি—কাল অনন্ত। তাহাকে দিনে বিভক্ত করিয়া মানুষ দৈনন্দিন কাজ চালায়। মানুষ যে দুঃখ ভোগ করে তাহাকে সে সময়ের পরিমাপে বিভক্ত করে বলিয়া তাহা সীমাবদ্ধ হয়; তাহা না হইলে অর্থাৎ অপরিমেয় কালে ব্যাপ্ত হইলে দুঃখ অনন্ত হইত।

দিবসগণনায় সুখ আছে—দুঃখের এতদিন গিয়াছে, আরও কিছুদিন গেলে দুঃখ শেষ হইবে—এই আশা থাকার জন্য দিন গণনায় সুখ আছে।

এক দুঃখ, এক সন্তাপ, এক ভরসা আছে—একটি গানের বিশ্লেষণ করিতে করিতে বঙ্কিমচন্দ্র সহসা স্বদেশের পরাধীনতার প্রসঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছেন। দেশ বিদেশীর

অধীন হইয়াছে ইহাই তাঁহার দুঃখ বা সন্তাপ ; দেশ আবার স্বাধীন হইবে, ইহাই তাঁহার ভরসা।

১২০৩ সাল হইতে—বখ্‌তিয়ার খিল্‌জী ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপ জয় করিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবত ঐ তারিখই নির্দেশ করিতে চাহিয়াছেন।

সপ্তদশ আরোহী বঙ্গ জয় করিয়াছিল—ইহাই প্রসিদ্ধি। বঙ্কিমচন্দ্র 'মৃণালিনী' গ্রন্থে এবং একাধিক প্রবন্ধে এই কিংবদন্তী যে ভ্রান্ত তাহা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 'বিবিধ প্রবন্ধে'র দুইখণ্ডে সংকলিত বাংলাদেশ ও বাঙালী সম্পর্কে তাঁহার প্রবন্ধগুলি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

মনুষ্যত্ব মিলিল কৈ ইত্যাদি—বাঙালীর মনুষ্যত্ব, একজাতীয়তা, বিদ্যা, গৌরব সবই বিলুপ্ত হইয়াছে—ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষোভ।

শ্রীহর্ষ—প্রাচীন বাঙালী সম্রাট আদিশূর যজ্ঞ করিবার জন্য যে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে কান্যকুব্জ হইতে আনিয়াছিলেন, তাঁহাদের অন্যতম।

ভট্টনারায়ণ—কান্যকুব্জ হইতে আনীত অপর ব্রাহ্মণ ; ইনি 'বেণীসংহার' নামক সংস্কৃত নাটক রচনা করিয়াছিলেন।

হলায়ুধ—লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী বলিয়া কথিত ; 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' গ্রন্থের রচয়িতা।

লক্ষ্মণ সেন—সেন বংশের বিশিষ্ট রাজা—বল্লাল সেনের পুত্র। ইঁহার সময় বাংলাদেশ নানা বিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ইঁহার রাজত্বকালেই মুসলমানরা নবদ্বীপ জয় করিয়াছিল কিনা সে বিষয়ে অনেক ঐতিহাসিক সন্দেহ পোষণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র লক্ষ্মণসেনকে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট রূপেই স্মরণ করিয়াছেন এবং তাঁহার মতো সমৃদ্ধিশালী রাজাকে প্রার্থনা করিয়াছেন।

মুসলমান আমার হৃদয়ে ইত্যাদি—বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষভাবে হিন্দু সভ্যতা ও হিন্দু সংস্কৃতির পোষক ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে যে অভ্যুদয় হইয়াছিল তাহা প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতিকে অবলম্বন করিয়াই হইয়াছিল। ইসলামের সংস্পর্শে আসিবার ফলে এ দেশে সংস্কৃতির যে রূপান্তর ঘটিয়াছিল তাহা উনবিংশ শতাব্দীর মনীষীদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নাই। সেইজন্য বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশে মুসলমান অধিকারের সময় হইতে বাংলার অধঃপতন হইয়াছে এ কথা বলিয়াছেন। এ জন্য কোনো কোনো মুসলমান বঙ্কিমচন্দ্রকে মুসলমান-বিদ্বেষী বলিয়া অভিযোগও করিয়াছেন। অবশ্য বঙ্কিমের সমগ্র রচনাবলী তাঁহার ইসলাম-বিদ্বেষের সাক্ষ্য দেয় না। মুসলমান শাসকদের প্রায় সকলেই অবাঙালী হওয়ায়

বঙ্কিম তাঁহাদের বাংলার গৌরব বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই। বস্তুত বাংলার সংস্কৃতির সহিত সুলতান ও নবাবদের যোগ ছিল না।

সম্পূর্ণ অসহ্য সুখের লক্ষণ ইত্যাদি—সুখের পরিমাণ অধিক হইলে তাহা মানুষের দেহ ও মনকে বিচলিত করিয়া দেয়। গভীর সুখে যখন মানুষের অন্তর নিমজ্জিত হয় তখন তাহার বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য থাকে না। বঙ্কিমচন্দ্র সেই অচঞ্চল সুখের কথা বলেন নাই। তিনি যে স্বদেশপ্রেমজ আনন্দের কথা বলিয়াছেন, সক্রিয়তাই তাহার ধর্ম।

কাতরোক্তি যত গভীর ইত্যাদি—বাঙালী বহুকাল দুঃখ ভোগ করিয়া আসিয়াছে; সুতরাং দুঃখ সম্পর্কে তাহার অনুভূতি নিরতিশয় তীব্র। কাতরোক্তি গভীর হইলেও বাঙালী তাহা অনুভব করিতে পারে।

নবপ্রসূত পক্ষিশাবক হইতে ইত্যাদি—যাহা কিছু গভীর উক্তি, কমলাকান্ত তাহাকেই কতরোক্তি বলিয়াছেন। বস্তুত মানুষের অন্তর ব্যাকুলিত না হইলে সে কোনো গভীর কথা বলিতে পারে না। যথার্থ সুখ এবং যথার্থ দুঃখ পরস্পর বিজড়িত হইয়া আছে। দুঃখের মধ্যে অতীত বা ভাবী সুখের আশা থাকে, আবার সুখের সময়েও অতীতের দুঃখের স্মৃতি লুকাইয়া থাকে।

দেবপাল দেব—বাংলার পাল বংশের তৃতীয় রাজা। ইনি রাজচক্রবর্তী ধর্মপালের পুত্র। ইনি নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করিতেন। ইনি মন্ত্রী কেদার মিত্রের বুদ্ধিবলে উৎকল, হুণ, দ্রাবিড় ও গুর্জরদের পরাজিত করিয়া আপনার রাজ্য বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন।

জয়দেব—জয়দেব গোস্বামী সেন বংশের প্রতিথনামা রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভা-কবি ছিলেন। ভক্ত বলিয়া ইঁহার নাম অনেকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করেন। জয়দেবের সংস্কৃত ভাষায় রচিত গীতগোবিন্দ কাব্য প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের গৌরবোজ্জ্বল নিদর্শন।

গৌড়ী রীতি—সংস্কৃতে বিশেষ রচনারীতি। সমাসবহুল অলংকার-সমৃদ্ধ ও ধ্বনিময় গদ্য রচনা রীতি গৌড়ী রীতি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। গৌড়ের গদ্যরচয়িতারা সাধারণত এই রীতিতেই গ্রন্থ রচনা করিতেন।

শ্মশান-ভূমি আছে—নবদ্বীপ—নবদ্বীপ গৌড়ের রাজধানী ছিল। কিন্তু এখন আর এই নগরে ঐশ্বর্যের সমারোহ নাই; ইহা একটি গণ্ডগ্রামে পরিণত হইয়াছে। এখানে বাংলার গৌরব ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ইহাকে শ্মশান বলিয়াছেন।

মনে মনে দেখিতে পাই ইত্যাদি—বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গরাজলক্ষীর তিরোধানের একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনাটিতে চিত্র ও তাঁহার মনের আবেগ দুইই জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। অমঙ্গলের নিদর্শনস্বরূপ যে কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে সেগুলির কয়েকটি পুরাতন হইলেও বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনাগুণে সেগুলি নূতন আকার ধারণ করিয়াছে।

ত্রয়োদশ সংখ্যা

বিড়াল

পরিচয়—উনবিংশ শতাব্দীতে মার্কস্ বা এঙ্গেল্স্-প্রচারিত সাম্যবাদ এ দেশে বিশেষ প্রচারিত হয় নাই। তবে বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্ত্য সমাজতন্ত্রবাদ বা সাম্যবাদের সহিত কিছুটা পরিচিত ছিলেন। যে অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও তথ্যাবলীর ভিত্তিতে আধুনিক সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত তাহা বঙ্কিমচন্দ্রকে আকৃষ্ট করিয়াছিল কিনা তাহা জানা যায় না ,. তবে উদার মানব-প্রীতির দৃষ্টিতে তিনি সাম্যতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের সময় হইতে একদল আদর্শবাদী মানুষে মানুষে যে সাম্যের বাণী প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। তিনি 'সাম্য' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহাতে সাম্যবাদের গোড়ার কয়েকটি কথা বলিয়া বাংলাদেশের কৃষকদের সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন। তবে এই গ্রন্থের প্রথম মুদ্রণ নিঃশেষিত হইলে তিনি ইহার দ্বিতীয় মুদ্রণের কোনো ব্যবস্থা করেন নাই। সম্ভবত, সাম্যবাদ তাঁহার সময় এ দেশের পক্ষে অনুপযোগী হইবে মনে করিয়া তিনি এই গ্রন্থের প্রচারে বিশেষ উৎসাহিত হন নাই।

'বিড়াল' নামক সংখ্যাটিতে বঙ্কিমচন্দ্র বিড়াল ও কমলাকান্তের কথোপকথনের মধ্য দিয়া সাম্যবাদের আদর্শগত দিকটি পরিস্ফুট করিয়াছেন। অবশ্য বর্ণনার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে কৌতুকরস সঞ্চার করায় রচনাটি উপভোগ্য হইয়াছে।—কমলাকান্ত একদিন চারপায়ীর উপর বসিয়া হুঁকা হাতে ঝিমাইতে ঝিমাইতে ভাবিতেছিলেন যে, তিনি যদি নেপোলিয়ন হইতেন তাহা হইলে ওয়াটার্লু জিতিতে পারিতেন কিনা। হঠাৎ একটি 'মেও' শব্দ শুনিয়া তাঁহার মনে হইল যে, ওয়াটার্লু-বিজয়ী ওয়েলিংটন বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার নিকট আফিম ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। ওয়েলিংটনকে আর পুরস্কার দেওয়া হইবে না—কমলাকান্ত এই কথা বলিবেন মনে করিতেছিলেন, এমন সময় আবার 'মেও' শব্দ হইল। কমলাকান্ত চোখ মেলিয়া

চাহিয়া দেখিলেন যে, একটি বিড়াল প্রসন্ন তাঁহার জন্য যে দুধ রাখিয়া গিয়াছিল তাহা পান করিয়া 'মেও' বলিয়া ডাকিতেছে। বিড়ালকে মারিবার জন্য কমলাকান্ত হুঁকা রাখিয়া একটি ভাঙা লাঠি লইয়া অগ্রসর হইলে বিড়াল আবার বলিল 'মেও'। কমলাকান্ত দিব্য কর্ণে বিড়ালের কথা শুনিতে পাইয়া শয্যায় ফিরিয়া হুঁকা লইলেন।

বিড়াল বলিল—মানুষে সুখাদ্য খায় আর আমরা তাহা পাইব না কেন—মানুষের মতো আমাদেরও ক্ষুধাতৃষ্ণা আছে। এই দুধটুকু খাওয়ায় আমার উপকার হওয়ায় তোমার ধর্মসঞ্চয় হইয়াছে। আমি খাইতে না পাইয়া চুরি করিয়াছি। চোর অভাবে পড়িয়া চুরি করে—ইহার জন্য যে অধর্ম তাহা কৃপণ ধনীর। আমি ক্ষুধাতুর হইয়া বেড়াই, কেহ আমাকে কিছু দেয় না। দরিদ্রের জন্য কেহ চিন্তা করে না—ধনীর জন্য সকলেই ভাবিয়া আকুল হয়। আমি না হইয়া কোনো পণ্ডিত আসিয়া এই দুধ খাইলে তাহাকে আপ্যায়িত করিতে। আমি আহারের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াই, কেহ আমার দিকে ফিরিয়া চাহে না; কিন্তু কোনো ধনীর পালিত বিড়াল হইলে আমার ভোগের অবধি থাকিত না। আমাদের আর্তি শুনিয়া তোমাদের কি দয়া হয় না? নির্দয়তার কি শাস্তি নাই? দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়াই ধনী ধন আহরণ করে; দরিদ্র চুরি করিবেই, কেহ অনাহারে মরিতে চাহে না।

কমলাকান্ত বিড়ালকে থামাইয়া বলিলেন যে, তাহার কথা সোশিয়ালিস্টিক; নির্বিঘ্নে ধন সঞ্চয় করিতে না পারিলে কেহ ধন সঞ্চয় করিবে না, সমাজে ধনবৃদ্ধি হইবে না। বিড়াল বলিল যে, ধনীর ধনবৃদ্ধিতে দরিদ্রের লাভ নাই—খাইতে না পাইলে সামাজিক ধনবৃদ্ধিতে দরিদ্রের কী হইবে? কমলাকান্ত ধনীর সামাজিক উন্নতিতে প্রয়োজন আছে বলিয়া চোরের দণ্ডবিধান কর্তব্য এই কথা বলায় বিড়াল বলিল যে, চোরকে শাস্তি দিবার পূর্বে বিচারক তিন দিন না খাইলে তাঁহার চুরি করিয়া খাইবার ইচ্ছা না হইলে তিনি চোরকে শাস্তি দিতে পারিবেন। বিড়ালকে তর্কে পরাস্ত করা অসম্ভব দেখিয়া কমলাকান্ত তাহাকে উপদেশ দিয়া বলিলেন যে, তাহার কথা নীতিবিরুদ্ধ, এই সব কথা ত্যাগ করিয়া সে ধর্মাচরণে মন দিক। কমলাকান্ত তাহাকে হাঁড়ি খাইতে বারণ করিয়া প্রয়োজন হইলে সরিষা পরিমাণ আফিম দিবেন বলিলেন। আফিমে প্রয়োজন নাই জানাইয়া বিড়াল চলিয়া গেল।

পাঠপ্রসঙ্গে—আমি যদি নেপোলিয়ন হইতাম ইত্যাদি—ইউরোপের ইতিহাস উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত সমাজে বিশেষ পরিচিত ছিল—বঙ্কিমচন্দ্র একটি পরিচিত প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন ওয়াটার্লু যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি ডিউক অব ওয়েলিংটনের নিকট পরাজিত হন।

ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া ইত্যাদি—কৌতুকের লঘু ভঙ্গিটি লক্ষ্যণীয়। 'আমার দুর্গোৎসব' ও 'একটি গীত' এই দুইটি গুরু প্রসঙ্গের পর 'বিড়াল' ও 'ঢেঁকি' এই দুইটি রচনায় লঘু কৌতুকের সুরটি ফিরিয়া আসিয়াছে।

দুধ আমার বাপের নয় ইত্যাদি—এখানে কমলাকান্তের বিশিষ্ট অধিকারবোধ প্রকাশিত হইয়াছে। যাহার প্রযোজন আছে তাহারই কোনো বস্তুতে অধিকার আছে—সমভোগবাদের এই ভাবটির অনুসরণেই সম্ভবত কমলাকান্ত এই মতটি পোষণ করিয়াছেন।

সকাতর চিত্তে—এই কাতরতা বিড়ালের দুগ্ধপানের জন্য নয—আরাম ত্যাগ করিয়া শয্যা হইতে উঠিতে হয বলিয়া কমলাকান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন।

প্রভেদ কি—মানুষ ও বিড়ালের মধ্যে পার্থক্য বলিতে এখানে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে প্রভেদের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

তোমাদের বিদ্যালয় সকল দেখিযা ইত্যাদি—বিড়াল বিদ্যালযের শিক্ষকদের চতুষ্পদ প্রাণী গর্দভের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

তাঁহাদের প্রযোজনাতীত ধন থাকে ইত্যাদি—ধনীরা যে ধন সঞ্চয করে তাহার মধ্যে নিতান্ত অল্প অংশই তাহাদের প্রয়োজনে লাগে। তাহাদের সঞ্চিত ধনের অধিকাংশই তাহাদের প্রয়োজনে লাগে না। তাহারা যে ধন সঞ্চয করে তাহা দরিদ্রের অংশ—দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া তাহারা ধন সঞ্চয করে। এই প্রযোজনাতিরিক্ত ধনসঞ্চয সমাজতন্ত্রবাদে নিন্দিত। ইহার জন্যই ধনী-দরিদ্রে বৈষম্য ঘোরতর হইয়া উঠে এবং দরিদ্রের অভাবের সীমা থাকে না। দরিদ্রের জন্য ধনীরাই পরোক্ষভাবে দায়ী।

মাছের কাঁটা, পাতের ভাত নর্দ্দমায ফেলিয়া দেয ইত্যাদি—ধনীরা উদ্বৃত্ত অর্থ অপব্যয করে অথচ তাহা দিযা কত দরিদ্রকে প্রতিপালন করা যায়। দরিদ্রের দুঃখমোচনের কথা চিন্তা না করিয়া তাহারা কেবল আপনাদের খেয়ালে অর্থের অপচয় করে।

ছোটলোকের দুঃখে কাতর ইত্যাদি—এই ছত্রের অন্তরালে বঙ্কিমচন্দ্রের সহৃদয় চিত্তের গভীর ক্ষোভ ব্যক্ত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র অভিজাত-সম্প্রদায়ের কথাই কেবল চিন্তা করিযাছেন বলিযা যে একটি অভিযোগ অনেকে তাঁহার বিরুদ্ধে উপস্থাপনা করিযাছেন, এই ধরণের বহু ছত্রে তাহা খণ্ডিত হইয়াছে। স্বদেশ ও বিদেশের সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ অংশের সহিত পরিচিত হইলেও বঙ্কিমচন্দ্র নিছক

বুদ্ধিজীবী ছিলেন না, তিনি আপনার হৃদয়কে দেশের সাধারণ দরিদ্র মানুষদের দিকেও প্রসারিত করিয়া দিয়াছিলেন।

এ পৃথিবীর মৎস্য-মাংসে ইত্যাদি—ইহাই এযুগের সর্বহারাদের দাবি। সকল বিষয় হইতে বঞ্চিত হইয়া কোনো মতে জীবনযাপন করাকেই তাহারা ভাগ্য বলিয়া মানিয়া লইতে পারে না—মানুষের অধিকার লইয়া মানুষের মতো বাঁচিবার দাবিই তাহাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে মানবতার অধিকারের আদর্শ প্রচারিত হইয়াছিল—ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিল্পবিপ্লবের পর অর্থনৈতিক জীবন প্রাধান্য লাভ করায় এই নূতন সুরটি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

তবে আর কেহ ধনসঞ্চয় করিবে না ইত্যাদি—ইহা সমাজতন্ত্র-বিরোধী পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদ্‌দের যুক্তি। ধনীরা অবাধে ধন সঞ্চয় না করিতে পারিলে তাহারা ধন সঞ্চয়ই করিবে না এবং তাহাতে সমাজের ক্ষতি হইবে—এই প্রতিক্রিয়াশীল যুক্তিকে বঙ্কিমচন্দ্র কটাক্ষই করিয়াছেন।

আমি যদি খাইতে না পাইলাম ইত্যাদি—বঙ্কিমচন্দ্র বিড়ালের মুখে বস্তুনিষ্ঠ সমাজতন্ত্রবাদীর কথা বসাইয়াছেন।

বিজ্ঞ লোকের মত এই যে ইত্যাদি—যুক্তির দিক দিয়া সমাজতন্ত্রবাদ যে অকাট্য কমলাকান্তের উক্তিতে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। কৌতুকের ভঙ্গিটি উপভোগ্য।

পার্কার—থিয়োডর পার্কার। প্রখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদ্ লেখক। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে যাঁহারা ধর্মতত্ত্বান্বেষী ছিলেন, পার্কারের গ্রন্থাবলী তাঁহাদের নিত্যপাঠ্য ছিল।

পতিত আত্মাকে অন্ধকার হইতে ইত্যাদি—বঙ্কিমচন্দ্র এখানে খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের পতিতোদ্ধারের আদর্শ এবং সম্ভবত ব্রাহ্মধর্মের সংস্কারের আদর্শকে কটাক্ষ করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্মের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব অনুকূল ছিল না—ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার একাধিকবার মতান্তর হইয়াছিল।

চতুর্দশ সংখ্যা

ঢেঁকি

পরিচয়—কমলাকান্ত ঢেঁকিকে কোন বিষয়ের প্রতীকরূপে গ্রহণ করেন নাই; ঢেঁকি দেখিয়া তাঁহার মনে যে সব ভাবের উদয় হইয়াছে সেইগুলিই বর্ণনা করিয়াছেন মাত্র। তবে ঢেঁকিকে পরোপকারের যান্ত্রিক প্রবৃত্তির নিদর্শন এবং পেষণযন্ত্র-রূপে দেখিবার প্রচেষ্টা আছে এই মাত্র।

কমলাকান্ত একদিন চিন্তা করিয়াছেন যে, ঢেঁকি না থাকিলে তাঁহার পক্ষে খাওয়া দুষ্কর হইত। হয় তাঁহাকে পাখির মতো দাঁড়ে বসিয়া ধান খাইতে হইত, আর না হয় গোরুর মতো ধানের মরাইয়ে মুখ দিতে গিয়া প্রহার লাভ করিতে হইত। ঢেঁকি আছে বলিয়া সে ভাবনা নাই। আর্য সভ্যতার এই সৃষ্টিটি আর্যসাহিত্য, আর্যদর্শন প্রভৃতির চেয়ে বড়ো। ঢেঁকি নানা মূর্তিতে আর্য সভ্যতাকে পিণ্ডদান করিতেছে; ক্ষোভের বিষয় এই যে, আর্য সভ্যতা এখনও মুক্তিলাভ করে নাই।

কমলাকান্ত ঢেঁকির পরোপকার প্রবৃত্তির কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য ঢেঁকিশালে গেলেন; গিয়া দেখিলেন যে, ঢেঁকি খানায় পড়িতেছে। খানায় পড়াই তাহার পরোপকার প্রবৃত্তির কারণ কি না তাঁহার সন্দেহ হইল। রামচন্দ্র ভায়া দুইবেলা খানায় পড়েন, কিন্তু শৌণ্ডিকালয়ের বাহিরে তাঁহার পরোপচিকীর্ষার পরিচয় পাওয়া যায় না। মঙ্গলা গাইয়ের তাড়ায় কমলাকান্তও একদিন খানায় পড়িয়াছিলেন। তখন পরোপচিকীর্ষার বশবর্তী হইয়া তিনি প্রসন্নকে স্বয়ং লাউ ভুসি খাইয়া দুগ্ধদান করিতে এবং না গুঁতাইতে বলিয়াছিলেন। প্রত্যুত্তরে প্রসন্ন সমার্জনী গ্রহণ করায় কমলাকান্তকে পরহিতব্রত ত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

খানায় পড়াই যখন পরহিতব্রতের কারণ নয় তখন আর কি কারণ থাকিতে পারে—কমলাকান্ত যখন মনে মনে এই আলোচনা করিতেছেন এমন সময় বামাকণ্ঠে সম্বোধন শুনিয়া তিনি দেখিলেন যে, তরঙ্গিনী মাতঙ্গিনী দুই ভগিনী ঢেঁকিতে পাড় দিতেছে। দেখিয়া কমলাকান্তের দিব্যজ্ঞানের উদয় হইল—রমণী পাদপদ্মই ঢেঁকির পরোপচিকীর্ষার মূল। নারীর শ্রীচরণ পিঠে পাইয়াই ঢেঁকি ধান ভানিয় সাত কোটি বাঙালীর অন্নের ব্যবস্থা করিতেছে। ঢেঁকি এমনিতে দারুময় কিন্তু মেয়েলাথিই তাহাকে ধান ভানায়। ঢেঁকি আবার মধ্যে মধ্যে ঘরে থাকিয়

কুমীর হয়। স্বর্গের ভোগের মধ্যেও ঢেঁকি কেবল ধানই ভানে কি না কমলাকান্ত ঢেঁকিকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

ঢেঁকি কোনো উত্তর না দিয়া কেবল ধান ভানিয়া চলাতে কমলাকান্ত নিজের আশ্রমে ফিরিয়া গিয়া চারপায়ীর উপর সমাসীন হইয়া আফিম চড়াইলেন। তখন তিনি জ্ঞাননেত্রে দেখিলেন যে, এই সংসার ঢেঁকিশাল। সকলেই কোনো না কোনোরূপ জিনিস পিষিয়া অপর একটি জিনিস বাহির করিতেছে। দেখিতে দেখিতে তাঁহার মনে হইল যে, তিনি নিজেও একটি ঢেঁকি—নেশার গড়ে মনোদুঃখ-ধান্য পিষিয়া দপ্তর চাউল বাহির করিতেছেন। তাঁহার মনে হইল যে, এ চাউল মনুষ্য-লোকের উপযোগী নয়—তিনি স্বর্গে গিয়া ধান ভানিবেন। মনোরথে স্বর্গে গিয়া তিনি ইন্দ্রকে জানাইলেন যে, তিনি কমলাকান্ত ঢেঁকি, স্বর্গে ধান ভানিতে আসিয়াছেন। ইন্দ্র তাঁহার প্রার্থিত পুরস্কার কি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, তিনি উর্বশী; মেনকা ও রম্ভা পুরস্কার চাহেন। ইন্দ্র তাঁহাকে আটটার হিসাবে রম্ভা দিতে রাজি হইলেন এবং কমলাকান্তের কথায় খুশি হইয়া তাঁহাকে একসের অমৃত ও একঘণ্টার জন্য উর্বশীর গীত শুনাইতে রাজি হইলেন। কমলাকান্ত সচেতন হইয়া দেখিলেন যে, প্রসন্ন একসের দুধ লইয়া আসিয়া তাঁহাকে গালিগালাজ করিতেছে। কমলাকান্ত তাঁহাকে উর্বশী সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, একঘণ্টা হইয়াছে, সুতরাং সে যেন গান বন্ধ করে।

পাঠপ্রসঙ্গে—আর্য্য সভ্যতার অনন্ত মহিমায়—ঢেঁকি ভারতবর্ষেই দেখা যায়। সেইজন্য কমলাকান্ত ইহাকে আর্য সভ্যতার বিশেষ দানরূপে কল্পনা করিয়াছেন। ঢেঁকির উদ্ভাবনের জন্য আর্য সভ্যতার মাহাত্ম্য-কল্পনার মধ্যে কৌতুকের ভাবটি লক্ষ্যণীয়।

নিত্য পিণ্ডদান করিতেছে—শ্রাদ্ধের সময় তণ্ডুলাদি দিয়া পিণ্ড দান করিতে হয়। ঢেঁকি নিত্য চাল দিতেছে বলিয়া কমলাকান্ত তাহাকে নিত্য শ্রদ্ধাধিকারী বলিয়াছেন।

দুঃখের মধ্যে ইহাতেও আর্য্য সভ্যতা ইত্যাদি—প্রাচীন যুগের আর্য সভ্যতার মৃত্যু হইয়াছে। বর্তমানে তাহার যে মূর্তি দেখা যায় তাহা 'ভূতে'র মূর্তি। তবে মনে হয় যে, গয়ায় পিণ্ডদান করিলে যেমন প্রেতযোনি মুক্ত হয়, তেমনই বর্তমান যুগের 'ঢেঁকি'দের কৃতিত্বে আর্য সভ্যতার অবসান হইবে। 'ভূত' শব্দে প্রেতযোনি ও অতীত 'গয়া' শব্দে গয়া তীর্থে মুক্তি ও বিলোপ এবং ঢেঁকি শব্দে সাধারণ ঢেঁকি ও

এ যুগের ভারতীয় কর্ম—এই দুই জোড়া অর্থ লক্ষ্যণীয়।—এই অংশে কৌতুকের লঘু সুরটি ফুটিয়া উঠিলেও ইহার মূলে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি গভীর বেদনাবোধ আছে।

শৌণ্ডিকালয়ের বাহিরে ইত্যাদি—অর্থাৎ রামচন্দ্র শৌণ্ডিকালয়ে মদ্যপানের জন্য ব্যয়শৌণ্ডতার পরিচয় দিয়া পরের অর্থাৎ শৌণ্ডিকের অর্থপ্রাপ্তিরূপ উপকার করেন।

দুগ্ধপোষ্য বাঙ্গালী জাতি—শিশু দুগ্ধপোষ্য। বাঙালী দুগ্ধ পান করে এবং সে শিশুর মতো অসহায় ও প্রতিপালনীয়। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে কৌতুকের আবরণে বাঙালী জাতির শক্তিহীনতার প্রতি কটাক্ষ করিয়া অন্তরের ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন।

তুমি স্বয়ং ঘটোঘ্নী হইয়া ইত্যাদি—কমলাকান্তের কল্পনার অভিনবত্ব লক্ষ্যণীয়।

সাধারণ আত্মা—public spirit শব্দগুচ্ছটির কমলাকান্তকৃত বঙ্গানুবাদ। কমলাকান্তকৃত এই বঙ্গানুবাদটি ইংরেজী শব্দের আক্ষরিক অনুবাদের প্রয়াসের প্রতি কটাক্ষ।

ওহে ভাই ঢেঁকির দল ইত্যাদি—কমলাকান্ত এখানে বাংলার পুরুষবৃন্দকে কটাক্ষ করিয়াছেন। বাঙালী পুরুষদের অনেকেই নির্জীব ; কেবল পত্নীর তাড়নায় তাহারা কোনো কাজ করিতে প্রবৃত্ত হয়। রমণী কর্তৃক তাড়িত না হইলে তাহাদের কার্যোদ্যম দেখা যায় না।

ঘরের মধ্যে থাকিয়া ইত্যাদি—কমলাকান্ত 'ঘরের ঢেঁকি কুমীর' এই প্রবাদ বচনটি স্মরণ করিয়াছেন। পরে তিনি 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে' এই প্রবাদটির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।—'ঢেঁকি' শব্দটি সাধারণত অপদার্থতা বা বুদ্ধিহীনতার প্রতীকরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। কমলাকান্ত ঢেঁকিকে বিচিত্ররূপে দেখিয়াছেন—প্রবাদ রচনাদিতে ঢেঁকি সম্পর্কে যে ধারণাগুলি প্রচলিত সেগুলি তাঁর কল্পনা হইতে বাদ যায় নাই।

নিরিখ—খাজনার হার।

জমিদাররূপ ঢেঁকি প্রজাদিগের হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি—খাজনা আদায়ের জন্য বা অন্য কারণেও জমিদার প্রজার উপর যে অত্যাচার করে বঙ্কিমচন্দ্র তাহা 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে ব্যক্ত করিয়াছেন। নির্যাতিত প্রজাদের প্রতি তাঁহার অকুণ্ঠ সহানুভূতি ছিল।

মিনিট-রিপোর্টের রাশি গড়ে ভাঙিয়া-পিষিয়া—আইনকারগণ যে আইন প্রণয়ন করেন সেগুলি প্রায়ই বিচারবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। নিছক বিভিন্ন বিবরণীর উপর নির্ভর করিয়া অনেক আইন প্রণীত হয়।

গৃহিণী ঢেঁকি একাদশীর গড়ে ইত্যাদি—গৃহিণী একাদশীর দিন বাজার খরচ

কমাইতে কমাইতে সকলের অনাহারের ব্যবস্থা করিতেছেন। যেখানে ব্রতের উদ্দেশ্য ছিল অল্পাহার সেখানে তিনি অনাহারের বিধান দিয়াছেন।

সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক দেখিলাম ইত্যাদি—সাধারণ বিদ্যালয়-পাঠ্যপুস্তকে যাহা পরিবেশিত হয় তাহার মান এত নিকৃষ্ট যে, তাহাতে বাগ্‌দেবীকে নিপীড়ন করার কল্পনা অসংগত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের আমলে বিদ্যালয়-পাঠ্যগ্রন্থের মান নিতান্তই নীচু ছিল।

মনোদুঃখ-চাউল পিষিয়া—ইহাই কমলাকান্তের মর্মবাণী। দপ্তরের মধ্যে যাহা ব্যক্ত হইয়াছে তাহার প্রায় সবটার মূলেই বঙ্কিমচন্দ্রের মনোবেদনা প্রত্যক্ষভাবে বা প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান। শিল্পী ও চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র আপনার হৃদয়ের বেদনাকে প্রকাশ করার জন্য দপ্তর-রচনার বিশিষ্ট ভঙ্গিটি গ্রহণ করিয়াছেন।

কমলাকান্তের পত্র

দপ্তরগুলির রচনা ও প্রকাশের প্রায় দশ বৎসর পরে কমলাকান্তের পত্রগুলি প্রকাশিত হইল। দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির পর বঙ্কিমচন্দ্র এই কয়খানি পত্র লইয়া কমলাকান্তকে পুনরায় বঙ্গদর্শনে হাজির করিয়াছেন। কমলাকান্ত-চরিত্রটির পরিকল্পনা এমনি করা হইয়াছে যে, ত্রিভুবনের যে-কোনো বিষয়ে বা মানব মনের যে-কোনো ভাব অবলম্বন করিয়া কমলাকান্ত তাহার ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও মর্মজ্বালা বর্ষণ করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই। পত্রগুলিতে দেখা যায় যে, বিদ্রূপ তীক্ষ্ণতর হইয়াছে, কবিত্ব হ্রাস পায় নাই। কমলাকান্তের পরিহাস-বিজড়িত উক্তিগুলি ধারালো তীরের মত লক্ষ্য-স্থানগুলি বিদ্ধ করিয়াছে। পত্রাবলীতে ছোট-বড় পাঁচটি পত্র আছে।

প্রথম সংখ্যা

কি লিখিব

দীর্ঘকাল পরে কমলাকান্ত বঙ্গদর্শন সম্পাদকের নিকট কি জাতীয় রচনা লিখিলে প্রয়োজনমত আফিম পাওয়া যাইতে পারে তাহা জানিতে চাহিয়া প্রথম পত্রটি লিখিয়াছিলেন। এই পত্রটি আগাগোড়া শ্লেষ ও বিদ্রূপপূর্ণ। সম্পাদক, লেখক, পাঠক কেহই বাদ পড়ে নাই। কমলাকান্ত এতকাল জানিতেন না যে, তাঁহার

দপ্তরটি ভীষ্মদেব খোসনবীশ বঙ্গদর্শন সম্পাদকের নিকট বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন। ইহা জানিতে পারিলেন যখন তিনি এক জোড়া জুতা কিনিয়া ছাপার কাগজে বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছেন। কমলাকান্ত ভাবিতেছেন যে, কে এই ভাগ্যবান লেখক—যাঁহার রচনা কমলাকান্তের পাদুকা দুটিকে মণ্ডিত করিয়াছে। কাগজখানি পড়িয়া দেখিলেন যে, উপরে লেখা রহিয়াছে 'বঙ্গদর্শন' এবং ভিতরে লেখা রহিয়াছে 'কমলাকান্তের দপ্তর'। কমলাকান্ত বুঝিলেন যে, তাঁহার লেখনীধারণ এতদিনে সার্থক হইয়াছে। বন্ধুবান্ধবগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া অনেক অনুসন্ধানের পর কমলাকান্ত জানিলেন যে, বঙ্গদর্শন একখানি মাসিক পত্রিকা এবং তাহাতে কমলাকান্তের লেখা মাসে মাসে বাহির হয়।

কমলাকান্তের পত্র লিখিবার উদ্দেশ্য আছে। তাঁহার পৃষ্ঠপোষক নসীবাবু ইহলোকে নাই। কমলাকান্ত এখন নিরাশ্রয়। সর্বোপরি তাঁহার আফিমের বড় অভাব হইয়াছে। লেখার মূল্য বাবদ পোয়াখানেক আফিম পাঠাইলেই কমলাকান্ত লিখিতে পারেন। ফরমাস মত সবরকম রচনা পাঠাইতেই তিনি প্রস্তুত। নাটক, নভেল, পলিটিক্স, ঐতিহাসিক গবেষণা, সাহিত্য সমালোচনা, বিজ্ঞান, ভূগোল সব জিনিসই তিনি লিখিতে পারেন। গুরু লঘু সবরকম প্রবন্ধই তিনি পাঠাইতে পারেন। সম্পাদক মহাশয় যদি কোটেশন অথবা ফুটনোট ভালবাসেন তবে কমলা-কান্ত সেই অনুসারে লিখিতে পারেন। বহু ভাষা হইতে তিনি কোটেশন দিতে পারেন। গুরু বিষয়ের মধ্যে ইতিহাস, পাটীগণিত, জ্যামিতি বা ত্রিকোণমিতি প্রভৃতিতে তাঁহার অধিকার আছে। এই প্রসঙ্গে কমলাকান্ত এম. এ. পাস এক গবেষকের সাহায্য পাইতে পারেন। তিনি অদ্ভুত গবেষণাবলে ইংল্যাণ্ড ও চিতোরের ইতিহাসের সহিত মহাভারতের কাহিনী মিলাইয়া হারবার্ট স্পেন্সার ও ডারউইনের তত্ত্বের সহিত সংস্কৃত নাটকের শ্লোক মিশাইয়া এমন একটি ভয়ঙ্কর গবেষণাগ্রন্থ লিখিয়া ফেলিয়াছেন যে, বাংলাভাষায় আর তাঁহার জুড়ি নাই। কমলাকান্ত প্রয়োজন হইলে এই লেখকের সাহায্য লইতে পারিবেন।

নাটক, নভেল বা কাব্য এইসব বিষয়ের প্রতি যদি সম্পাদক মহাশয়ের আকর্ষণ থাকে তবে কমলাকান্ত সেইদিকেও চেষ্টা করিতে পারেন।

পাঠপ্রসঙ্গে—আপনি কোটেশন ভালবাসেন বা ফুটনোটে আপনার অনুরাগ—পাণ্ডিত্যাভিমানী লেখক ও লেখার ভড়ং দেখিয়া যারা ভড়কাইয়া যায় সেই সব সম্পাদক বা প্রকাশক উভয়ের উপর এই বিদ্রূপ বর্ষিত হইয়াছে। চিতোরের রাজা আলফ্রেড দি গ্রেট—অপরিমিত দম্ভ লইয়া যে সমস্ত শিক্ষাভিমানী গবেষণা-কার্যে

প্রবৃত্ত হন তাঁহাদের অজ্ঞতা যে কত শোচনীয় কয়েকটি উদাহরণের মধ্যে দিয়া চার-পাঁচ ছত্রে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে।

একখানি নাটকের সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখিয়াছেন—এখানে কমলাকান্তের পরিহাস চরমে উঠিয়াছে। নাট্যকার নায়ক-নায়িকার নাম ঠিক করিয়াছেন এবং নায়িকা শেষ দৃশ্যে নায়কের বুকে ছুরি মারিয়া ছুরি হস্তে গান গাহিবেন—এইটুকু মাত্রই স্থির হইয়াছে। কিন্তু কাহিনী কিরূপ হইবে, নাটকীয় জটিলতা কিভাবে বৃদ্ধি পাইবে সংলাপ কিরূপ হইবে এই সব কিছুই এখনও চিন্তা করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

মেকলের এসের পরিশিষ্ট বইখানি প্রবন্ধপুস্তক না উপন্যাস সে সম্বন্ধে যাহার জ্ঞান নাই তাহাকে লইয়া কমলাকান্ত বিদ্রূপ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় সংখ্যা

পলিটিক্স

বঙ্গদর্শন সম্পাদকের নিকট হইতে ফরমাস আসিয়াছে কমলাকান্তকে পলিটিক্স সম্বন্ধে লিখিতে হইবে। কমলাকান্তের ধারণা ছিল খোসামুদে জুয়াচোর ভিক্ষুক ও সম্পাদক ছাড়া কেহ পলিটিক্স লিখিতে পারে না। তারপর পরাধান জাতির কোনো পলিটিক্স থাকিতে পারে না।—সপ্তদশ অশ্বারোহী যে জাতিকে জয় করে সে জাতির আবার রাজনীতি কি? জয় রাধে কৃষ্ণ ভিক্ষা দাও, ইহাই একমাত্র পলিটিক্স।

হঠাৎ কমলাকান্তের চোখে পড়িল যে, কলুর ছেলে এক কাঁসি ভাত আনিয়া উঠানে বসিয়া খাইতেছে, দূর হইতে একটি কুকুর তাহা দেখিতে পাইয়া ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিতেছে। কলুর ছেলে ভাত খাইয়া চলিয়াছে আর কুকুরটি কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া উহা দেখিয়া তারপর ধীরে ধীরে একপা একপা করিয়া আগাইয়া আসিয়া ভাতের থালার নিকটে হাজির হইল। কলুর ছেলে কিছু বলে না, কুকুরও কাছে আসিয়া লেজ নাড়ে। কলুর ছেলে কুকুরের পাতলা পেট, রোগা শরীর, কাতর দৃষ্টি ও ঘন ঘন নিঃশ্বাস দেখিয়া একখানা মাছের কাঁটা কুকুরের দিকে ফেলিয়া দিল। কমলাকান্ত দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন এই ত রাজনীতি—কুকুরটি চমৎকার পলিটিসিয়ান। তাহার পলিটিক্যাল এজিটেসানের ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সাহস পইয়া কুকুরটি আরও একটু আগাইল। মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য একটু একটু শব্দ করিতে লাগিল। ভাবটা এই—যাহা দিয়াছ তাহাতে পেট ভরে নাই। কলুর ছেলে আর একবার চাহিয়া এক মুঠি ভাত কুকুরকে ফেলিয়া দিল—

কুকুরের ত মহা আনন্দ। এমন সময় কলুগিন্নী ঘর হইতে বাহির হইয়া দেখিল যে, তাহার ছেলের কাছে একটি কুকুর বসিয়া খাইতেছে। সে রাগিয়া ঢিল ছুঁড়িল—কুকুর ল্যাজ গুটাইয়া পলায়ন করিল।

এই সময় আর একটি দৃশ্য কমলাকান্তের চোখে পড়িল। কলুর ঘানি টানিবার বলদগুলি যেখানে খৈল বিচালি খাইতেছিল সেখানে একটি প্রকাণ্ড ষাঁড় আসিয়া নাদায মুখ দিল। ষাঁড়ের আকৃতি ও প্রকৃতি দেখিযা বলদগুলি চুপ করিযা দাঁড়াইয়া রহিল। কলুগিন্নী একখানা বাঁশ লইযা ষাঁড়কে তাড়াইতে আসিল, কিন্তু ষাঁড় তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিযা শিং উঁচাইযা এমন কাণ্ড করিল যে, কলুগিন্নী স্বস্থানে প্রস্থান করিল। ষাঁড়টি সমস্ত খৈল বিচালি উদরসাৎ করিযা ধীরে ধীরে হেলিতে দুলিতে চলিযা গেল।

এও আর এক ধরণের পলিটিক্স—পৃথিবীতে যত পলিটিসিযান আছে তাহাদের কেহ কুকুর জাতীয়, কেহ ষাঁড় জাতীয)

জয রাধে কৃষ্ণ ভিক্ষা দাও গো—প্রথম দিকে আমাদের দেশের পলিটিক্যাল এজিটেস্যান ছিল ভিক্ষার নামান্তর—। কেহ নরম সুরে চাহিতেন, কেহ গরম সুরে চাহিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই ভিক্ষাবৃত্তি পছন্দ করিতেন না—ভিক্ষাযাম্ নৈব নৈবচ। ইহাই ছিল তাঁহার মতবাদ। আনন্দমঠের যিনি রচয়িতা তাঁহার পক্ষে ইহা অপ্রত্যাশিত নয়। রবীন্দ্রনাথও এই ভিক্ষাবৃত্তির যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছেন।

জাত পলিটিসিয়ান না হ'বে কেন?—আবেদন-নিবেদন খানিকটা সফল হইলে আবার সাহস পাইয়া আর এক প্রস্থ আবেদন-নিবেদন করা—এইভাবে কিস্তিতে কিস্তিতে কিছু আদায় করিবার চেষ্টা ইহা এক ধরণের পলিটিকস্, কিন্তু ইহারও সীমা আছে; মাত্রা ছাড়াইয়া গেলে ইহাও সফল হয না, অনেক সময ভরাডুবি হইয়া যায। কলুগিন্নীর তাড়ায কুকুরের ল্যাজ গুটাইয়া পলায়নে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে।

বিস্‌মার্ক—জার্মানির চ্যান্সেলার—ইনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি ঐক্যবদ্ধ করিয়া শক্তিশালী জার্মান সাম্রাজ্য গঠন করেন ও তৃতীয় নেপোলিয়নের অধীন ফ্রান্সকে পরাজিত করিযা জার্মানীর শক্তিবৃদ্ধি করেন। কমলাকান্তের মতে বিস্‌মার্ক শক্তির উপাসক। তাঁহার রাজনীতির মূল ভিত্তি সামরিক শক্তি। বৃষ জাতীয় রাজনীতিকের ইনি উদাহরণ।

উল্‌সী—রাজা অষ্টম হেন্‌রীর সময ইনি একজন শক্তিশালী ধর্মযাজক ও মন্ত্রী ছিলেন। পরে নিজের ক্ষমতা লইয়া বাড়াবাড়ি করিতে লাগিলে কার্ডিন্যাল উল্‌সীর পতন হয়।

তৃতীয় সংখ্যা

বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব

কমলাকান্তের অনেক শত্রু, তাঁহার লিখিবার অনেক বাধা। মানুষের সঙ্গ এড়াইয়া আপন মনে খুশি থাকিবার জন্য কমলাকান্ত কয়েকটি ফুলের গাছ লাগাইলেন। গাছে ফুল ফুটিল কিন্তু ফুল দেখিয়া ভোমরার দল ঝাঁকে ঝাঁকে কমলাকান্তের দ্বারে আসিয়া গুনগুন ঘ্যানঘ্যান করিতে লাগিল। কমলাকান্তের ঘর তো আর সভা, লীগ, সোসাইটি বা ক্লাব নয়—এ-ঘরে ভ্রমরের এত ঘ্যানঘ্যান উৎপাত কেন? কিন্তু ভ্রমর তো গেলই না, উপরন্তু কমলাকান্তের কানের কাছে নানাভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানাপ্রকার শব্দ করিতে লাগিল। অগত্যা ভ্রমরের জ্বালাতনে অস্থির হইয়া কমলাকান্ত পাখা লইয়া ভ্রমর তাড়াইতে ব্যস্ত হইলেন কিন্তু তাঁহার সাধ্য কি? ভ্রমরের আক্রোশ যেন বাড়িয়া গেল। ভ্রমর কমলাকান্তের নাকমুখ বেড়িয়া শব্দ করিতে লাগিল—কখনও মাথার চুলের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

চৌকাঠ পায়ে বাধিয়া কমলাকান্ত পড়িয়া গেলেন। এই অবস্থায় আফিমের প্রসাদে দিব্যকর্ণ লাভ করিয়া তিনি শুনিতে পাইলেন ভ্রমর বলিতেছে—আমার ঘ্যানঘ্যানানিতে তুমি এত চটিতেছ কেন? তোমাদের বাংলাদেশে ঘ্যানঘ্যান করে না কে? বাঙালীর একমাত্র ব্যবসাই তো ঘ্যানঘ্যান করা। রাজা-মহারাজেরা বড়লাটের কাছে গিয়া ঘ্যানঘ্যান করিতেছেন। উমেদার ও চাকুরী-প্রার্থী দিবারাত্রি ঘ্যানঘ্যান করিতেছে। যিনি স্বাধীন ব্যবসা করেন তাঁহারও ঘ্যানঘ্যানানির অন্ত নাই। ঘ্যানঘ্যান করিবার সনদ লইয়া উকীলবাবু ছোট-বড় আদালতে ঘ্যানঘ্যানানির ফোয়ারা খুলিয়া দিয়াছেন। কেহ স্থির করিতেছেন ঘ্যানঘ্যান করিয়াই দেশোদ্ধার করিবেন। কাহারও শোকসভায় ঘ্যানঘ্যানানির অন্ত থাকে না। যাঁহারা লেখক তাঁহাদের তো ঘ্যানঘ্যান করাই পেশা। কমলাকান্ত নিজেই তো একটু আফিমের প্রত্যাশায় বঙ্গদর্শনের সম্পাদকের নিকট ঘ্যানঘ্যান করিতেছেন।

বাস্তবিকই বাঙালীর ঘ্যানঘ্যান ভ্রমরের নিকট অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। ভ্রমর পতঙ্গ মাত্র—কিন্তু সে কেবল ঘ্যানঘ্যানই করে না—সে মধু সংগ্রহ করে ও প্রয়োজন-মত হুল ফুটায়। বাঙালী না পারে মধু সংগ্রহ করিতে, না পারে হুল ফুটাইতে। কোনো কাজকর্ম নাই কেবল দিনরাত কাঁদুনে মেয়ের মত ঘ্যানঘ্যান করিয়া

চলিয়াছে। লেখালেখি বকাবকি একটু কম করিয়া ভ্রমর কমলাকান্তকে কাজে মন দিবার উপদেশ দিয়া উড়িয়া গেল।

কমলাকান্ত ভাবিলেন—ভ্রমর কথাগুলি বলিয়া বিশেষ বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছে। না দিবেই বা কেন, কারণ ভ্রমরের পদবৃদ্ধির তুলনা নাই। ইহার একখানি নয়, দুখানি নয়, ছয়খানি পা।

এই বিজ্ঞ পতঙ্গের পরামর্শ অনুসারে কমলাকান্ত ঘ্যানঘ্যান করা বন্ধ রাখিয়াছেন। কেবল বঙ্গদর্শন সম্পাদকের নিকট হইতে কিছু অহিফেন-মধু সংগ্রহ করিতে হইবে।

এই পত্রটিতে সেকালের (কেবল সেকালেরই বা কেন) বাঙালীর একটি স্বভাবের উপর মধুর কটাক্ষ ও মৃদু কশাঘাত আছে। কমলাকান্ত নিজেকেও সমালোচনার ক্ষেত্র হইতে বাদ দেন নাই। সেইজন্য এই পত্রটি উপভোগ্য—ইহার বিদ্রূপ রসাল, ইহাতে জ্বালা নাই।

দ্বিতীয় পত্রটির সহিত এই পত্রটির ভাবসাদৃশ্য রহিয়াছে।

চতুর্থ সংখ্যা

বুড়ো বয়সের কথা

কমলাকান্ত বুড়ো বয়সের কথা লিখিতেছেন। কিন্তু তাঁহার আশঙ্কা আছে নিজের কাছে এই কথা ভাল লাগিলেও হয়তো বুড়ো বয়সের কথার পাঠক জুটিবে না।

কমলাকান্ত একেবারে মৃত্যুর দ্বারে উপনীত না হইলেও তাঁহার যৌবন অতিক্রান্ত হইয়াছে। শেষের দিনের পাথেয় এখনও সংগ্রহ করা হয় নাই। জীবনের ধার-দেনা এখনও সম্পূর্ণ শোধ করা হয় নাই।

একটা কথা আগে মীমাংসা করা প্রয়োজন—বৃদ্ধ কাহাকে বলে? একটা বিশেষ বয়স পাইলেই কি মানুষ বৃদ্ধ হয়? যাহার চুল পাকে নাই, দাঁতও পড়ে নাই, যাহার প্রতিরাত্রেই সুনিদ্রা হয়—সেই কি যুবক? আসল কথা কেহ চল্লিশে বৃদ্ধ হয়, কেহ বিয়াল্লিশেও যুবক থাকে। প্রাচীনতা বয়সেরই ফল—ব্যক্তিবিশেষে প্রকৃতি-ভেদে কিছু কিছু তারতম্য ঘটে। যে পঁয়ত্রিশে বৃদ্ধ সাজে, তাহার ব্যক্তিগত কারণ

আছে। হয়তো জীবনে তাহার দুঃখ অনেক। যে পঁয়তাল্লিশেও যুবক সাজিয়া বেড়ায় তাহার ব্যক্তিগত পরিবেশ ও মানসিক প্রবণতা ইহার জন্য দায়ী।

প্রথম চশমাখানি রুমাল দিয়া মুছিতে মুছিতে যদি নিজেকে জিজ্ঞাসা করা যায়—বুড়া হইয়াছি কি—তবে কি উত্তর পাওয়া যাইবে? নিজেকে তো বৃদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে মন চায় না। চোখের না হয় সামান্য দোষ হইয়াছে, চুল না হয় দু' একগাছা পাকিয়াছে—কিন্তু পৃথিবী তো আগের মতই নবীন আছে—কোকিলের স্বর তো তেমনি ভাল লাগে—পুষ্পের গন্ধে ও বৃক্ষের শ্যাম শোভা তো আগের মতই আনন্দ দেয়। সবই তেমনি আছে আর আমিই কি বুড়া হইয়া গেলাম! জগতে আলোকের সীমা নাই আর কেবল আমার পক্ষেই অন্ধকার হইয়া গেল! মন সায় দেয় না, বৃদ্ধ হইয়াছি বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয় না।

কিন্তু স্বীকার না করিলে কি হইবে? দিনে দিনে ধীরে ধীরে বয়স আসিয়া গোপনে দেহের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, প্রতি নিশ্বাসে বার্ধক্যের দিকে আগাইয়া যাইতেছে। নিজে বুঝিতে না পারিলেও অন্যের নিকট ইহা গোপন থাকে না।

জীবনের যাহারা সঙ্গী ছিল তাহারা কেহ বিদায় লইয়াছে, কেহ বার্ধক্যের প্রভাবে শুকাইয়া উঠিতেছে। উজ্জ্বল রঙ্গমঞ্চের দীপগুলি একে একে নিভিয়া যাইতেছে। হৃদয়েরও পরিবর্তন হইতেছে। কাহার দোষে এ সব ঘটিতেছে? কাহারও দোষ নহে—বয়সের দোষে বা যমের দোষে।

একা আসিয়াছি একা যাইব তাহাতে ভাবনা কি? লোকালয়ের সঙ্গে বনিল না, তাহাতে কাহার কি ক্ষতি? পঞ্চাশ পার হইলেই সংসার ত্যাগ করিয়া বনে যাইবে এ কথাটি তেমন যুক্তিযুক্ত নয়। আবার বনে যাইতে হইবে কেন? এ সংসারই বন, যেখানে কাহারও সহিত সহৃদয়তা নাই, বিপদের দিনে কেহ আসিয়া তোমার দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার জন্য সাহায্য চাহিতে পারে। কিন্তু আনন্দের দিনের আমোদ-আহ্লাদের সময় কেহ তোমার উপস্থিতি চাহিবে না—তুমি তখন উৎপাত—সংসারেরই এই অবস্থা, তবে সংসারে ও অরণ্যে তফাৎ কোথায়!

আগে তুমি ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা করিতে, এখন তুমি কেবল ভয় ও ভক্তির পাত্র। যে পুত্র শৈশবে তোমার সঙ্গে একশয্যায় শুইয়া ঘুমের ঘোরে তোমাকে জড়াইয়া ধরিত, সে এখন লোকমুখে সংবাদ নেয় না বাবা কেমন আছেন। তুমি বড় জোর কাঁদিয়া বলিতে পার ইহাকে আমি কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিলাম। যাহাকে তুমি প্রথম লেখাপড়া শিখাইয়াছিলে, সে এখন তোমার অজ্ঞতা দেখিয়া

মনে মনে পরিহাস করে। যাহার স্কুলের বেতন তুমি এক সময় জোগাইয়াছিলে সে এখন টাকা ধার দিয়া তোমার কাছে সুদ চায়—এই যদি সংসারের অবস্থা, তবে অরণ্যের আর বাকি কি ?

বাহিরের পরিবর্তন লক্ষ্য কর সেখানেও একই অবস্থা। তুমি যেখানে নানারকম ফুলের গাছ সংগ্রহ করিয়া বড় আশায় নিজ হাতে প্রত্যহ জল দিতে, সেখানে হারাধন পোদ ছোলামটরের চাষের জন্য লাঙ্গল দিয়া জমি চষিতেছে। যৌবনে যে গৃহ বড় আশায় তুমি নির্মাণ করিয়াছিলে, সেই গৃহের অভ্যন্তরে বড় সাধে যে খাট পাতিয়াছিলে হয়ত দেখিবে সেই গৃহের ইঁটগুলি দাসু ঘোষের কলে গুঁড়াইয়া সুরকি করা হইতেছে আর তোমার সেই সাধের পালঙ্কের কাঠ দিয়া পাচিকা ভাতের হাঁড়িতে জ্বাল দিতেছে। সর্বাপেক্ষা বিপদের কথা হইল এই যে, যৌবনে যাহাকে দেখিতে সুন্দর লাগে, বার্ধক্যে সেই কুৎসিত হইয়া দাঁড়ায়। নারী, পুরুষ সকলেরই এই এক অবস্থা। তরঙ্গিনী যৌবনে যখন বাগানে ফুল চুরি করিতে আসিত তখন তাহাকে দেখিলে কাহার না ভাল লাগিত? কিন্তু সেই তরঙ্গিনী বয়সের ধর্মে গঙ্গার মা হইয়াছে। তাহার দীর্ঘ দেহ কৃশ ও কৃষ্ণ, তাহার পাকাচুল এবং কুঞ্চিত চর্ম, তাহার কর্কশ কণ্ঠ ও শুষ্ক বাহু দেখিয়া কে বুঝিতে পারে যে, এককালে এই যুবতীর রূপের তুলনা ছিল না।

বৃদ্ধগণ যদি সংসার ত্যাগ করিয়া বনে যাইতেন তবে সংসারের অবস্থা যে কেবল ভাল হইত তাহা নহে, বৃদ্ধ বয়সেও বহু লোক দেশের ও জাতির স্থায়ী কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। জার্মান জাতির ঐক্য-বিধায়ক বিসমার্ক ও ফ্রেদারিক, ইংলণ্ডে দুইজন অতি প্রসিদ্ধ নেতা গ্ল্যাডস্টোন ও ডিসরেলি বৃদ্ধ বয়সেই দেশের সর্বোত্তম উপকার করিয়াছেন। প্রাচীন বয়সই জ্ঞানকর্মের সময়। যৌবনকে কর্মের সময় বলা হয় বটে, কিন্তু যৌবনের কাজ ভাল হয় না, বুদ্ধি তখন কাঁচা থাকে, রিপুগণের প্রবলতা তখন অত্যধিক হয়, ভোগাসক্তি প্রবল থাকায় কাজ অনেক সময়ই ভাল হয় না। যৌবন অতিক্রান্ত হইলে মানুষের বহুদর্শিতা জন্মে, বুদ্ধি স্থির হয়, প্রতিষ্ঠার লোভ থাকে না ও ভোগাসক্তি অধিক হয় না। এইজন্য বৃদ্ধ বয়সের কাজ ভাল হয়। এখানে কমলাকান্ত চক্ষুদন্তহীন ত্রিকালের বুড়ার কথা বলিতেছেন না। তাহার তো দ্বিতীয় শৈশব।

সাধারণতঃ দেখা যায়, মানুষ মৃত্যুকাল পর্যন্ত কেবল কাজ ও চিন্তাই করিয়াছে। সকলেই বিষয়ান্বেষণে মত্ত। কিন্তু কমলাকান্তের মত অবশ্য বার্ধক্যে পরের জন্য কিছু কাজ করিতে হইবে। অনেকে হয়ত বলিবে, নিজের কাজই করিয়া উঠিতে

পারা গেল না পরের কাজ করা হইবে কখন? নিজের কাজ কি শেষ হয়! মানুষ যদি লক্ষ বছর বাঁচিত তবু তাহার নিজের কাজ শেষ হইত না। কিন্তু বার্ধক্য আসিলে নিজের কাজ শেষ হইয়াছে মনে করিয়া পরের কাজে রত হওয়া—ইহাই যথার্থ মুনিবৃত্তি।

সারাজীবন যদি এইভাবে কাজই করা হয়, বার্ধক্যেও যদি কাজের বিরাম না থাকে তবে পরলোকের কাজ ঈশ্বরচিন্তা মানুষ করিবে কখন? কমলাকান্ত বলেন, পরকালের কাজ অর্থাৎ ঈশ্বরচিন্তা শৈশব হইতে আজীবন করিবে। যে কাজ সকল কাজের উপর সে কাজ কি কেবল বার্ধক্যের উপর ফেলিয়া রাখা ভাল? শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে, বার্ধক্যে সকল সময়ই ঈশ্বরকে ডাকিবে। ইহার জন্য কোনো অবসরের প্রয়োজন নাই, ইহার জন্য অন্য কোনো কাজের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

কমলাকান্ত বুঝিতেছেন এইসব কথা অনেকেরই ভাল লাগিতেছে না। তরঙ্গিনী যুবতীর কথা হইতে হইতে আবার ঈশ্বরপ্রসঙ্গ কেন? পাঠকের ভাল লাগুক বা না লাগুক কমলাকান্তের আর কোনো উপায় নাই। যৌবন সৌন্দর্য আর কমলাকান্তকে মুগ্ধ করিতে পারে না। দর্শনের তত্ত্বানুসন্ধিৎসা বার্ধক্যের দ্বারে উপনীত কমলাকান্তের হৃদয়ে আর আনন্দ দিতে পারে না। জীবনের সায়াহ্নে উপনীত হইয়া কমলাকান্ত অনুভব করিতেছেন, ভবিষ্যতের দিক চিহ্নহীন, অন্ধকারের মধ্যে ভগবানই একমাত্র আশ্রয়। তিনি একমাত্র গতি। তিনি ছাড়া আর কেহ ত্রাণকর্তা নাই।

পঞ্চম সংখ্যা

কমলাকান্তের বিদায়

কমলাকান্ত বিদায় লইতেছেন। কাহারও সঙ্গে তাঁহার বনিল না। পাঠকের সঙ্গে যেখানে লেখকের বনে না, সেখানে আর লিখিয়া লাভ কি? বাঁশীর সুর নাই, সে রস নাই, আর বাঁশী বাজাইয়া লাভ কি? শুনিবে কে? সকলেই নিজের নিজের চিন্তায় ব্যস্ত, এখন কমলাকান্তের কথা—গলাভাঙ্গা কোকিলের কুহুস্বর কে শুনিবে?

বঙ্গদর্শনের নিকটও কমলাকান্ত বিদায় লইতেছেন। কমলাকান্ত চিরদিনই একা, চিরদিনই নিঃসঙ্গ। কিন্তু যৌবনের আনন্দ স্মরণ করিয়া কমলাকান্ত এখন নির্জনে কাঁদিতে চাহিতেছেন—লিখিবার আর ইচ্ছা নাই।